জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গ্রন্থাবলী—২

হিন্দুরাষ্ট্রের-গড়ন

শ্রীবিনয় কুমার সরকার

বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

[মূল্য ২॥০ মাত্র।]

PRINTED BY PARIKSHIT CHARAN GUPTA.
KAMALA PRINTING WORKS,
3, KASI MITRA GHAT STREET, CALCUTTA.

ভূমিকা

রাষ্ট্র-সাধনায় হিন্দু-জাতি

প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব মালমশলাগুলিকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কাঠামোয় ফেলিতেছি। দেখা যাউক ভারতীয় নরনারীর কোন্ মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কোনো একটা বিদ্যার নাম নয়। "জুরিস্-প্রুডেন্স্" বা আইন-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, নগর-বিজ্ঞান, রাজস্ব-বিদ্যা, লড়াই-বিদ্যা, "আবাপ" বা আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন-তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিদ্যার সমবায়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত হয়।

গণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক বা রাজ-তন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক প্রত্যেকের শাসনেই এই সকল প্রকার বিদ্যা কাজে লাগে। কাজেই শাসনের "রূপ" বা "গড়ন" বিষয়ক তথ্য গুলা "চুঁড়িয়া বাহির" করিতে হইলে অথবা এই সমুদয়ের "ব্যাখ্যায়" বা বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইতে হইলে এই সকল বিদ্যারই ডাক পাড়তে বাধ্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ওঠা বসায়ই নৃতত্ত্ব ["আন্থ্রপলজি"] এবং চিত্ত-বিজ্ঞান ["সাইকলজি"] ও আবশ্যক।

বর্ত্তমান গ্রন্থের হিন্দু নরনারী সাত শ' বৎসর ধরিয়া গণ-তন্ত্রের "রাজ" চালাইতেছে,—আর যোল সতের শ' বৎসর ধরিয়া রাজ-তন্ত্রের "রাজ" চালাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির "পাব্লিক ল" বা রাষ্ট্র-শাসন এই কয় পৃষ্ঠার ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

কোথাও দেখিতেছি হিন্দু সমাজের মাতব্বরেরা নগরের স্বাস্থ্য-রক্ষায়
া ঘামাইতেছে। কোথাও বা পল্টনের খোরপোষ যোগাইবার
ধন-সচিবেরা শশব্যস্ত। কখনও জনগণকে আত্ম-কর্তৃত্বের
নায় নিরত দেখিতেছি। কখনও বা অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনপদ
াকে ঐক্য গ্রথিত করিবার দিকে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মেজাজ
লতেছে।

এই আবহাওয়ায় হিন্দু জাতি শক্তি-যোগী এবং টক্কর-প্রিয়। ভারতের
রাী এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা-ধর্ম্মী এবং বিজিগীষু। রাষ্ট্রীয় লেনদেন-
া,—কি "তন্ত্রে"র কাজকর্ম্ম, কি "আবাপে"র কাজকর্ম্ম,—সবই
তবাসীর হাতের জোরের আর মাথার জোরের প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক
া-চালনায়, প্রত্যেক খাজনা আদায়ে, প্রত্যেক "শ্রেণী"-স্বরাজে আর
ত্যেক জমি জরীপে লোকগুলার রক্তের স্রোত ছুটিতেছে আর মাথার
পায়ে পড়িতেছে।

সেই রক্তের স্রোত আর মাথার ঘামই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসল
করণ। হিন্দু রক্ত-দরিয়ার তেজ মাপিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান
র উদ্দেশ্য।

জরীপ করিবার যন্ত্র

রক্তের তেজ মাপিতে হইবে। কেমন করিয়া? মাপ-কাঠি কোথায়?
শ করিবার যন্ত্রটা কৈ?

যাহা জানা আছে তাহার সাহায্যে অথবা তাহার তুলনায় অজানাকে
বার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জানা আছে বর্ত্তমান জগৎ। অতএব
ন জগতের মাপ কাঠিতে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ
ব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির রাষ্ট্র-সাধনা জরীপ করা সম্ভব।

[১]

পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদি ভারতীয় গণিত-পণ্ডিতদের বিদ্যার দৌড় কতটা? মাপা সম্ভব একমাত্র তাহার পক্ষে যে জানে নিউটন, ম্যাক্‌সোয়েল, আইনষ্টাইন ইত্যাদির মর্ম্মকথা। সেইরূপ পতঞ্জলি, নাগার্জ্জুন ইত্যাদির হিন্দু রসায়নের কিম্মৎ বুঝে কে? যে বুঝে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর "রস-রত্ন-সমুচ্চয়" বা রসায়ন-সমুদ্র কি চিজ। চরক সুশ্রুত ইত্যাদি সম্বন্ধে ও এই "ফর্ম্মূলা"ই লাগিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তুলনায় প্রাচীন ভারতকে লজ্জিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লজ্জা একমাত্র হিন্দু রক্তের লজ্জা নয়। গোটা প্রাচীন দুনিয়াই,—জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তুলনায় "সেকেলে"।

পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এই কথাটা মনে রাখিতে অভ্যস্ত নন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে বর্ত্তমান জগতের আসরে বসাইয়া মনের সুখে ভারত-মাতাকে বে-ইজ্জৎ করিতে ভালবাসেন। গ্রীক রোমাণ এবং "ক্যাথলিক-খৃষ্টিয়ান" ইয়োরোপের অজ্ঞান, কুসংস্কার, "তুর্কমুক," "হাঁচি," "টিক্‌টিকি," "ভুতুড়ে কাণ্ড" এবং লাখ লাখ অন্যান্য বুজরুক ইঁহারা বেমালুম ভুলিয়া যান। আর ভারতসন্তানেরা প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা-অসভ্যতা এবং সু-কু সম্বন্ধে প্রায় একদম কিছুই জানেন না। কাজেই পশ্চিমাদের সঙ্গে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া ভারত সম্বন্ধে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকা এতকাল আমাদের দস্তুর রহিয়াছে।

[২]

যাহা হউক, হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ মাপিবার আর এক উপায় হইতেছে পুরাণা ইয়োরোপের দৌড়টা চোখের দিন রাত নিজের

কোথাও দেখিতেছি হিন্দু সমাজের মাতব্বরেরা নগরের স্বাস্থ্য-রক্ষায় মাথা ঘামাইতেছে। কোথাও বা পল্টনের খোরপোষ যোগাইবার জন্য ধন-সচিবেরা শশব্যস্ত। কখনও জনগণকে আত্ম-কর্তৃত্বের সাধনায় নিরত দেখিতেছি। কখনও বা অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনপদ গুলাকে ঐক্য গ্রথিত করিবার দিকে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মেজাজ খেলিতেছে।

এই আবহাওয়ায় হিন্দু জাতি শক্তি-যোগী এবং টক্কর-প্রিয়। ভারতের নরনারী এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা-ধর্ম্মী এবং বিজিগীষু। রাষ্ট্রীয় লেনদেন-গুলা,—কি "তন্ত্রে"র কাজকর্ম্ম, কি "আবাপে"র কাজকর্ম্ম,—সবই ভারতবাসীর হাতের জোরের আর মাথার জোরের প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক সেনা-চালনায়, প্রত্যেক খাজনা আদায়ে, প্রত্যেক "শ্রেণী"-স্বরাজে আর প্রত্যেক জমি জরীপে লোকগুলার রক্তের স্রোত ছুটিতেছে আর মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে।

সেই রক্তের স্রোত আর মাথার ঘামই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসল উপকরণ। হিন্দু রক্ত-দরিয়ার তেজ মাপিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

জরীপ করিবার যন্ত্র

রক্তের তেজ মাপিতে হইবে। কেমন করিয়া? মাপ-কাঠি কোথায়? জরীপ করিবার যন্ত্রটা কৈ?

যাহা জানা আছে তাহার সাহায্যে অথবা তাহার তুলনায় অজানাকে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জানা আছে বর্ত্তমান জগৎ। অতএব বর্ত্তমান জগতের মাপ কাঠিতে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির রাষ্ট্র-সাধনা জরীপ করা সম্ভব।

[১]

পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদি ভারতীয় গণিত-পণ্ডিতদের বিদ্যার দৌড় কতটা? মাপা সম্ভব একমাত্র তাহার পক্ষে যে জানে নিউটন, ম্যাক্সোয়েল, আইনষ্টাইন ইত্যাদির মর্ম্মকথা। সেইরূপ পতঞ্জলি, নাগার্জ্জুন ইত্যাদির হিন্দু রসায়নের কিম্মৎ বুঝে কে? যে বুঝে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর "রস-রত্ন-সমুচ্চয়" বা রসায়ন-সমুদ্র কি চিজ। চরক সুশ্রুত ইত্যাদি সম্বন্ধে ও এই "ফর্ম্মূলা"ই লাগিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তুলনায় প্রাচীন ভারতকে লজ্জিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লজ্জা একমাত্র হিন্দু রক্তের লজ্জা নয়। গোটা প্রাচীন দুনিয়াই,—জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তুলনায় "সেকেলে"।

পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এই কথাটা মনে রাখিতে অভ্যস্ত নন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে বর্ত্তমান জগতের আসরে বসাইয়া মনের সুখে ভারত-মাতাকে বে-ইজ্জৎ করিতে ভালবাসেন। গ্রীক রোমাণ এবং "ক্যাথলিক-খৃষ্টিয়ান" ইয়োরোপের অজ্ঞান, কুসংস্কার, "তুর্ক্‌মুক্‌," "হাঁচি," "টিক্‌টিকি," "ভুতুড়ে কাণ্ড" এবং লাখ লাখ অন্যান্য বুজরুক ইঁহারা বেমালুম ভুলিয়া যান। আর ভারতসন্তানেরা প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা-অসভ্যতা এবং সু-কু সম্বন্ধে প্রায় একদম কিছুই জানেন না। কাজেই পশ্চিমাদের সঙ্গে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া ভারত সম্বন্ধে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকা এতকাল আমাদের দস্তুর রহিয়াছে।

[২]

যাহা হউক, হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ মাপিবার আর এক উপায় হইতেছে পুরাণা ইয়োরোপের দৌড়টা চোখের দিন রাত নিজের

কজায় রাখা। গ্রীস রোম এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা ইত্যাদি মুল্লুকে মানবজাতি কতখানি উঠিয়াছিল? সেই উঠার তুলনায় চরক, আর্য্যভট, আর নাগার্জ্জুনকে মাথা হেঁট করিতে হইবে না।

এই সকল বিজ্ঞান বিদ্যার আখ্ড়ায় সেকালের হিন্দুরা বুক খাড়া করিয়া,—সেকালের গ্রীক, রোমাণ এবং খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে টক্কর চালাইয়া,—সমানে সমানে "বাপের বেটা" বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী রাখিত। "হিন্দু অ্যাচীহ্ব্মেণ্ট্স্ ইন্ এক্জ্যাক্ট্ সায়েন্স্" অর্থাৎ "মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-বিদ্যায় হিন্দু জাতির কৃতিত্ব" নামক গ্রন্থে [নিউ ইয়র্ক, ১৯১৮] হিন্দু রক্তের স্রোত এই তরফ হইতে দেখানো হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে রাষ্ট্র-সাধনার ময়দানে দাঁড়াইয়া হিন্দু নরনারী গ্রীক রোমাণ এবং মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে পাঞ্জা কষিতেছে। এই কেতাবের লড়াই বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে নয়,—ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী,—এবং তাহারও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী—ইয়োরোপের সঙ্গে।

"গড়ন-বিজ্ঞানে"র জাতি বিভাগ

"মর্ফলজি" বা "গড়ন"-তত্ত্ব অর্থাৎ রূপ-বিজ্ঞান সার্ব্বজনিক ও সনাতন। এক টুকরা হাড় দেখিবা মাত্র বলিয়া দেওয়া সম্ভব এটা বাঘের বুকের পাঁজরা না ভেঁড়ার পিঠের শির-দাঁড়া। জীবতত্ত্ববিদেরা এই সমস্যা লইয়া দিন রাত ব্যাপৃত আছেন। কথাটার মধ্যে হেঁয়ালি কিছুই নাই।

"বুদ্ধদেবের দাঁত" নামক বস্তু "আবিষ্কৃত" হইবা মাত্র এই কারণেই অস্থিতত্ত্ববিৎ মহলে লড়াই উপস্থিত হওয়া সম্ভব। বস্তুটা যে শূয়রের দাঁত নয় আগে তাহার মীমাংসা করা দরকার হইয়া পড়ে।

ভূতত্ত্ববিদেরা ও এই ধরণের গবেষণায়ই অভ্যস্ত। একটুকরা পাথর অথবা কয়লার চাপ বা এমন কি ধুলা বালুর নমুনা পাইলেই তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন দুনিয়ার কোন্ কোন্ মুল্লুকের কত হাত মাটীর বা "পাণি"র নীচে অথবা কোন্ পাহাড়ের ডগায় এই সব মাল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

রূপ-বিজ্ঞান মানুষের বেলায় ও খাটে। দলবদ্ধ মানুষ বা সমাজ এবং সমাজের রাষ্ট্রীয় "তন্ত্র" ও "আবাপ" অর্থাৎ ঘরে বাইরের সকল প্রকার লেন দেন সম্বন্ধে ও মর্ফলজি বা গড়ন-তত্ত্বের "রূপ-কথা" খাটিবে। অনেক স্থলেই হয়ত "অনুবীণ"যন্ত্রের অর্থাৎ "ইণ্টেন্সিহ্ব" বা গভীর দৃষ্টি শক্তির এবং সমালোচনা শক্তির দরকার। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিশ্বব্যাপী যুগ-বিভাগ, স্তর-বিভাগ, জাতি-বিভাগ, উপজাতি-বিভাগ ইত্যাদি শ্রেণী-বিন্যাস কায়েম করা সম্ভব। তথ্য "বিশ্লেষণ" সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলেই হইল।

পল্লীজীবনের একচাপ দেখিবা মাত্র কখনো হয়ত বলিব এটা "আদিম"। কখনো বা "প্রাচীন" বলিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় করা হইবে। আবার "মধ্যযুগের" পল্লী এবং "বর্ত্তমান" যুগের পল্লী ইত্যাদি বস্তু ও স্বতন্ত্র নিদর্শনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সেইরূপ লড়াইয়ের কায়দা বা জমি জমার বন্দোবস্ত দেখিলেই এই সবের "দেশ কাল পাত্র" ঠাওরানো সম্ভব। অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্ঝনানি, শুল্ক ও খাজনার নাম ইত্যাদি শুনিবা মাত্র এই গুলার "কুলশীল" বলিয়া দেওয়া কঠিন বিবেচিত হইবে না।

রাজা, রাজপদ, রাজশক্তি ইত্যাদি বস্তু দুনিয়ার আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। কিন্তু কালিদাস-শেক্স্পীয়ারের "রাজা" যে চিজ বৈদিক সাহিত্য বা "ইলিয়াদ-ওদিসি"র "রাজা" সেই চিজ নয়।

"রাজশব্দোপজীবী" যে কোনো ব্যক্তির রক্ত অনুবীণে পরখ করা যাইতে পারে। করিলেই বুঝা যাইবে ইহার ভিতর তাসিতুস-বিবৃত জার্ম্মান-রাজা, না "জাতক সাহিত্যের" গণ-রাজা, না ফ্রান্সের বুর্বঁ বাদশা, না মৌর্য্য "সার্ব্বভৌম", না আধুনিক ইংরেজ সমাজের হাতপা-ঠুঁটা-করা রাজা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্যান্য কোষ্ঠীর মতন রাজ-রক্তের কোষ্ঠীতেও গণকেরা যুগ ও জাত খোলসা করিয়া দিতে সমর্থ।

গড়ন-বিজ্ঞান খাটাইয়া হিন্দু জাতির মূর্ত্তি-পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। মান্ধাতার আমল, আদিম সমাজ, প্রাচীন দুনিয়া, মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান বিশ্বরূপ আর বর্ত্তমান জগৎ ইত্যাদি নৃতত্ত্ব-বিদ্যার শব্দগুলা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সনতারিখ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। গোঁজামিলের সম্ভাবনা নাই।

এই সকল পারিভাষিক শব্দ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা নেহাৎ অসতর্ক ভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত,—বিশেষতঃ যখন ভারতীয় এবং প্রাচ্য তথ্য লইয়া তাঁহাদের কারবার চলে। এই জন্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসরে গোঁজামিল ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। সেই কুসংস্কার এবং গোঁজামিল চলিতেছে আজকালকার ভারতীয় পণ্ডিতগণের ভারত-তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার আসরেও। দেশী এবং বিদেশী দুই প্রকার পণ্ডিতের বিরুদ্ধেই বর্ত্তমান গ্রন্থ লড়াই ঘোষণা করিতেছে।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই

প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সেই সময়ে— ১৯১৪সালের গোড়ার দিকে এলাহাবাদের পাণিনি আফিস হইতে বংপ্রণীত "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোসিঅলজি" অর্থাৎ "হিন্দু সমাজের বাস্তব ভিত্তি" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তাহাতে এই লড়াইয়ের সূত্রপাত করা হইয়াছে।

এই পৌনে এগার বৎসরে,—অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে,—বিদেশের সর্ব্বত্র সেই লড়াইকে সমাজ-বিজ্ঞানের আসরে আসরে আনিয়া হাজির করিয়াছি। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-বৈঠকে এই বাণী শুনানো হইয়াছে। মার্কিন সমাজের উচ্চতম বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পত্রিকায় এই সংগ্রাম গিয়া ঠাঁই পাইয়াছে (১৯১৬-১৯২০)।

প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-ফ্যাকাল্টিতে এই লড়াই ঘোষণা করা হইয়াছে ফরাসী ভাষায়। "আকাদেমি দে সিয়াঁস্ মোরাল্ এ পোলিটিক" নামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পরিষদের "চল্লিশ অমরের" কানেও এই বাণী প্রবেশ করিয়াছে। পরে এই পরিষদের পত্রিকায় প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে [১৯২১]।

জার্ম্মাণ সমাজে ও,—জার্ম্মাণ ভাষায়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লড়াই উঠাইতে কসুর করি নাই। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্ম্মাণির রাষ্ট্র-সাহিত্য এই সকল তথ্যের আবহাওয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে [১৯২২-১৯২৩]।

যুবক ভারতের সংগ্রাম-দূত রূপেই এই অধম লেখক জগতের পণ্ডিত মহলে পরিচিত। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে,—" এই মাত্র ভরসা।

১৯২২ সালে লাইপ্‌ৎসিগ সহরে "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশুন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্" অর্থাৎ "হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র-দর্শন" নামক ইংরেজি গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছি।

এক্ষণে তাহার প্রথম অংশের খানিকটা বাংলায় লিখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। বর্ত্তমান গ্রন্থে হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় "চিন্তা" বা "রাষ্ট্র-দর্শন" সম্বন্ধে কোনো কথা নাই। অধিকন্তু "প্রতিষ্ঠানে"র বৃত্তান্ত হিসাবেও এই কেতাবের মাল পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি রচনার মাল হইতে কিছু কিছু পৃথক্। যাহা হউক,—বঙ্গদেশীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আনুকুল্যে

এই গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ জুটিয়াছে বলিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। তাহাতে আছে একমাত্র "রাষ্ট্র-দর্শন"। আর প্রধানতঃ শুক্রাচার্য্যের মতামতই তাহার ভিতর ঠাঁই পাইয়াছে।

আথেনীয় "স্বরাজের" অনুপাত

ভারতে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পঠন-পাঠন আজ কাল কতটা হয় বলিতে পারি না। এই বিদ্যা বিষয়ক এম, এ পরীক্ষা পূর্ব্বে ছিল। এখনো আছে নিশ্চয়। বোধ হয় আজকাল পি, এইচ্, ডি ও চলে।

[১]

কিন্তু গোড়ায় গলদ। এশিয়ার সঙ্গে তুলনায় গ্রীস, রোম এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপকে পশ্চিমা পণ্ডিতেরা যে চোখে দেখিয়া থাকেন আমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে গোলামের মতন ঠিক সেই চোখেই দেখিতে শিখিয়াছি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার ইয়োরোপকে রক্ত-মাংসের মানুষ ভাবে দেখিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। তাহার জন্য অনুসন্ধান "রিসার্চ" গবেষণা আবশ্যক। সেদিকে ভারতবাসীর খেয়াল কৈ?

ইয়োরোপকে কথায় কথায় আমরা "স্বরাজে"র মুলুক, "স্বাধীনতা"র মুলুক, "জাতীয়তার মুলুক, "গণ-তন্ত্রে"র মুলুক, "আইনে"র মুলুক, "ঐক্যের" মুলুক, "শান্তি"র মুলুক ইত্যাদি রূপে বিবৃত করিতে অভ্যস্ত। আসল নিরেট সত্য গুলা কি? প্রায় এক দম উল্টা।

[২]

আথেনীয় সমাজে ২৫,০০০ নরনারী মাত্র স্বাধীন স্বরাজী এবং গণতন্ত্রী, —চরম উন্নতির যুগে—অর্থাৎ পেরিক্লেসের আমলে [খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম

শতাব্দী]। "অনধিকারী" "গোলাম" "প্যারিয়া" তখন কত জন?—চার লাখ।

মানবজাতির রাষ্ট্র-সাধনার তরফ হইতে এই অনুপাতটা কি বড় লোভনীয় চিজ? চার লাখ নরনারীকে "বাঁদি" করিয়া রাখিয়া পঁচিশ হাজার হিন্দু সেকালে কি কখনো কোথাও আত্ম-কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা ও সাম্য ফলাইতে পারে নাই? পঁচিস্ হাজার লোকের সাম্য, স্বাধীনতা, স্বরাজ বস্তুটার ভিতর মানব সমাজের কোন্ স্বর্গ লুকাইয়া আছে?

প্রশ্নটাকে গভীর ভাবে আলোচনা করিবার জন্য খতাইয়া দেখিতে হইবে আথেন্স [আটিকা] রাষ্ট্রের চৌহদ্দি কতটুকু ছিল। আথেন্সের গৌরব যুগই বা কত বৎসর কত মাস কত দিন ইতিহাসের কথা? বুঝা যাইবে যে,—এশিয়ানদের তুলনায় আথেনিয়েরা "অতি-মানুষ" ছিলনা।

[৩]

কিন্তু ডিকিন্‌সন, গিল্‌বার্ট মারে, ব্যরি ইত্যাদি গ্রীকতত্ত্বের পাণ্ডারা ভারতসন্তানকে চোখে আঙ্গুল্ দিয়া সে সব কথা বুঝাইয়া দিতেছেন কি? না! এরূপ বুঝানো তাঁহাদের স্বার্থ নয়। এই ধরণের তথ্য তাঁহাদের রচনায় ও পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসী শিখিয়াছে ঠিক উল্টা।

এই সকল ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান গ্রীক-তত্ত্বজ্ঞ, প্রত্যেকেই এক একটি লর্ড কার্জ্জন। অর্থাৎ বর্ত্তমান এশিয়াকে ইয়োরোপের গোলাম রূপে পাইয়া তাঁহারা সেকালের প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে ও আকাশ-পাতাল পার্থক্য আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন!

এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো ভারতবাসীর মাথা খেলিয়াছে কি?—"গ্রীক-তত্ত্বে"র ভিতরে আধুনিক "ইম্পীরিয়্যালিজ্‌ম্," —শেতাঙ্গপ্রাধান্য

ও এশিয়া-বিদ্বেষের দর্শন অতি সূক্ষ্ম ভাবে অসংখ্য বুজরুকি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা সন্দেহ করা পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনো ভারত সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল ও রাষ্ট্রীয় ধারা

তার পর অন্যান্য কথা। ধরা যাউক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংরেজরা বিজিত "পরাধীন" জাতি। অর্থাৎ বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতের যে যে যুগ বিবৃত হইতেছে তাহার প্রায় সকল ভাগেই ইংরেজজাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল না। আইরিশ ঐতিহাসিক গ্রীণ একথা খুলিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

যে হিসাবে আজকালকার দিনে "জাতীয়তা" বুঝা হইয়া থাকে সে চিজ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অধিকাংশ জনপদেই অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রীম্যান প্রণীত "ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল" [লণ্ডন ১৯০৩] ঘাঁটিলেই বুঝা যায় "কত ধানে কত চাল।"

অধিকন্তু, ইংল্যাণ্ডই ইয়োরোপের এক মাত্র দেশ নয়। আর, সর্ব্বত্রই "মাৎস্যন্যায়" আর বংশে বংশে "ষাঁড়ের লড়াই" ইতিহাসের প্রধান তথ্য। রাষ্ট্রীয় ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, "ন্যাশন্যালিটি" ইত্যাদি বোল চাল "খৃষ্টিয়ান" অভিজ্ঞতায় মিলে কি? মিলে না। তুর্ক্-মুসলমানেরা যখন ইয়োরোপকে ছারখার করিয়া ছাড়িতেছিল তখন খৃষ্টিয়ান ভেনিস তাহাদের সঙ্গে দোস্তি পাতাইতে লজ্জা বোধ করে নাই।

আলেকজান্দারের আমল হইতে বুর্ঁ আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়ানরা আত্মকর্তৃত্বহীন স্বরাজ-শূন্য পরপীড়িত জাতি। বাদশার যথেচ্ছাচার আর জমিদারের অত্যাচার ছিল এই সকল নরনারীর সনাতন "কন্‌ষ্টিটিউশন্" বা রাষ্ট্র-ধর্ম্ম।

নারীজাতীকে বে-ইজ্জৎ করিতে গ্রীক আইন, রোমাণ আইন এবং "খৃষ্টিয়ান" আইন সমান ওস্তাদ। ইয়োরোপীয়ান "সমাজে" নারীর ঠাঁই কোনো দিনই সম্মান সূচক বা এমন কি "সহনীয়"ও ছিল না। কথাটা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্যই বিবেচিত হইবে না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত বেবেলের গ্রন্থ ঘাঁটিয়া দেখিলেই আপাততঃ চলিবে। পরে আর ও "ইন্টেন্সিভ্" "রিসার্চ্চ্" বা গভীরতর খোজ চালানো যাইতে পারে।

ভূমি-গত গোলামী ইয়োরোপীয়ান কিষাণ সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে কবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। লাম্‌প্রেক্‌ট্, বিশুর, সোম্বার্ট ইত্যাদি জার্ম্মাণ পণ্ডিত-প্রণীত আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক রচনা গুলা পাকা সাক্ষ্য দিবে। এখনো ইতালিতে, পোল্যাণ্ডে এবং বল্কান অঞ্চলে সেই ভূমি-গোলামি কিছু কিছু চলিতেছে।

পাশ্চাত্য দণ্ড-বিধি

দণ্ড-বিধি বা পেন্যাল কোডের আইনে ইয়োরোপীয়ানরা মহা সভ্য, না? সেকালের গ্রীসে দ্রাকো-সংহিতা জারি ছিল। আথেন্সের ঋণ-কানুন ছিল পাশবিক। সে কালের রোমে ছিল "দ্বাদশ বিধান" প্রচলিত। মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান রাষ্ট্রে "ইনকুইজিশুন" নামক নির্য্যাতন বিধি ও "আইন সঙ্গত" ব্যবস্থাই বিবেচিত হইত।

পরবর্ত্তী যুগের সাক্ষ্য দেখিতে পাই জার্ম্মাণির ন্যুর্নবার্গ শহরে। এই নগরের দুর্গে "ফোল্টার-কাম্মার" বা নির্য্যাতন-ভবন আজও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ান দণ্ড-প্রণালীর সাক্ষী ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ভেনিসের দোজে-প্রাসাদে ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান বিচার-জুলুম মূর্ত্তিমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের বহর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইয়োরোপের সমসাময়িক আইন গুলা ধারায় ধারায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে,—অত্যাচারী, নির্য্যাতন প্রিয়, নিষ্ঠুরতার অবতার বেশী কাহারা। "সাইকলজি" বা চিত্ত-বিজ্ঞানের আসরে প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ চালানো সম্ভবপর কিনা তাহার "বাস্তব" প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজ সমাজে কিরূপ আইন ছিল? "কেম্ব্রিজ মডার্ণ হিষ্টরি" নামক গ্রন্থে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের বিলাতী পেন্যাল কোডে অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে ২৫০টা অপরাধের তালিকা দেখা যায়। এই সকল অপরাধের একমাত্র সাজা প্রাণ-দণ্ড।

পরবর্ত্তী কালে যে সকল অপরাধকে অতি সামান্য বিবেচনা করা হইয়াছে সেই সকল অপরাধের জন্য ১৪০০ ইংরেজ নরনারীকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল ১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের ভিতর। কোনো দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া দু এক আনা দরের রং চুরি করার অপরাধেও শিশুদের প্রাণ যাইত! হিন্দু নরনারীর দণ্ডবিধিতে কি এই তালিকা ছাপাইয়া উঠিবার প্রমাণ দেখা যায়?

যাঁহাদের পক্ষে "ক্রিমিনলজি" বা অপরাধ-বিজ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ-প্রণীত অন্যান্য আইন-কেতাব সংগ্রহ করা কঠিন তাঁহারা ঘরে বসিয়া অধম-তারণ "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া"টা "হাটকাইতে" পারেন।

"বাপরে! গ্রীস?" "বাপরে! রোম?"

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ দফায় দফায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা দরকার। ইয়োরোপীয় সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস, সুকুমার-

শিল্প, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদিতে যাঁহাদের দখল নাই তাঁহারা ভারতীয় জীবন চর্চ্চা করিতে অনধিকারী। একমাত্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জোরে সেকালের ভারতখানাকে "বুঝা" সম্ভবপর নয়।

[১]

ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতদের ভিতর যাঁহারা "ভারত তত্ত্বের" আলোচনা করেন তাঁহারা ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মহা পণ্ডিত নন। তাঁহারা সংস্কৃত পালি আরবী ফার্শী ইত্যাদি ভাষা জানেন বটে। এই সকল ভাষায় প্রচারিত পুঁথি ঘাঁটা ঘাঁটি করিবার বিদ্যায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই না জানেন নৃ-তত্ত্ব, না জানেন চিত্ত-বিজ্ঞান। কি সঙ্গীত, কি চিত্রকলা, কি আইন, কি তর্ক-প্রণালী, কি ধনদৌলত, কি নগরজীবন, কি শিক্ষা-প্রণালী, কি পদার্থ-বিজ্ঞান কি দর্শন-শাস্ত্র এই সকল বিষয়ের ইয়োরোপীয় ধারা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অনভিজ্ঞ। কথাটা ভারতবাসীর মরমে প্রবেশ করিবে কি?

ইংরেজ গাড়োয়ানরা শেকস্পীয়ারের ভাষায় কথা বলিতে পারে, হাসি-ঠাট্টাও করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরেজ মাত্রকেই শেকশ্পীয়ার সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচনা করা চলিবে কি? হিন্দু মাত্রেই "মহাভাষ্য" "সূর্য্য সিদ্ধান্ত" আর "সঙ্গীত-রত্নাকর" ইত্যাদি গ্রন্থের "বোদ্ধা" বিবেচিত হইবে কি? সেইরূপ জার্ম্মান, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, মার্কিন রুশ ইত্যাদি ভারত-তত্ত্বের ব্যাপারীরা ইয়োরামিকায় জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম, গ্রীক দর্শন, রোমান আইন, রেণেসাঁস যুগের স্থাপত্য, বুর্ব রাষ্ট্রনীতি, সমাজে পাশ্চাত্য নারীর ঠাঁই আর ইয়োরোপীয় কিষাণদের আর্থিক অবস্থা সবই বুঝেন এইরূপ বিশ্বাস করিলে হাস্যাস্পদ

হইতে হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "লেখাপড়া," গবেষণা, অনুসন্ধান চালানো দরকার।

অর্থাৎ পশ্চিমা "ইণ্ডলজিষ্ট"রা আজ পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই "আলোচ্য বিষয়টার বিজ্ঞানের" কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া দেখিতে হইবে। সংস্কৃত কার্শী তাঁহারা যতই জানুন না কেন প্রত্যেক বিদ্যাকেই "বাজাইয়া" দেখা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় তাঁহাদের দখল আছে বলিয়া তাঁহাদের পা চাটিতে অগ্রসর হওয়া আহাম্মুকি। পরিবার, সমাজ, ধনদৌলত, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি তাঁহারা কতটা বুঝেন তাহার খতিয়ান আগে হওয়া আবশ্যক। তাহার পর ভারতীয় জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আলোচনা করা যাইতে পারে।

[২]

এই গেল বিদেশী ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের কথা। ভারতীয় ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের অবস্থা কিরূপ? কেবল ভারত-তত্ত্বজ্ঞ কেন, আমাদের যে-কোনো লাইনের চাঁই পণ্ডিতেরাও ইয়োরোপীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং চিন্তা-প্রণালীর বিকাশ ধারা সম্বন্ধে প্রায় পুরাপুরি অজ্ঞ। কথাটা শুনাইতেছে খুবই কড়া। কিন্তু ভারতসন্তান বুকে হাত দিয়া বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় পাণ্ডিত্য তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখা যাইবে,—কেন এই কথাটা "ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়" না করিয়া খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না।

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন আমাদের অনেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও। কিন্তু চাই "স্বাধীন" ভাবে "ভারতীয় স্বার্থে" ইয়োরামেরিকার ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা

করিবার ক্ষমতা। পশ্চিমারা যেমন "ভারত-তত্ত্ব" "প্রাচ্য-তত্ত্ব" ইত্যাদি বিদ্যা কায়েম করিয়া নিজেদের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়া তুলিতেছে ভারত-সন্তান সেইরূপ ইয়োরামেরিকা-তত্ত্ব বা পাশ্চাত্য তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতে ব্যবস্থা কোথায়?

[৩]

এই অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা সাধন করিতে ভয় পাইবে। "বাপ্ রে! গ্রীস?" "বাপ্ রে! রোম?" এইরূপ থাকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা প্রণালীর ঢঙ্।

আর ততদিন ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতাকে "আধ্যাত্মিক" হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গোঁফে চাঁড়া মারিতে লজ্জা বোধ করিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কাপুরুষতা। রণে ভঙ্গ দেওয়ার নামান্তর ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়।

কিন্তু কাপুরুষতা দেখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। গ্রীক সাহিত্য ল্যাটিন সাহিত্য এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য,—মূলেই হউক বা অনুবাদেই হউক,—যুবক ভারতে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে থাকুক। রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে সেকালের হিন্দু নরনারীর সু-কু সম্বন্ধে,—মায় তথাকথিত "জাতিভেদ" সম্বন্ধে ও একালের ভারত-সন্তানকে লজ্জিত হইতে হইবে না।

যুবক এশিয়ার দায়িত্ব

দুনিয়ার আঁধারই বেশী। ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু "জ্যোতি" "সৎ" ও "অমৃত" আনিবার লড়াই জগতে দেখা গিয়াছে তাহাতে ইয়োরোপীয়ান

রাষ্ট্রযোগেশ্বর দান নিন্দা করিতে বসা মূর্খ্যুমি। আবার সেই লড়াইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র-শাসনার ন্যায্য ইজ্জৎ দাবী করিতে না পারাও মূর্খ্যুমি মাত্র নয়,—গোলামি।

প্রাচ্য সংসারে ইয়োরোপীয়ান সংসার অপেক্ষা বেশী অন্ধকার বিরাজ ..াত না। একথা স্বীকার করা পশ্চিমাদের স্বার্থ নয়। বিজ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্রকে একমাত্র সহায় লইয়া যুবক এশিয়াকে এই পথে বহুকাল একাকী বিচরণ করিতে হইবে।

দুজন একজন করিয়া পশ্চিমা পণ্ডিত ও হয়ত ক্রমশঃ এই পথের দিকে ঝুঁকিতে থাকিবেন। তাহার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। গড়ন-বিজ্ঞানের বিচারে হিন্দু নরনারীকে একঘরো করিয়া রাখা আর বেশী দিন সম্ভবপর হইবে না।

তবে কুসংস্কারের মাত্রা বিজয়-গর্ব্বে অন্ধীকৃত পশ্চিমা বিজ্ঞান মহলে এখনো অতি গভীর। "এ সব দৈত্য নহে তেমন!" "লেগেসি অব্ গ্রীস" অর্থাৎ "সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক জাতির দান" নামক সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ-সঙ্কলন-গ্রন্থের সুর দেখিলে পণ্ডিত মহাশয়দের বাড়াবাড়ি বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য "শহ্বি নজ্ম্" বা হাম-বড়ামি এই কেতাবের আবহাওয়ায় চরম ভাবে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই হাম্-বড়ামির দাঁত ভাঙিয়া দেওয়া যুবক এশিয়ার অন্যতম দায়িত্ব।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্র

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান কথা হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন। এই জন্য রাষ্ট্রীয় লেনদেন বিষয়ক তথ্য গুলার দাম বাড়িয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত

হইয়াছে। জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে এই সকল তথ্যের সম্বন্ধ কিরূপ? এই প্রশ্নই তথ্যের দর-কষাকষি সমস্যার অর্থাৎ "ব্যাখ্যা"-সমস্যার আসল প্রশ্ন।

এই খানেই তর্ক-প্রণালী বা আলোচনা-প্রণালী লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে হইয়াছে। ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস, শাসন-বিষয়ক ধারা, আইনের বিধান সবই আসিয়া জুটিয়াছে। নৃতত্ত্বের ছাপ, চিত্তবিজ্ঞানের প্রভাব আর দুনিয়ার আবহাওয়া এই সকল সূত্রে হাজির হইতে বাধ্য।

তুলনা-মূলক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপকরণ কিছু কিছু সঞ্চিত করা গিয়াছে। এমন কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিদ্যার ভূমিকা স্বরূপই এই কেতাবের বিভিন্ন অধ্যায় গৃহীত হইতে পারে। রাষ্ট্র-বস্তুটা কি, রাষ্ট্র-শাসন কাহাকে বলে এই সকল কথা দফায় দফায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া বিশ্লেষণ করিবার দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে।

[২]

আর এক তরফ হইতেও এই গ্রন্থকে আলোচনা-প্রণালী বা তর্ক-শাস্ত্রের সামিল করা সম্ভব। তথ্য গুলার "ব্যাখ্যা" লইয়াই যে একমাত্র গোল বাঁধে তাহা নয়। তথ্যগুলার "সত্যাসত্যতা" লইয়াই প্রথম বিপদ।

কোন্ তথ্যটাকে হিন্দু রাষ্ট্রের "বাস্তব" তথ্য বিবেচনা করা যাইবে? এই প্রশ্নই "সত্যাসত্যতা" সমস্যার প্রাণ।

এই সূত্রে সকল প্রকার সাক্ষীর জমানবন্দি প্রতি পদক্ষেপে সমালোচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছি। ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার করা বড় সোজা কথা নয়। যে সকল সাক্ষ্য এতদিন মহাপূজ্য বিবেচিত

হইয়া আসিতেছে তাহাদের কিয়ৎ সম্বন্ধে ও সতর্ক হইবার কারণ দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

"লিপি"-সাহিত্য, মুদ্রা এবং বিদেশী ভারত-বৃত্তান্ত এই তিন শ্রেণীর সাক্ষ্য ছাড়া আর কোনো প্রমাণ লওয়া হয় নাই। তৃতীয়টার অর্থাৎ বিদেশী সাহিত্যের নজির তোলা হইয়াছে বটে—কিন্তু অনেক আমৃতা আমৃতা করিয়া। কেননা মেগাস্থেনিস, য়ুয়ান-চুয়াঙ্ ইত্যাদির রিপোর্টগুলা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ তাহা প্রতি পদে জিজ্ঞাসা করিয়া অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সকল সাহিত্যই বর্জ্জিত হইয়াছে। এমন কি কৌটিল্যের "অর্থ-শাস্ত্র"কে ও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে এই সকল সাহিত্যের সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেখানে সেখানে গ্রন্থের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে।

[৩]

কি "ব্যাখ্যা"র তরফ হইতে কি "সত্য উদ্ধারের" তরফ হইতে দুই দিক হইতেই অসংখ্য সন্দেহ এবং কূট প্রশ্ন তুলিয়াছি। এই সংশয়গুলার কিনারা করা হয়ত বহু ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় নাই। সংশয়গুলা বাজারে হাজির করাই বর্ত্তমান রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাজেই এখানে ওখানে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" অনেক শুনা যাইবে। সেগুলা বাজে কথা নয়। এই সংশয়গুলিই যুবক ভারতের বিজ্ঞান-সেবাকে নব যৌবনে ভরিয়া তুলিবে।

যাঁহারা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান অথবা ভারতীয় ইতিহাস ইত্যাদির ধার ধারেন না তাঁহারা ও তর্কশাস্ত্রের হিসাবে গ্রন্থটার ভিতর কিছু কিছু সরঞ্জাম

পাইবেন। সমাজ-তত্ত্বের "লজিক" বা যুক্তি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যেন হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বিষয়ক তথ্য সমূহ লইয়া খেলা করা হইয়াছে স্থানে স্থানে এইরূপ বোধ হইবে।

"দ'লা মেতদ দা লে সিয়াঁস্" অর্থাৎ "বিজ্ঞানের আলোচনা প্রণালী" নামক ফরাসী গ্রন্থ কিছু কিছু মনে পড়িবে।

গোটা বই পড়িবার সময় যাঁহাদের নাই তাঁহারা সরকারী আয়-ব্যয়, পল্লী-শাসন, দুনিয়ায় গণ-তন্ত্র এবং জনগণের সমাজ-কেন্দ্র এই চার পরিচ্ছেদ ঘাঁটিয়া দেখিতে পারেন। গ্রন্থকারের আলোচনা-প্রণালী এবং সিদ্ধান্তের নমুনা মোটামুটি পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্ট গুলা একত্রে দেখিলে ও খানিকটা চালতে পারে।

কেতাবের আত্মকাহিনী

কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই বিভিন্ন "প্রদেশ" হইতে সকল প্রকার প্রমাণ হাজির করিতে চেষ্টা করি নাই। ভিন্ন ভিন্ন "যুগের" প্রমাণ ও কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই দেওয়া হয় নাই। যে প্রদেশে অথবা যে যুগে প্রতিষ্ঠানটাকে যথা সম্ভব পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে পাকড়াও করিতে পারিয়াছি একমাত্র সেই প্রদেশ বা সেই যুগের সাক্ষ্যই লওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক যুগ হইতে রগড়াইয়া রগড়াইয়া তথ্য বাহির করিতে প্রয়াসী হইলে প্রত্যেক অধ্যায় লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ লইয়াও স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সেই প্রয়াস করা কর্ত্তব্য ও বটে।

মোটের উপর হাজার দুই পৃষ্ঠা লিখিবার মতন মালমশলা আছে। তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের মতলব তাহা নয়। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ ছয় জন

লেখক তিন তিন বৎসর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে একত্রে খাটিলে বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থমালা দেখা দিতে পারে।

এই কেতাবকে বহরে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করা হইয়াছে আর এক উপায়ে। "লিপি" সাহিত্য অথবা অন্য কোনো প্রমাণ-ভাণ্ডার হইতে লম্বা লম্বা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। এই সকল সুবিস্তৃত বিবরণের ভিতর সাধারণতঃ হয়ত বা কেবল মাত্র একটা বিশেষণে বা একটা ক্রিয়াপদে আসল কাজের কথা থাকে। বর্ত্তমান রচনায় সেই বিশেষণটা অথবা ক্রিয়াপদটা মাত্র—তাহাও আবার অনেক স্থলেই মূলের আকারে নয়,—খাঁটি বিংশ শতাব্দীর ঘাট মাঠের বাংলায়,—আনিয়া খাড়া করিয়াছি।

লম্বা লম্বা মৌলিক বৃত্তান্ত এবং তাহার দশগজি চওড়া তর্জ্জমা প্রত্নতত্ত্বের গ্রন্থে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু জীবন-তত্ত্বের ব্যাপারীর পক্ষে "ভিতরকার কথাটা" টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র লক্ষ্য। প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবি জবরজঙ্ ল্যাবরেটরিতে বা কর্ম্মশালায় রাখিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেছি কেবল মাত্র হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রীয় রক্ত-তরঙ্গ।

গ্রন্থ-পঞ্জী

দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সবই বোধ হয় পড়িয়া দেখিয়াছি। তাঁহাদের আলোচনা-প্রণালীর সঙ্গে অথবা সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক প্রায় প্রত্যেককেই বোধ হয় অগ্রজ হিসাবে ইজ্জৎও দিতে ত্রুটি করি নাই। তাঁহাদিগকে "ফুটনোটের" পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া না রাখিয়া কেতাবের মালের সঙ্গেই তাঁহাদের নাম গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশেষতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হইতেছে বাজার গ্রন্থকারের একটা নতুন রকমের দায়িত্বও আছে। "বাংলা সাহিত্যে"র সঙ্গে দেশী বিদেশী পণ্ডিত গণের "আবিষ্কৃত" ভারত-তত্ত্বের পরিচয় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

কোলব্রুক, মেইন, জিব্‌লাঁ, সেনার, ফয়, হিল্লেব্রাণ্ট, ষ্টাইন ইত্যাদি বিদেশী ইণ্ডলজিষ্টদের নাম বাঙ্গালী বাংলা ভাষার সাহায্যে জানিতে পারে না। এমন কি রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি ভারতীয় সুধীর রচনা ও বঙ্গ সাহিত্যে অজ্ঞাত। একমাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার অন্যতম ইংরেজি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" নামে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে [১৯২৩]।

বাঙালী পাঠকগণের সঙ্গে এই সকল এবং অন্যান্য লেখকের রচনার সংযোগ স্থাপন করা অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি।

(২)

তাহা ছাড়া গ্রীস্, রোম, এবং ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, আইন, রাজস্ববিজ্ঞান, পল্লী-স্বরাজ, রণনীতি, নগরজীবন, ভূমিবিধান ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে সকল রচনা আছে সে সব ত বাঙালীর সাহিত্যে একরকম অজানা। কতকগুলা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম "এক কথায় পরিচয়ের" সহিত কেতাবের ভিতর যথাস্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ফ্রেমান, রামজে, আর্নল্ড, জেঙ্ক্‌স্, হ্বাল্‌শ্, ব্রিসো, জোসেফ-বার্থেলেমি, লরোআ-ব্যোলিয়ো, গুড্‌নো, হ্বিলোবি, গম, হ্বিনোগ্রাদফ,

হেপ্‌কে, গের্ডেস, হাইল, লোহ্বি, হোল্ডস্‌হ্বোর্থ ইত্যাদি নানা "অকথ্য" নামে কেতাবের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চৌহদ্দি বুঝিবার পক্ষে বাঙালী পাঠকের সাহায্য হইবে আশা করি। বাংলা সাহিত্য যে কত দরিদ্র তাহাও প্রত্যেক সুবিবেচকেরই সহজে মালুম হইবার কথা।

বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনায় যে সকল বিদেশ-বিষয়ক গ্রন্থ কাজে লাগে তাহার কয়েকটা ইতিমধ্যে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। নিম্নে এই গুলার নাম প্রদত্ত হইল :—

১। গ্রীজো—প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" [ফরাসী গ্রন্থ]

অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

২। এঙ্গেল্‌স্‌—প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" [জার্ম্মাণ গ্রন্থ]

অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

৩। লাফার্গ—প্রণীত "ধনদৌলতের রূপান্তর [ফরাসী গ্রন্থ]

অনুবাদক ঐ

গ্রন্থ তিনটাই যন্ত্রস্থ।

যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা

এই পৌণে এগার বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে বুঝাপড়া চলিতেছে অতি সজাগ ভাবে। পর্য্যটনের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ প্রকার তথ্য-সঙ্কলন, তথ্যের ব্যাখ্যা, জীবন-সমালোচনা আর দার্শনিক তর্কপ্রশ্ন জুটিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ।

তাহার ভিতর সিদ্ধান্ত ও সমন্বয় বেশী আছে কি সংগ্রাম ও সংশয় বেশী আছে বলা কঠিন। তবে সর্ব্বত্রই ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা বাংলায় এবং তিন হাজার পৃষ্ঠা ইংরেজিতে এই সকল দুনিয়া-জোড়া অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহার চাপ,—ঝড় তুফানের ঝাপ্‌টা সমেত,—বর্ত্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরকেও বোধ হয় কিছু কিছু সহিতে হইল।

এক ঢিলে অনেক পাখী মারিতে চেষ্টা করিয়াছি। রচনার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বহু ত্রুটি রহিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

আগামী দশ বৎসরের ভিতর এই কেতাবের "হুঁকো-নল্‌চে দুইই বদলানো" আবশ্যক হইলে যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা পাইবে। এই বুঝিয়া বাঙলার বিজ্ঞান-সেবীরা এবং বিদ্যা-"সংরক্ষকে"রা ভাবুকতার বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বোৎসেন, ত্রেন্তিনো [ইতালি]

১৪ নবেম্বর ১৯২৪

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

হিন্দু নরনারীর শাসন-দক্ষতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্য-শাসনে হিন্দু সমাজ

চতুর্থ অধ্যায়

গণ-তন্ত্রের হিন্দুরাষ্ট্র

হিন্দুরাষ্ট্রের-গড়ন

প্রথম অধ্যায়

হিন্দু নরনারীর শাসনদক্ষতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু শাসনে ধনদৌলত

ব্যক্তির দর

(১)

ব্যক্তির উপর সমাজের এক্তিয়ার কতখানি? প্রত্যেক রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা প্রথমেই মনে আসে। হিন্দু নরনারীর শাসন-দক্ষতা আলোচনা করিবার সময়ও এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া আবশ্যক।

কি হিন্দু সমাজে, কি পাশ্চাত্য বা খৃষ্টিয়ান সমাজে, কি মুসলমান এবং চীনা ও অন্যান্য সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সম্বন্ধের কথা লইয়া নানা মত ও আদর্শ প্রচারিত আছে। কিন্তু আসল কথাগুলা ধরা পড়ে

খাঁটি আইন কানুনের ধারার ভিতর। কাজেই জিজ্ঞাস্য, হিন্দু নরনারীরা ব্যক্তি সম্বন্ধে কিরূপ আইন কায়েম করিয়াছিল?

ভারতবর্ষ বিশাল। এই মহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রান্তের সকল মুল্লুকের আইন কানুনগুলা পরিষ্কাররূপে জানা আছে, একথা বলা চলে না। অধিকন্তু অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজের কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ আইন প্রচলিত ছিল সেই বিষয়েও "নৃতত্ত্ব"-বিদ্‌গণের গবেষণা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কাল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে চোল সাম্রাজ্যের অবসান। এই ষোল সতের শ বৎসরের ভিতর হিন্দু রাষ্ট্রে ব্যক্তির ঠাঁই কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার উপায় কিছু কিছু আছে।

(২)

একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর "মিতাক্ষরা" রচনা করেন (১০৫০)। এই গ্রন্থ প্রাচীনতর আইন-জ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রণীত বা সঙ্কলিত গ্রন্থের ভাষ্য এবং টীকাটিপ্পনী মাত্র। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আইন-পণ্ডিত। "মিতাক্ষরা" গোটা ভারতের আইন।

প্রায় সেই সময়েই—বস্তুতঃ দুই তিন পুরুষের ভিতর—বাংলা দেশের জন্য কতকগুলা আইন সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাদের সংক্ষিপ্ত নাম 'দায়ভাগ' (১১৫০)। সঙ্কলন কর্ত্তার নাম জীমূতবাহন। বিজ্ঞানেশ্বরের মতন জীমূতবাহনও নতুন কোনো বিধান সৃষ্টি করেন নাই। প্রাচীনতর স্মৃতি-কার অর্থাৎ আইন-লেখকদের রচনাবলীর উপর টীকাটিপ্পনী ঝাড়াই জীমূতবাহনের কাজ। মনু-প্রণীত বা মনু-সঙ্কলিত আইন গ্রন্থের ভাষ্য হিসাবেই "দায়ভাগ" ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত। মনু যাজ্ঞবল্ক্যের

পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহার কাজকর্ম্ম চুঁড়িতে হইবে।

"মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগ" কতকগুলা ভাবুকতাপূর্ণ আদর্শে ভরা রচনা নয়। নিরেট আইনের চোখে ব্যক্তির কিম্মৎ কতটা তাহাই এই দুই কেতাবে দফায় দফায় আলোচিত হইয়াছে। ভারতের যে যে জনপদে এবং যে যে যুগে এই দুই আইন গ্রন্থের বিধান চলিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে এবং সেই সকল কালে হিন্দু নরনারীর শাসন-দক্ষতা সম্বন্ধে যথার্থ সাক্ষ্য পাওয়া যায় বলিতে হইবে। এই শাসন দক্ষতাটা উঁচু দরের কি নীচু দরের সেকথা স্বতন্ত্র।

(৩)

হিন্দুদের "স্মৃতিশাস্ত্রে" অর্থাৎ আইন-গ্রন্থে ব্যক্তির দর কি? সমাজে ব্যক্তির ইজ্জৎ বুঝা সম্ভব নানা উপায়ে। এক উপায় হইতেছে ধনদৌলত, স্বত্ব বা সম্পত্তি বিষয়ক আইন।

খৃষ্টিয়ান সাহিত্যের মতন হিন্দু সাহিত্যেরও এখানে ওখানে 'অর্থমনর্থম্' ইত্যাদি বয়েৎ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া হিন্দু নরনারী সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র অর্থকে অনর্থ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। "মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগ" এই দুই আইনে শাসিত সমাজ অর্থকে অনর্থ সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত নয়।

বর্ত্তমান ভারতের উকীল-পণ্ডিতেরা এই দুই গ্রন্থের এপীঠ ওপীঠ খুব ভাল করিয়াই আলোচনা করিয়া থাকেন। ইংরেজ কোলব্রুক ও মেইন, ফরাসী জিবল্যাঁ, এবং জার্ম্মাণ য়োলী ইত্যাদি বিদেশী পণ্ডিতেরাও ধন-দৌলত বিষয়ক হিন্দু আইন সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন।

"মিতাক্ষরা" ও "দায়ভাগ"

(১)

একটা বিধান বিবৃত করা যাউক। কোনো ব্যক্তির দুই পুত্র, "ক" ও "খ"। "ক" ১ এবং ২ নামক দুই পুত্র রাখিয়া মারা গেল। "খ" ও মারা গেল, সন্তান সংখ্যা তাহার চার, ৩, ৪, ৫, ও ৬।

ঐ ব্যক্তি—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পিতামহ—যখন মারা পড়িবে, তখন তাহার ধন দৌলত পাইবে কে বা কাহারা? হিস্যাই বা নির্দ্ধারিত হইবে কোন্ নিয়মে? এই সকল প্রশ্নের জবাবে 'দায়ভাগ' এবং 'মিতাক্ষরা' দুইয়েরই মত একরূপ।

পিতামহের সম্পত্তি ক ও খ এই দুই পুত্রের ভিতর সমান সমান ভাগাভাগি হইবে। এই দুই হিস্যা পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে। প্রথম হিস্যাটা 'ক' র দুই সন্তান ১ ও ২ এর ভিতর সমান সমান বাঁটিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় হিস্যাটাও আবার "খ"এর চার সন্তানের ভিতর সমান সমান ভাগাভাগি করা হইবে। অতএব ১ এবং ২ ইহারা প্রত্যেকে যতটা পাইবে, ৩, ৪, ৫, এবং ৬ ইহারা প্রত্যেকে তাহার চেয়ে কম পাইবে।

(২)

এই বিধান দেখিয়া ইংরেজ পণ্ডিত মেইন তাঁহার "প্রতিষ্ঠান বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাস" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮৭৫) বলিয়াছেন:—সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ভাগাভাগি সম্বন্ধে মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উন্নত আধুনিক সমাজের নিয়ম মানিয়া চলে।

মেইনের মতে, অনুন্নত এবং অতি-প্রাচীন সমাজে পিতামহের সম্পত্তি পৌত্রদের ভিতর ছয় সমান হিস্যায় বাঁটিয়া দেওয়া হইত। "ক" ও "খ" নামক দুই মৃত পুত্রের কোনো ঠাঁই থাকিত না। প্রাচীনেরা "কাপিতা" বা

মাথা গুণিয়া সকল বংশধরকে সমান ইজ্জৎ দিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আধুনিকেরা সকল বংশধরকে সমান বিবেচনা করে না। বংশের "গোড়া"টাকে ধরিবার দিকে নবীন এবং উন্নত সমাজের দৃষ্টি। কাজেই পুত্রের ঠাঁই এই সকল সমাজের আইনে পৌত্রের ঠাঁইয়ের চেয়ে উঁচু।

প্রাচীন বা তথাকথিত "অনুন্নত" এবং আধুনিক বা তথাকথিত "উন্নত" সমাজের প্রভেদ সম্বন্ধে মেইন যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা চলে না। ইয়াঙ্কি নৃতত্ত্ববিৎ লোহ্বি "আদিম সমাজ" নামক গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক ১৯২০) এই তথাকথিত উন্নত সমাজের আইন প্রাচীন নরনারীর বিধানেও আবিষ্কার করিয়াছেন। তথাকথিত অনুন্নত সমাজে ও "স্তির্পেস" অর্থাৎ বংশের গোড়া অনুসারে ধনদৌলতের বখরা হওয়া দেখা যায়।

(৩)

ধনদৌলত বিষয়ক আইনে হিন্দু নরনারীর শাসনদক্ষতা উন্নত শ্রেণীর কি অনুন্নত শ্রেণীর তাহা আলোচনা করা সম্প্রতি অনাবশ্যক। বংশের গোড়ার ইজ্জৎ হিন্দু আইনে বিধিবদ্ধ, এই তথ্যটাই প্রধান কথা।

এই তথ্যটার দাম কি ? যৌথপরিবারে পৌত্রেরা আর্থিক হিসাবে পিতামহের অধীন নয়, পিতার অধীন। অথবা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে জনকের এক্তিয়ার মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। ধন-দৌলতের ভাগবাটোয়ারায় ব্যক্তিমাত্রেই স্বরাট্‌।

হিন্দু নরনারীর শাসন-দক্ষতা আলোচনা করিবার সময় এই ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ধনদৌলতের শাসন বিষয়ে ব্যক্তির উপর পরিবারের, পল্লীর, "শ্রেণী"র অথবা অন্য কোন জনসঙ্ঘের কোন এক্তিয়ার নাই, "মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগ" এই কথা বলিতেছে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম

(১)

হিন্দুসমাজকে খৃষ্টিয়ান বা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পণ্ডিতমহলে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই চেষ্টার পশ্চাতে যুক্তির জোর নাই।

কন্‌ষ্টান্টিনোপলের "রোমাণ" বাদশা যুস্তিনিয়ান (৫২৬—৫৬৫ খৃঃ অঃ) কয়েক জন উকীল বাহাল করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আমলের আইনগুলা একত্রে প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্কলন গ্রন্থ "দিজেস্ত্" নামে পরিচিত। তাঁহার নিজের আমলের আইনগুলা স্বতন্ত্র সঙ্কলিত হয়। এই সঙ্কলনের নাম "ইন্‌স্তিতিউৎ"।

"দিজেস্ত্" এবং "ইন্‌স্তিতিউৎ" নামক রোমাণ স্মৃতিগ্রন্থের ভিতর পাশ্চাত্য নরনারীর শাসন-দক্ষতা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল আইনের চোখে ব্যক্তির ইজ্জৎ কিরূপ তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। ভারতীয় অথবা অন্যান্য এশিয়ান উকীল-পণ্ডিত এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। অন্ততঃ পক্ষে "মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগে"র সঙ্গে "দিজেস্ত" এবং "ইন্‌স্তিতিউৎ"এর দফায় দফায় তুলনা করিয়া দেখা হয় নাই।

সেই তুলনা সাধন বর্ত্তমান গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তুলনা সুরু হইলেই দেখা যাইবে যে, রোমাণ স্মৃতি-পণ্ডিতেরা আর হিন্দু আইন-ওস্তাদেরা নরনারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে এক চোখে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

(২)

কিন্তু তাহা বলিয়া "বর্ত্তমান" জগতের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব "মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগ" কর্ত্তৃক শাসিত নরনারীর

সমাজে ছিল কি? কথনই না। বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তিত্ব "দিজেস্ত" এবং "ইন্‌স্তিতিউৎ" শাসিত সমাজেও ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্প-চালিত যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানার আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার ফলে কি মজুর, কি শিল্পী, কি ধনী, কি কেরাণী, কি কর্ম্মাধ্যক্ষ সকল মহলেই গতিপ্রবণতা দেখা দিয়াছে। বাজারের "খোলামাঠে" দাঁড়াইয়া প্রায় প্রত্যেক নরনারীই কম বেশী স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ে দরদস্তুর করিতে শিখিয়াছে। এই আবহাওয়ায় যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা ইয়োরোপের কোনো যুগের কোনো সমাজে পাওয়া যাইবে না। তাহার তুলনা এশিয়ারও কোনা যুগে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কথাটা মনে রাখিলে "মিতাক্ষরা" এবং "দায়ভাগ" কর্ত্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সীমানা হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

(৩)

আর একটা কথা মনে রাখা আবশুক। কি রোমাণ ব্যক্তিত্ব, কি হিন্দু ব্যক্তিত্ব, দুইই নরনারীর উপর সমাজশাসনের বিরোধী। গোষ্ঠী, জাতি, পঞ্চায়ৎ, পল্লী, শ্রেণী বা আর কোনো দল আসিয়া ব্যক্তির ধনদৌলত সম্বন্ধে একতিয়ার ঘটাইবে, এইরূপ চিন্তা করা যুস্তিনিয়ানের উকীলদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, —মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনের পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না।

অর্থাৎ হিন্দুদের আইনগুলা "কমুনিজম" বা ধনসাম্য-নীতির বিরোধী। তাহা সত্ত্বেও কি ইয়োরোপে, কি ভারতে ধনসাম্যনীতির বহু দৃষ্টান্ত সামাজিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ চুঁড়িতে হইবে "চরিত্রে" বা লোকাচারে। এই লোকাচারগুলা "মান্ধাতার আমলে"র ধনসাম্য-নীতির জের বিশেষ। কিন্তু মৌর্য্য আমল হইতে সেন-চোল আমল পর্য্যন্ত ভারতের "আইনে" নরনারীরা ধনসাম্য-পন্থী লোক নয়। এই মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ বাহির করা কঠিন। কোনো অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান লেখকের নজরে পড়ে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুশাসনে পুরুষ ও নারী

এইবার আর এক তরফ হইতে হিন্দু রাষ্ট্রে ব্যক্তির মূল্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। আইনের চোখে নারীর কিম্মৎ কতটা? অর্থাৎ পুরুষ ও নাবীর পবস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে হিন্দুরাষ্ট্র কিরূপ কানুন মানিয়া চলিত?

পাশ্চাত্য সাহিত্যে নারীজাতির চরম নিন্দা আছে, আবার চরম প্রশংসাও আছে। ভারতীয় সাহিত্যেও ঠিক এইরূপই নারীজাতিকে স্বর্গে তোলা হইয়াছে, আবার নরককুণ্ডেও পাঠানো হইয়াছে। এই সব "মতামত" ও লোকাচার ছাড়াইয়া উঠিলে নিরেট তথ্য,—আইন সম্মত বিধান—কি দেখিতে পাই? জর্ম্মান পণ্ডিত য়োলি তাঁহার "ষ্টাট্লিখেস্ উণ্ড্ সোৎসিয়ালেস লেবেনইম্ ইণ্ডিয়েন" অর্থাৎ "ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ কথা" নামক প্রবন্ধে (ষ্টুটগার্ড ১৯২২) এই সকল মতামত ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই।

আবার ধনদৌলত সম্বন্ধে নারীর অধিকার আলোচনা করা যাউক। এই জন্য আবার বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনকে সাক্ষী ডাকা হউক। এই দুই আইনজ্ঞের বিধান বর্ত্তমান ভারতের উকীলমহলে সুপরিচিত। হিন্দু-শাসনে স্ত্রী-ধনের ঠাঁই সম্বন্ধে দেশী বিদেশী বহু পণ্ডিতই গবেষণা চালাইয়াছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ক হিন্দু আইন" নামক ইংরেজি গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৮৯৬) সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ত্রী-ধন

(১)

“স্ত্রীধন” সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর আর জীমূতবাহন একপ্রকার বিধানই জারি করিয়াছেন। উভয়েরই রায় এক কথায় নিম্নরূপ :— “স্ত্রী-ধনের উপর স্বামীর কোনো এক্‌তিয়ার খাটে না।”

স্ত্রী-ধন কাহাকে বলে? স্ত্রীর বিশেষ ধনদৌলত। এই ধনদৌলত স্ত্রীর অধিকারে আসে কিরূপে? গৌতমের আইন্ অনুসারে (১০।১১৫) স্বত্বে অধিকার জন্মিতে পারে পাঁচ উপায়ে। উত্তরাধিকারের জোরে, দাম দিয়া কিনিবার জোরে, ভাগবাটোআরায় হিস্সা পাইবার জোরে, দখল করিবার জোরে এবং সৌভাগ্য বশতঃ খুঁজিয়া পাইবার জোরে মানুষ সম্পত্তির অধিকারী বিবেচিত হয়। গৌতম মনুর চেয়ে প্রাচীন লোক। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমের “ধর্ম্মসূত্র” নামক আইন-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

নারীও এই পাঁচ উপায়েই ধনদৌলতে অধিকার লাভ করে। কিন্তু যে উপায়েই স্ত্রী-ধনের উৎপত্তি হউক না কেন,—যাজ্ঞবল্ক্য (১৪৭) এবং তাঁহার ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বর (২।১১।৩১,৩২) স্বামীর কর্ত্তৃত্ব হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। “দায়ভাগের” বিধানেও (৪।১।১, ২) স্ত্রী-ধনের স্বাধীনতা অসীম। আবার কোনো অপুত্রকের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায় তাহার বিধবা পত্নী। স্বামীর ধনদৌলতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার “দায়ভাগে” (১১।১।২,৭) এবং “মিতাক্ষরায়” (২।১।২,৭) সমান ভাবে বিধিবদ্ধ। তবে বিধবা তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারে পাওয়া ধন বিক্রী করিতে অধিকারী নয়

(২)

বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনের স্ত্রী-ধন বিষয়ক পাঁতি দেখিয়া ইংরেজ-পণ্ডিত মেইন যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, হিন্দুরাষ্ট্র নারীজাতিকে ধনদৌলত সম্বন্ধে নবীনতম পাশ্চাত্য রাষ্ট্র সমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী এক্তিয়ার দিয়াছে। পুরাণো ইয়োরোপীয় আইনে স্ত্রীধন-বিষয়ক বিধান স্ত্রীজাতির উপর সুবিচার করে নাই। মেইন-প্রণীত "প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত গ্রন্থে এই মত প্রচারিত হইয়াছে।

এইখানে স্ত্রী-ধন বিষয়ক পাশ্চাত্য আইন আলোচনা করা আবশ্যক। রোমাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ লইয়া ইংরেজ জজ-পণ্ডিত মাকেঞ্জি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ষ্টাডিজ ইন্ রোমাণ ল" নামক গ্রন্থে আলোচনা করেন। তাহাতে "পারাফার্ণা" বা যৌতুক-সদৃশ স্ত্রী-ধনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুস্তিনিয়ানের আমলের "দিজেস্ত্" এবং "ইন্স্তিতিউৎ" আইনে স্ত্রী-ধনকে "দস্" বলা হয়। এই দস্-বিধানই পরবর্ত্তী কালে "দো" নামে ইয়োরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যুস্তিনিয়ানের দেখাদেখি ফরাসী নরপতি নেপোলিয়ান সেকালের প্রচলিত স্মৃতি বা আইনগুলাকে সাজাইয়া গুছাইয়া একত্রে প্রচার করিয়াছেন। নেপোলিয়ানী সংহিতা বা সঙ্কলনকে বলে "কদ্ নাপোলেওঁ"। এই "কদ্ নাপোলেওঁ"ই উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজের নানা কেন্দ্রে নানা আইনের জন্ম দিয়াছে।

"দস্" বা "দো" বিষয়ক আইনটা কি? স্ত্রী তাহার "পারাফার্ণা" বা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যৌতুক-সদৃশ সম্পত্তি মাত্রের উপর এক-চেটিয়া অধিকার ভোগ করে। অন্যান্য ধনদৌলত যাহা কিছু স্ত্রীর

হাতে যে-কোন উপায়েই আসুক না কেন, সবই সে পরিবারের ঘর-কন্না বা গৃহস্থালীর সম্পত্তি বিবেচনা করিতে বাধ্য। যাহা কিছু গোটা গৃহস্থালীর সামিল হয়, তাহারই নাম "দো" (ফরাসী) বা "দস্" (ল্যাটিন)। হিন্দুমতের "স্ত্রী-ধন" বলিলে ইয়োরোপে আবহমান কাল হইতে বুঝা হইয়া আসিতেছে কেবল "পাবাফার্ণা" মাত্র।

(৩)

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ "কদ্ নাপোলেঅঁ"র বিধান ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে ছাড়ে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে জারি হইয়াছে "বিবাহিত নারীর সম্পত্তি বিষয়ক আইন।" এই আইন সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত বুৎমি তাঁহার "উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ জাতি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বিলাতের লোকেরা ইহার বিধানে অন্যান্য ইয়োরোপীয় নরনারী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। বিলাতের এই আইনে নারীজাতিকে স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। "কদ্ নাপোলেঅঁ" অনুসারে নারীজাতি ধনদৌলতের পূরাপূরি মালিক হইতে পারে না।

বুৎমির মতে ইংরেজ আইন ফরাসী এবং অন্যান্য আইনের চেয়ে অগ্রগামী। মেইন বলিতেছেন :—"১৮৮৬ সালের ইংরেজ আইনও জীমূতবাহন এবং বিজ্ঞানেশ্বরের ধাপে উঠিতে পারে নাই। হিন্দুশাসনে স্ত্রীধন অপূর্ব্ব স্বাধীনতার কেন্দ্র। এই ধনে স্বামী হাত দিতে ত পারেই না। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যাহাতে এই ধন পুরুষ আত্মীয়ের উত্তরাধিকারে না আসিয়া নারী-আত্মীয়ের উত্তরাধিকারে আসে তাহার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে।" "মিতাক্ষরা" (১।৩।৮,৯,১০ এবং ২।১১।৯, ১২,১৩) স্ত্রী-ধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

হিন্দুনারী ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

(১)

হিন্দু জাতির শাসন-দক্ষতার খতিয়ান করিতে বসিলে আইনের চোখে নারীর স্বাধীনতার কথা কোনমতেই নিচু ঠাঁই অধিকার করিবে না। নারীর স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব হিন্দু আইনে বিধিবদ্ধ। পুরুষ ও নারীর ধন দৌলত বিষয়ক সম্বন্ধ বিচার করিবার ক্ষেত্রে জীমূতবাহন বা বিজ্ঞানেশ্বর পুরুষের দিকে টানিয়া পাঁতি দেন নাই।

তাহা সত্ত্বেও হিন্দুনারীকে "আধুনিক নারীর" মত স্বাধীন বলা চলে কি? কোনমতেই না। ইংরেজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি "নারী জাতির গোলামী" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। জার্মাণীর "সোশ্যালিষ্ট" ধনবিজ্ঞানবিৎ বেবেলও প্রায় সেই সময়ে "নারী" নামক গ্রন্থে নারী জাতির দাসত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইঁহারা যে দরের "ফেমিনিজম্" বা স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য সমাজে দেখা দিয়াছে। সেই দরের "ফেমিনিজম্" বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহনের বিধানে পাওয়া যাইবে না। তবে তাহার প্রাথমিক ভিত্তি হিন্দু স্ত্রী-ধন সম্পর্কিত আইনের ভিতর আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান জগতে "শিল্প-বিপ্লবে"র দরুণ স্ত্রীজাতি ক্রমে ক্রমে পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়া দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ধাপে ধাপে পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় সমানে সমানে লড়িতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আর্থিক জীবনযাপনের এই সকল শক্তি স্ত্রীজাতিকে অন্যান্য সকল বিষয়েও পুরুষের সঙ্গে সমান করিয়া তুলিতেছে। বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন এক অভিনব কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি। তাহার আলোচনা সম্প্রতি অপ্রাসঙ্গিক। জার্ম্মাণ

মহিলা গার্ট্রুড্ ব্যয়মার প্রণীত "হ্যাণ্ডবুথ ড্যর ফ্রাওয়েন্ বেহ্বেগুঙ্"
(বার্লিন, ১৯০১,১৯০৬) নামক নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই কর্ম্মকাণ্ডের জন্ম কথা সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত আছে।

(২)

"আইনতঃ" সেকালের হিন্দু নারী "বর্ত্তমান" যুগের পাশ্চাত্য নারীর পশ্চাতে নয়। কিন্তু আর্থিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নারী হিন্দুনারীকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। "নব্যনারী" হিন্দুনারী হইতে শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট সে কথা বলা হইতেছে না।

"আধুনিক নারী" কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? তাহা জরীপ করা কঠিন নয়। ইয়োরামেরিকার "সাফ্রেজ" বা ভোট-ক্ষমতায় নারীর আজ কি ঠাঁই তাহা দেখিলেই বর্ত্তমান জগতের দৌড় মাপা সম্ভব।

এই বিষয়ে ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ্-বার্ত্তেলেমি "ল' হ্বট দে ফ্যাম্" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (প্যারিস, ১৯২০)। "নারী জাতির ভোট অধিকার" কেতাবের অন্যতম মর্ম্মকথা এই যে, "ল্যাটিন" রমণীরা ভোটের ক্ষমতা পাইয়াও সেই ক্ষমতা কাজে লাগাইতে শিখে নাই। গ্রন্থকারের "ল্যাটিন" জাতীয় নারী শব্দে ফরাসী, ইতালিয়ান, স্পেনিষ ইত্যাদি নারী বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে সমান হইবার আন্দোলনে নারীরা ফ্রান্সে, ইতালিতে এবং স্পেনে কার্য্যতঃ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। যে সকল পর্য্যটক ও সমালোচক জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রীয়া ও সুইট্জার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি জার্ম্মাণি বা টিউটনিক জাতীয় মুল্লুকের ঘরের কথা জানেন, তাঁহারাও বলিবেন যে এই সকল দেশের নারী ঘরকন্না এবং গৃহস্থালীকেই আজও স্ত্রীর স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

আজি যুক্তরাষ্ট্রের নারী বিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সকল দেশের নারী হইতে বেশী অগ্রসর। এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু এই মার্কিণ মুলুকেই পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও "আধুনিক" নারীর উদ্ভব হয় নাই। বাজারে দাড়াইয়া পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বঘটে সাম্য ভোগ করা মার্কিণ নারীর দস্তুর ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে ইয়াঙ্কি নারীরা "ঘর-কুনো" ছিল এবং গৃহস্থধর্ম্ম পালনকেই রমণীর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি বিবেচনা করিত। অধ্যাপক কালহুন প্রণীত তিন খণ্ডে বিভক্ত "আমেরিকান পরিবারের সামাজিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থে (ক্লীভল্যাণ্ড, ১৯১৭-১৯১৯) তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানেশ্বরের এবং জীমূতবাহনের আইনে শাসিত সমাজে নারীর ক্ষমতা ও অক্ষমতা বুঝিবার জন্য বর্ত্তমান জগতের দৌড় কতখানি বা কতটুকু তাহা সর্ব্বদা নজরে রাখা আবশ্যক। জীবনের সাড়াসমূহ গুণিতে বা মাপিতে সুরু করিলে প্রাচ্য নারীত্বে আর পাশ্চাত্য নারীত্বে কোন প্রভেদ মালুম হইবে না।

পরিশিষ্ট নং ১

ধর্ম্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য

ধনদৌলত আর নারীর ইজ্জৎ এই দুই দফায় হিন্দু জাতির শাসন-দক্ষতা বুঝিবার জন্য বিজ্ঞানেশ্বর এবং জীমূতবাহন এই দুই আইনাচার্য্যের রচনাকে সাক্ষী মানা হইল। ইহাঁরা একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীকেরা কোন্ নিয়মে কাজ চালাইতেন? গুপ্ত আমলের জজেরাই বা কোন্ আইন মানিয়া চলিতেন? হর্ষবর্দ্ধন, পুলকেশী ইত্যাদি সম্রাটদের শাসনে ধনদৌলত এবং নারীর কানুন কিরূপ ছিল?

এই সকল বিষয়ে খাঁটি জবাব পাওয়া কঠিন। আথেনিয় আইনাচার্য্য সোলনের সন তারিখ জানা আছে। রোমে কখন কোন্ আইন জারী হইল, কখন কোন্ আইন উঠিয়া গেল, সে সব কথা লইয়াও সাধারণতঃ কোন গোল বাঁধে না। গ্রীক ও রোমাণ আইন-সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু গৌতম, বৌধায়ন বা আপস্তম্বের "ধর্ম্মসূত্র" মৌর্য্য আমলে ভারতবাসীর আইন বিবেচিত হইত এ কথা সপ্রমাণ করা সহজ কথা নয়। সেইরূপ পরবর্ত্তীকালে বশিষ্ঠ অথবা মনু অথবা বিষ্ণু অথবা নারদ অথবা বৃহস্পতি ইত্যাদির নামে প্রচলিত "স্মৃতি" গ্রন্থগুলাকে সম-সাময়িক রাষ্ট্রের "পেনাল কোড", সম্পত্তি বিষয়ক আইন বা চুক্তির কানুন বিবেচনা করা উচিত কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ। এমন কি কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"কেই বা আইন বিবেচনা করা চলে কি? আলোচনা আবশ্যক।

এই সকল সন্দেহ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির শাসন দক্ষতার অনেক কথাই অস্পষ্ট থাকিবে। প্রাচীন ইয়োরোপীয়ানদের তুলনায় প্রাচীন ভারতসন্তান নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তি কি চোখে দেখিত তাহার যথাযথ চিত্র পাওয়া কঠিন হইবে।

"ধর্ম্মসূত্র" এবং "স্মৃতিশাস্ত্র" গুলাকে পুরাপুরি আইন সমঝিয়া লইয়া ফরাসী পণ্ডিত জিব্‌লঁ সেকালের গ্রীক রোমাণ এবং টিউটন জাতীয় নরনারীর শাসন-দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর শাসন-দক্ষতার তুলনা সাধন করিয়াছেন। "এতুদ্‌ স্যের ল' দ্রোআ সিভিল দেজ্‌ অঁ্যাদু" (হিন্দুজাতির ব্যক্তি সম্বন্ধীয় আইন) নামে তাঁহার গ্রন্থ দুই ভাগে পোঁদিশেরিতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৪৬)। যাঁহারা পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রভেদ চুঁড়িতে ব্যস্ত তাঁহারা এই তুলনামূলক আলোচনায় নিজের মনমাফিক কোন তথ্য পাইবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক প্রতিষ্ঠান

যৌন সম্বন্ধের শাসন

ব্যক্তিগুলা আল্‌গা আল্‌গা বসবাস করে না। ইহাদের পরস্পর মেলমেশ ঘটিতে বাধ্য। এই মেলমেশকে হিন্দুনরনারী শাসন করিয়াছে কোন্ প্রণালীতে?

এক শ্রেণীর মেলমেশ যৌনসম্বন্ধের মূর্ত্তি গ্রহণ করে। সোজা কথায় তাহার নাম বিবাহ। পরিবার সৃষ্টি তাহার ফল।

মৌর্য্য আমল হইতে চোল আমল পর্য্যন্ত ভারতে পারিবারিক প্রথা কখন কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? অথাৎ যুগে যুগে এবং প্রদেশে প্রদেশে ভারতবাসী বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ আইন কায়েম করিয়াছে?

প্রশ্নটা এত সোজা যে শুনিবামাত্র না হাসিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আসল কথা, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অতি কঠিন। কেননা এইখানেই ভারতীয় রক্ত-সংমিশ্রণের ইতিহাসটা বাহির হইয়া পড়িবার কথা। আর তাহা হইলেই হিন্দুর "জাতিভেদ" বা "বর্ণাশ্রম" প্রথার উপর অপূর্ব্ব আলোক পড়িবার সম্ভাবনা।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর দেশীবিদেশী পণ্ডিতেরা সমসাময়িক "জাতিভেদ"কে ভারতের "সনাতন"-কিছু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ইহা "ভারততত্ত্ব"-বিদ্‌গণের চিন্তায় একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ। এই বুঝিয়া তাঁহারা বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল যুগে এবং সর্ব্বত্র জাতিভেদের শিকড় অথবা ষোলকলায় জাতিভেদের নানা অনুষ্ঠান খুঁজিতেছেন। কি ঋগ্‌বেদ, কি জাতক, কি মহাভারত যেখানেই "বর্ণ" শব্দের ছায়া মাত্র পাওয়া যায়, সেই খানেই "বর্ণাশ্রম" পাকড়াও করিবার বাতিক দেখা যায়।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে যে আজ-কালকার সুপরিচিত "জাতপাঁত" ছিল তাহার প্রমাণ কি কি? মৌর্য্যকাল হইতে পরবর্ত্তী দেড় হাজার বৎসরের ভারতীয় সহিত্যে "বর্ণাশ্রম" অথবা "জাতিভেদ" শব্দটা দেখিবামাত্র তাহার ভিতর আধুনিক প্রতিষ্ঠানটা আবিষ্কার করা হয় কিসের জোরে?

আট প্রকার বিবাহ এবং হিন্দুজাতির সামরিক ও আর্থিক ইতিহাস

যৌন সংস্রব বা রক্ত-সংমিশ্রণের তরফ হইতে হিন্দু জাতির বিবাহ প্রথা আজ পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নাই। "ধর্ম্মসূত্র" এবং "স্মৃতিশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ গুলায় বিবাহ বিষয়ক যে সকল বিধি নিষেধ আছে সেইগুলা পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু "নৃতত্ত্বে"র কষ্টিপাথরে ফেলিলে এই সমুদয় তথ্য অধিকাংশই অসম্পূর্ণ এবং অনেকটা পরস্পর বিরোধী বিবেচিত হইবে। এই গুলার সাহায্যে বিবাহিত জীবনের বাস্তব আইন আর সেই আইনের পৌর্ব্বাপর্য্য বাহির করা কঠিন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিবাহ ও স্ত্রীধন" (কলিকাতা ১৮৯৬) গ্রন্থে সেই সব হিন্দু "আইনে"র আলোচনা আছে। নারদঋষি আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। তাহাতে হিন্দু নরনারীর শাসন দক্ষতা সম্বন্ধে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। কোন কোন বিবাহের বিধানে "আধুনিকতার" চরমও দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার সাহায্যে বর্ণাশ্রম প্রথা পরিষ্কার হয় না।

এইপর্য্যন্ত বিনা আপত্তিতে বলা চলে যে, যে সকল যুগের কথা বলা হইতেছে সেই সকল যুগে উত্তর ভারতে "জননী-বিধি" ছিল না। জননীর

নামে বংশ চলিত না। বংশ এবং উত্তরাধিকার জনকের অধীন ছিল। সমাজ ছিল মাতৃ-প্রধান নয়, পিতৃ-প্রধান।

কিন্তু "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" নামে উত্তর ভারতে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহার পশ্চাতে "জননী-বিধির" ধাক্কা কতটা? সেইরূপ আবার "দক্ষিণে মাতুলীকন্যা" প্রবাদের "নৃতত্ত্ব" কোথায়?

সামরিক ইতিহাসের সাহায্যে ভারতীয় জনগণের উঠা নামা এবং চলাচল আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তাহার সঙ্গে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের গতিবিধি এবং আর্থিক জীবনের ওলট পালট সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল জুড়িয়া দেওয়া দরকার। এই দুই তরফ হইতে নৃতত্ত্বের উপর যে আলোক পড়িবে, সেই আলোকে ভারতীয় নরনারীর রক্তমাংস অর্থাৎ যৌনসম্বন্ধ বা বিবাহ আপনা আপনি ধরা দিবে। "হিন্দুচোখে চীনাধর্ম্ম" নামক ইংরেজি গ্রন্থে (শাংহাই ১৯১৬) এই ধরণের কিছু কিছু আলোচনা করা গিয়াছে।

সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এক সুবিস্তৃত "রিসার্চ্চ" গ্রন্থ লেখা হইয়া পড়িবে। আজকালকার বাজারে প্রচলিত হাজার মতের আবহাওয়ায় আর একটা মত দেখা দিবে মাত্র। তাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

"স্বধর্ম্ম"-নীতির পাশ্চাত্য ধারা।

তবে দু এক কথায় আলোচনা প্রণালীর ইঙ্গিত করিবার অবসর আছে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ও পূর্ব্ববর্ত্তী "ধর্ম্মসূত্র" ও "ধর্ম্মশাস্ত্র" এবং পরবর্ত্তী "স্মৃতিশাস্ত্র" ও "নীতিশাস্ত্রে"র মতনই "চাতুর্ব্বর্ণ্যে"র কথা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমের দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপ "স্বধর্ম্ম" ও বর্ণিত হইয়াছে। গোটা ভারতীয় সাহিত্যে,—কম সে কম সংস্কৃত সাহিত্যে "স্বধর্ম্ম" বিষয়ক দর্শনের ধারা অতি স্পষ্ট। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি মত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর এক অতি মামুলি কথা ছিল। তাঁহার "রিপাব্লিক" গ্রন্থের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় বর্ণ-ব্যক্তিনীতি-সাহিত্যের দর্শনই পুরামাত্রায় বিদ্যমান। তাহা বলিয়া প্লেটো যে সমাজে জীবিত ছিলেন সেই সমাজে বর্ণাশ্রমের স্বধর্ম "প্রাতিষ্ঠানিক" আকার গ্রহণ করিয়াছিল বলা চলে কি?

জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট ও হেগেলের ইংরেজ চেলারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেকটা প্লেটো-পন্থী ভাবুকতার জেরই চালাইতেছেন। ব্রাড্‌লে প্রচারিত "মাই ষ্টেশন অ্যাণ্ড ইট্‌স্ ডিউটিজ" অর্থাৎ "আমার ঠাঁই ও তদুপযোগী কর্ত্তব্য" "স্বধর্ম্ম" নীতিরই ভাষ্যমাত্র। বোসাঙ্কে-প্রণীত "ফিলজফিক্যাল থিয়রি অব্ দি ষ্টেট্" (লণ্ডন ১৮৯৯) অর্থাৎ "রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এবং "স্যম্ সাজেশ্‌চ্যান্‌স ইন্ এথিক্‌স্" (লণ্ডন ১৯১৮) অর্থাৎ "কর্ত্তব্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটা ইঙ্গিত" নামক গ্রন্থে মনুসংহিতা বা প্লেটো সূত্রেরই বয়েৎ প্রচারিত আছে।

বিলাতী দার্শনিক গ্রীণ এই মেজাজের লোক ছিলেন। আজকালের বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল ইত্যাদি পণ্ডিতেরাও কিছু কিছু সেই ধারাই বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। এই চিন্তা ধারার জোর কত বেশী তাহা বার্কার প্রণীত "প্লেটোর রাষ্ট্রনীতি" নামক গ্রন্থের (লণ্ডন ১৯১৮) প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ধরা পড়ে। তবে কি বলিতে হইবে যে, কাণ্ট্-হেগেলের দেশে আর "অক্‌স্‌ফোর্ড-দার্শনিকদের" সমাজে "স্বধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম চলিতেছে?

বর্ত্তমান ইতালির দার্শনিক ক্রোচে দক্ষিণ ইয়োরোপে এই দার্শনিক ধারারই প্রতিনিধি। তাহা হইলে ইতালির সমাজকেও কি বর্ণাশ্রমী-রূপে বর্ণনা করিতে হইবে?

বর্ণাশ্রমের বাস্তব ভিত্তি

এই সকল প্রশ্ন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি ভাবুকতাপূর্ণ আদর্শবাদে ভরা সাহিত্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সমাজের বাস্তব প্রতিষ্ঠানগুলা এই ধরণের সাহিত্যে ধরা পড়িতে পারে না। হয়ত বা কিছু কিছু পারে, কিন্তু সেই "কিছু কিছু" মাপিবার যন্ত্র কোথায়?

হিন্দুনরনারীর বাস্তব সমাজ কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার উপায় বড় বেশী নাই। অনেক লোকের বহুকাল ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে হয়ত একদিন স্বাধীন হিন্দুসমাজের গড়নটা ধরিতে পারা যাইবে। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে এই যে, ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে সমুদ্রগুপ্ত নামক হিন্দু নেপোলিয়নের নাম পর্য্যন্ত জানা ছিল না। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের বিপুল সাম্রাজ্য যে কি বস্তু তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুরা কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক শতাব্দী, অর্দ্ধশতাব্দী, পাদ এবং দশক সম্বন্ধে এই ধরণের নিবিড় অজ্ঞতা আজও ভারততত্ত্বজ্ঞ মহলে সুবিস্তৃত। যে সমাজের একটা বাদশার বা মন্ত্রীর বা সেনাপতির বা ধন-কুবেরের নাম পর্য্যন্ত জানা নাই, সেই সমাজের বিবাহ পদ্ধতি, যৌনসংশ্রব, কৌলিন্য-প্রথা, উচ্চ নীচ স্তরভেদ, শ্রেণী-বিবাদ ইত্যাদি সবই জানা আছে একথা বলিলে কিরূপ যুক্তিমত্তাব পরিচয় দেওয়া হয়? সন তারিখ সমন্বিত ভাবে কোনো রাজবংশ বা অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত বা মামুলি পরিবারের কোনো খবর পাওয়া যাইতেছে না, অথচ সেই বংশের আমলে নরনারী কোন্ "আদর্শে" জীবন যাপন করিত সবই বুঝিতে পারিতেছি, ইহা বলিবে

কে? অথচ পণ্ডিত অপণ্ডিত সকল মহলেই ঘরে বাইরে এইরূপ মতই চলিয়া আসিতেছে!

"দিগ্বিজয়ীর" চিত্ত বিশ্লেষণ

ভারতীয় সামরিক ও আর্থিক ইতিহাসের একদম কিছু জানা নাই, ১৯২৪ *সালে* একথা অতিমাত্রায় অত্যুক্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাংলার পাল সাম্রাজ্যে বাঙ্গালী সেনাপতি ছিলেন মন্ত্রিপ্রধান দর্ভপাণির পুত্র সোমনাথ। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ। নবম শতাব্দীর কথা।

সেনাপতি যখন ব্রাহ্মণ তখন পণ্টন বাছাই করা হইত কি একমাত্র "জেলে", "কৈবর্ত্ত", "হাঁড়ি", "চাঁড়াল", "ডোম" ইত্যাদি জাতি হইতে? মামুলি চিত্তের সাড়া যে সব লোকে বুঝিতে পারে তাহারা এসব কথা বলিবে না। সমর-জীবনের চিত্ত-বিজ্ঞান যাহারা আলোচনা করে তাহারা ত একথা বলিবেই না। কেন না, লড়াই আর প্রেমের মুল্লুকে "কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম" নীতিই একমাত্র ধর্ম্মের শাসন, একথা ঠিক বটে,—কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই বাছিয়া বাছিয়া "একমাত্র" হাঁড়ি আর ডোমের প্রেমে মজে না। লোকে চায় কাজ হাঁসিল।

এইবার রাজবংশগুলার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাউক। "মাৎস্যন্যায়" চলিত ভারতের যুগে যুগে অহরহ। কোষ্ঠীর দিনক্ষণ গুণিয়া যাহারা তথাকথিত "ক্ষত্রিয়" বংশে জন্মিত তাহাদের প্রায় কেহই নয়া নয়া রাজবংশ কায়েম করিতে পারে নাই। রাজবংশের স্রষ্টা ছিল কাহারা? প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভুঁইফোঁড় লোকেরা। শক্তিধর পুরুষ অন্যান্য শক্তিধরের সঙ্গে লড়িয়া ছলে বলে কৌশলে গদি দখল করিয়া বসিত। ইয়োরোপেও এইরূপ ঘটিয়াছে, ভারতেও এইরূপ ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই রাজবংশের প্রবর্ত্তকেরা সাধারণতঃ "ছোটলোকের" বাচ্চা।

রাজা হইয়া বসিবা মাত্র প্রত্যেকেরই চাই সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, গুপ্তচর, পেয়াদা, লাঠিয়াল, শরীর-রক্ষী ইত্যাদি লোক। ইহারাই পরবর্ত্তী কালে এক একটা "কুলীন" বা "অভিজাত" বা "ভদ্রলোক" সমাজের জন্মদাতা। বেশকথা। কিন্তু এই সকল লোক বাছাই করা হইত কোন্ নিয়ম অনুসারে? আবার চিত্তবিজ্ঞানের আলোচনা দরকার,—এইবার শক্তিধর সমরপিপাসু দিগ্‌বিজয়াকাঙ্ক্ষী সম্রাটের চিত্ত বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

এই ধরণের "বিজিগীষু" কোনো কেতাবী ফর্ম্মুলা বা সূত্র অনুসারে পেটোআ বাছাই করিবে কি? কখনই না। সেই ছেলে বেলায়, অজ্ঞাত কুলশীল থাকিবার সময়,—জেলে মুচি মুর্দাফরাস মাঝি ছুতার কামার কুমোর, হয় ত বা দু একজন ব্রাহ্মণ ও—যাহারা তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল তাহারাই এখন নয়া বাদশার মধুচক্রে মধু পান করিবে। ইহাই স্বাভাবিক।

অর্থাৎ ভারতে যতবার যত যায়গায় রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে ততবার তত জায়গায় নয়া নয়া কৌলিন্য, নয়া নয়া আভিজাত্য, অতএব নয়া নয় জাভিভেদ বা বর্ণাশ্রম সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই নয়া নয়া জাতিভেদের ছাপ "স্মৃতি" সাহিত্যে পড়িয়াছে কি?

বর্ণসঙ্কর ও আপদ্ধর্ম্মের "ভিতরকার কথা।"

বর্ণসঙ্কর নামে যাহা কিছু এই সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় সেই সবই বাস্তব ইতিহাসের মালমশলা। "আপদ্ধর্ম্ম" নামে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তি, আর ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি যে সব বুথ্‌নি আছে সেই সবই ভারতীয় ইতিহাসের আসল কথা। অথচ এই বর্ণ-সঙ্কর এবং আপদ্ধর্ম্মকে স্মৃতি-কারেরা বিশেষরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? করেন নাই।

"ধর্ম্ম" "স্মৃতি" এবং "নীতি" ও অন্যান্য সাহিত্যে "অসবর্ণ" বিবাহ, বর্ণসঙ্কর আর আপদ্ধর্ম্মের আলোচনা যারপরনাই কম ঠাঁই অধিকার করে। এত কম যে নেহাৎ পাণ্ডিত্যের খাতিরে যে সকল গবেষক প্রত্নতত্ত্বের অনুবীণ লইয়া কাজ করেন তাঁহাদের দৃষ্টিও এড়াইয়া যায়।

তাহা সত্ত্বেও কৌটিল্য, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইত্যাদি সকলকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ হিন্দুসমাজের ভিতরকার কথা কহাইয়া ছাড়িয়াছেন। "হাটে হাঁড়ী ভাঙা" হইয়াছে ১৩২৬ সালের বৈশাখের "প্রবাসী" পত্রিকায় (এপ্রিল ১৯১৯)। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচীন ভারতে লোকাল গবমেণ্ট (লণ্ডন ১৯১৯) এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "প্রাচীন ভারতে সঙ্ঘজীবন" (কলিকাতা ১৯১৯) গ্রন্থ দুইটায় ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র জাতির ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত হিল্লেব্রাণ্ট-প্রণীত "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি" (য়েনা ১৯২৩) এবং ষ্টাইন প্রণীত "মেগাস্থেনিস ও কৌটিল্য" (হ্বিয়েনা, ১৯২২) ইত্যাদি গ্রন্থেও এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দু "সাহিত্যে" এইরূপ "ধর্ম্মা"ন্তর গ্রহণ এবং রক্তসংমিশ্রণ আপদ্ধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু "বাস্তব ইতিহাসে" এইগুলাই ছিল খাঁটি ধর্ম্ম অর্থাৎ নরনারীর স্বাভাবিক এবং আটপৌরে কথা। আর তথাকথিত "স্বধর্ম্ম" পালনটাই ছিল ব্যতিরেক এবং সত্যসত্যই আপদ বিশেষ।

তাহা হইলে বলিব যে, বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ বা চাতুর্ব্বর্ণ্য বা স্বধর্ম্ম ইত্যাদির "ফর্ম্মূলা" বা সূত্র একটা দার্শনিক কাঠাম মাত্র। নরনারীর যৌন ও আর্থিক জীবনযাপনের নানাবিধ তথ্যকে "শ্রেণীবদ্ধ" করিবার জন্য হিন্দু সমাজের মাথাওয়ালা লোকেরা এই শৃঙ্খলা-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কৌশলটা যে "দার্শনিক" হিসাবে অতি উঁচুদরের তাহার

অন্যতম প্রমাণ এই যে, ইয়োরোপের ভাবুকতাপন্থী চিন্তাবীরেরা,—প্লেটোর আমল হইতে ব্রাড্‌লে ও ক্রোচে পর্য্যন্ত,—মানবজীবনের জন্য আর কোনো "আদর্শ" ঢুঁড়িয়া পাইতেছেন না।

এই সকল কথা মনে রাখিয়া ফরাসী পণ্ডিত সেনার-প্রণীত "লে-কাস্ত্‌-দাঁ-লঁ্যাদ" অর্থাৎ "ভারতের জাতিপ্রথা" নামক গ্রন্থের (প্যারিস ১৮৯৬) তথ্যগুলা সমালোচনা করিতে হইবে। জার্ম্মাণ পিশেল-প্রণীত "কাষ্টেন" অথবা হেবার-প্রণীত "হিণ্ডুয়িস্‌মুস্‌ উণ্ড বুডিস্‌মুস্‌" অর্থাৎ "হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধধর্ম্ম" (টিবিঙ্গেন ১৯২১) নামক গ্রন্থ দুইটাও এই বাস্তব ইতিহাসের তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

হাড়মাসের কোষ্ঠী গণনা।

বর্ণাশ্রমের বাস্তবভিত্তি ভারতীয় লোকগণনাবিভাগের ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কার্য্যফলে অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত "ইণ্ডো-আরিয়ান রেসেজ্‌" (রাজসাহী, ১৯ ৬) গ্রন্থ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রমাপ্রসাদ মাথা, নাক, চোক, মুখ ইত্যাদি মাপিয়া জাতিনির্দ্ধারণ করার পক্ষপাতী। পুরাণা তাম্রশাসন এবং অন্যান্য সাহিত্য হইতেও নৃতত্ত্ব উদ্ধার করিবার দিকে তাঁহার ঝোঁক আছে।

রমাপ্রসাদের কএকটা কথা ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান্‌। তথাকথিত "সনাতন" ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান যে সকল প্রদেশে তাহার বহির্ভূত মুল্লুকে,—যথা বাংলাদেশে—ব্রাহ্মণরা কোন্‌ জাতীয় লোক? ইহাদের "রক্তমাংসে" সনাতনী প্রদেশের ছাপ নাই। ছাপ আছে "ভোজপুরিয়া" অর্থাৎ বর্ব্বর এবং অহিন্দু বা অ-সনাতন নরনারীর হাড়মাসের।

এক কথায় এই সকল ভারতীয় প্রদেশের ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ রক্তের দাগে এক জাতীয় নরনারী। বিবাহের আইন, রক্তসংমিশ্রণের স্মৃতিশাস্ত্র, পারিবারিক প্রথার শারীরিক ভিত্তি, চাতুর্ব্বণ্য এবং স্বধর্ম্ম তাহা হইলে একদম নতুন চোখে বুঝিতে সুরু করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু লেখা আছে তাহাই "ইতিহাস নয়"। শরীরের হাড়মাসের কোষ্ঠীর ভিতর হিন্দু নরনারীর বিবাহ-প্রথা লুকাইয়া আছে। 'কুলজি' পুঁথির মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া এই নয়া কোষ্ঠীর গণনায় সময় দিতে পারিলে "বাস্তব" সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জনগণের সমাজ-কেন্দ্র

"গোষ্ঠী"র আখ্‌ড়া

রকমারি যৌন সম্বন্ধের ব্যবস্থা করা হিন্দু শাসন-দক্ষতার এক পরিচয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলামিশার অন্যান্য কেন্দ্রও প্রাচীন ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই গুলাকে এক কথায় "সামাজিক" প্রতিষ্ঠান বলা চলে। সামাজিক মেলমেশের ব্যবস্থা সমূহ আলোচনা করিলেও হিন্দুনরনারীর শাসনদক্ষতার নানা পরিচয় পাওয়া যাইবে। পরিবার এবং সমাজ এই দুই কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠানের শক্তিযোগ বদ্ধমূল।

বাৎস্যায়নের "কামসূত্র" গ্রন্থে যে যুগ ও যে জনপদের পরিচয় পাই তাহাতে "আড্ডা মারিবার" কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকেরা দল বাঁধিয়া "গোষ্ঠী" কায়েম করিত। আমোদপ্রমোদ পানাহার ইত্যাদি এই সকল গোষ্ঠীর প্রাণস্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি বিষয়ক রস-চর্চ্চাও গোষ্ঠীজীবনের এক লক্ষণ। রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চাও বাদ পড়িত না। "মুদ্রারাক্ষস" ইত্যাদি নাটক যে যে আড্ডায় সমালোচিত হয়, সেই সকল আড্ডার ইয়ারেরা "কৌটিল্য দর্শনে" ওস্তাদ সন্দেহ নাই।

নগর জীবন ও "নাগরিকে"র নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে গোষ্ঠী-কেন্দ্র অর্থাৎ "ইয়ারের দলের বারোয়ারিতলা" এবং আড্ডা মারিবার জনসঙ্ঘ বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত দেখা যায়। ইয়োরামেরিকায় যাহাকে "ক্লাব" বলে গোষ্ঠী নামক আখ্‌ড়াগুলা তাহারই ভারতীয় সংস্করণ। দল বাঁধিয়া

খানাপিনা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বজনিক খোসগল্পে যোগ দেওয়া হিন্দু নরনারীর স্বভাবের বহির্ভূত নয় এইরূপই বুঝা যাইতেছে।

বাৎস্যায়ন কোন্ যুগের বা কোন্ মুল্লুকের লোক ঠিক জানা যায় না। খৃষ্টাব্দের দু'একশ বৎসর এদিকে ওদিকে "কামসূত্রে"র সঙ্কলন-কাল ফেলা হইয়া থাকে।

ভারতের "সঙ্ঘ"-শক্তি

(১)

দলবদ্ধ জীবনযাপন হিন্দুসমাজে রকমারি রূপে দেখা দিয়াছিল রূপগুলা ভিন্ন ভিন্ন নামেও পরিচিত ছিল। অবশ্য প্রত্যেক নামের পশ্চাতে এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা থাকিত। বর্ত্তমান কালের বিভিন্ন নামধারী দলগুলার বিশেষত্ব এবং পরস্পর সম্বন্ধ ঠাওরাইয়া উঠা সহজ নয়। তবে বহু সংখ্যক দলে হিন্দু নরনারীর সামাজিক জীবন কেন্দ্রীভূত থাকিত। এই তথ্য হইতেই হিন্দু জাতির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সবিশেষ প্রমাণিত হয়।

পরবর্ত্তীকালে যে ব্যক্তি বুদ্ধ নামে দেবতা হইয়াছেন, শাক্য নামক বংশের বা জাতির সেই গৌতম (খৃঃ পূঃ ৬২৩—৫৪৩) দলবদ্ধ জীবনের আবহাওয়ায় লালিতপালিত হইয়াছিলেন। এইরূপ একটা দল গড়িয়া যাওয়া শাক্য-গৌতমের জীবনের অন্যতম কাজ। সেই কর্ম্ম-কেন্দ্র "সঙ্ঘ" নামে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অন্যান্য দলের পরিচায়ক প্রতিশব্দের মতন "সঙ্ঘ"ও একটা পারিভাষিক শব্দ। পাণিনি (৩৩,৪২,৫।৩,১১২—১১৪) "সঙ্ঘ" শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। পাণিনি শাক্য-গৌতমের আগেকার লোক কি পরেকার লোক অথবা সমসাময়িক সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মোটের উপর ধরিয়া লইতে

পারিলে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান হিন্দু নর নারীর সমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

বোধ হয় যে কোনো সার্ব্বজনিক কর্ম্মকেন্দ্র সঙ্ঘ বলিয়া পরিচিত হইত। জীবন দলবদ্ধ হইবা মাত্র সঙ্ঘ নামের দাবী করিত। আজকালকার দিনে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় বিদ্যায় যাহাকে "কর্পোরেশুন" বলে সঙ্ঘকে তাহার প্রতিশব্দ বিবেচনা করিতেছি। "কর্পোরেশুন" রোমাণ আমলের প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন গ্রীসের এইরূপ দলবদ্ধ কেন্দ্রীকৃত সামাজিক জীবন "পোলিস" নামে পরিচিত হইত। "পোলিস" শব্দে প্রধানতঃ জনপদ-গত কেন্দ্র—যথা নগর বা পল্লী বুঝিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ হিসাবে পোলিসকে জনসমষ্টি বা দলবদ্ধ নরনারী বিবেচনা করা চলিতে পারে।

(২)

পাণিনির আলোচনায় হিন্দু নরনারীর যে সমাজ দেখিতে পাই তাহাতে সঙ্ঘ নামওয়ালা কমসে কম তিন প্রকার দল প্রসিদ্ধ। "পূগ" নামক প্রতিষ্ঠান ছিল এক প্রকার সঙ্ঘ। "নানা জাতির" লোক এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। এই সকল নরনারীর "বৃত্তি" কাজকর্ম্ম বা ব্যবসা নানাবিধ এবং বিচিত্র। ইহারা দলবদ্ধ হইত কিসের জন্য? "আর্থিক" এবং "কাম" সম্পার্কিত অর্থাৎ নানা প্রকার সামাজিক লেনদেন ও খাওয়াপরার মতলব সহজে হাঁসিল করা ছিল "পূগ" নামক দল গঠনের উদ্দেশ্য।

এই "পূগ" তাহা হইলে কি চিজ? পাণিনির ব্যাখ্যায় যদি কোনো জনপদ পূগ-গঠনের কেন্দ্র বলিয়া প্রচারিত থাকিত তাহা হইলে সটান বলিতে পারা যাইত যে পূগ পল্লী বা নগর ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। অর্থাৎ গ্রীক ইয়োরোপের "পোলিস" আর রোমাণ ইয়োরোপের

"মুনিসিপিয়ুম" যা, পাণিনি ভারতের পূগ কেন্দ্র তা। কিন্তু পাণিনির ব্যাখ্যা এই হিসাবে অস্পষ্ট, কাজেই নরনারীর ঠিক কোন্ ধরণের মেলামেশার কেন্দ্রকে পূগ ধরিয়া লইতে হইবে অনুমান করা সহজ নয়। তৎপরবর্ত্তী কালে মিত্র মিশ্রের "পূগ" নগরই বটে।

পাণিনির ভারতে "ব্রাত''দের সঙ্ঘ ছিল। এই সঙ্ঘে ও নানা "জাতীয়" লোকের কর্ম্ম কেন্দ্রীকৃত হইত। ইহাদের ব্যবসা ছিল "উৎসেধ" করা। অর্থাৎ গুণ্ডামি করিয়া খাওয়া, লুটপাটের উপর জীবন ধারণ করা, এবং দরকার হইলে কোনো মাতব্বর লোকের পেটোআ হইয়া এপক্ষে ওপক্ষে লড়াইয়ে যোগ দেওয়া ছিল ব্রাতদের কাজ।

ব্রাত জাতীয় জীব ভারতেরই একচেটিয়া নয়। মধ্য যুগের জার্ম্মাণিতে "রিট্টার" এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে 'নাইট' যোদ্ধা, বীর ইত্যাদি নামে ডাকাইতেরা প্রসিদ্ধ ছিল। গুণ্ডামি আর লুটপাট ছিল তাহাদের ব্যবসা। সমাজে তাহাদের ইজ্জতও কম ছিল না।

জার্ম্মাণ সাহিত্যবীর গ্যেটে "গ্যেট্‌স্" নামক গ্রন্থে এইরূপ দস্যুবীরের রোমান্টিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। শিলারের "রয়বার" নাটক ব্রাত-জীবনেরই চিত্র। বর্ত্তমান ভারতে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" পাণিনি ভারতের ব্রাতসঙ্ঘকে নবজীবন দান কারয়াছে।

তৃতীয় এক সঙ্ঘ পাণিনি সাহিত্যে দেখিতে পাই। "আয়ুধজীবী" অর্থাৎ লড়াই ব্যবসায়ী লোকেরা দল বাঁধিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহা-দিগকে ব্রাত নামক গুণ্ডাদের সামিল বিবেচনা করা হয় নাই। সাধারণ হিসাবে ইহাদিগকে ক্ষত্রিয়ের দল বা সঙ্ঘ ধরিয়া লইতেছি। অথচ জাতি বা বর্ণাশ্রমের তরফ হইতে যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে, পাণিনির "আয়ুধজীবী" দল সে চিজ নয়। তাসিতুস বিবৃত জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের লোক দেখা যায়।

(৩)

শাক্য-গৌতম যে "সঙ্ঘ" কায়েম করিয়া যান, তাহার রূপ বা গড়ন বুঝিতে কোনো বেগ পাইতে হয় না। পালি ভাষায় রচিত "বিনয়" সাহিত্যে তাহার পুরাপুরি বিবরণ আছে।

"বিনয়" শব্দের অর্থ শিক্ষা, শাসন বা শৃঙ্খলা। শাক্য-গৌতমের মত অনুসারে যে সকল লোক জীবন ধারণ করিত তাহাদের নিয়ম কানুন যে সকল গ্রন্থে বিবৃত সেই সব বিনয় সাহিত্যের সামিল। তথাকথিত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গনরক, দেবদেবী ইত্যাদির কথা বিনয়-সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় নয়। সামাজিক কর্ম্মকেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান কোন প্রণালীতে চালাইতে হইবে সেই সকল কথাই বিনয়-সাহিত্যের প্রাণ। শাসনপ্রণালী বিষয়ক সাহিত্য হিসাবে পালি "বিনয়" হিন্দু নরনারীর অন্যতম উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

বিনয়-সাহিত্য সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। শাক্য-গৌতমের চেলারা কোন্ নিয়মে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনযাপন করিত, তাহার বিশদ আলোচনা এক পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"অর্থ শাস্ত্রে"র "সঙ্ঘ"

(১)

সঙ্ঘ-নামওয়ালা নরনারীর কেন্দ্র সেকালে আরও অনেক ছিল। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" যে সমাজের পরিচয় দেয় সেই সমাজে একাধিক দলবদ্ধ জীবনের সাড়া পাই।

এক দল "বার্ত্তা-শাস্ত্রে"র চর্চ্চা করিয়া জীবন ধারণ করিত। এই সঙ্ঘকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র

বিবেচনা করা যাইতে পারে। "শাস্ত্র" চর্চ্চা করা পণ্ডিতের কাজ। কিন্তু কৌটিল্যের এই সঙ্ঘ বোধ হয় পণ্ডিতের দল নয়। কৃষক শিল্পী ও বণিকের সঙ্ঘই বুঝিতে হইবে।

কৌটিল্য-সাহিত্যে আর এক দল "ক্ষত্রিয়-শ্রেণী" নামে পরিচিত। কাম্বোজ, সুরাষ্ট্র ইত্যাদি প্রদেশে এই সকল সঙ্ঘের ঘাঁটি। ইহাদিগকে পাণিনির "আয়ুধজীবী" বিবেচন. করিলে দোষ হইবে না।

অন্য এক দলের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে "অর্থশাস্ত্রে" উল্লেখ আছে। এই সঙ্ঘের লোকেরা "রাজশব্দে"র জোরে জীবন ধারণ করিত। "রাজা" এই উপাধিটা জীবিকার উপায় কিরূপে হইতে পারে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে লিচ্ছবিক, বৃজ্জিক ইত্যাদি জাতীয় লোক এইরূপ সঙ্ঘের অন্তর্গত নরনারী।

তাহা হইলে এই সঙ্ঘকে "গণতন্ত্রী" সমাজের জীবন-কেন্দ্র ধরিয়া লওয়া সম্ভব। কেননা গণ-তন্ত্রের শাসনে এক হিসাবে রাজা কেহই নয়, আবার আর এক হিসাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঘটনাচক্রে দলের মোড়ল বা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়া রাজা উপাধি পাইতে অধিকারী।

বস্তুতঃ এই ধরণের গণতন্ত্রশীল রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা হিন্দু নরনারীর শাসন-দক্ষতার অন্যতম পরিচয়। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাইবে এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" কোন্ যুগের রচনা বা সঙ্কলন? অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের মতন এই গ্রন্থের জন্মকথাও অনিশ্চিত।

এই বিষয়ে দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণিতে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। "অর্থশাস্ত্রে"র প্রণেতা বা সঙ্কলন কর্ত্তাকে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য বিবেচনা করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে একাধিক। জার্ম্মাণ পণ্ডিত য়াকোবির মতে সেই যুক্তি গুলার কোনো

দাম নাই। অর্থাৎ ইনি "অর্থশাস্ত্র"কে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা বা সঙ্কলন বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি।

য়াকোবির প্রধান বিরোধী এতদিন ছিলেন য়োলি। ভারতীয় চিকিৎসা এবং আইন গ্রন্থের সঙ্গে "অর্থশাস্ত্রে"র তুলনা চালাইয়া য়োলি বলেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমাজ কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া যায় না।*

য়োলি যে সকল সন্দেহ তুলিয়াছেন, তাহার উপর আর এক তরফ হইতে অন্য কতকগুলা সন্দেহ আসিয়া জুটিয়াছে। চেকো স্লোহ্বাকিয়ার জার্ম্মাণ পণ্ডিত ষ্টাইন "মেগাস্থেনিস এবং কৌটিল্য" নামে একগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (হ্বিয়েনা, ১৯২২)। মেগাস্থেনিস ছিলেন মৌর্য্য দরবারে এসিয়া মাইনরের গ্রীক ("হেলেনিষ্টিক") রাজার দূত বা প্রতিনিধি (খ্রীঃ পূঃ ৩০২)। প্রশ্ন এই, মেগাস্থেনিসের ভারতবিষয়ক গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ সমূহ আর "অর্থশাস্ত্র" সমসাময়িক কি না।

ষ্টাইন এই দুই রচনার খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মোটা সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ। মেগাস্থেনিসের প্রত্যেক কথাকে ভারত সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ বা সাক্ষ্য বিবেচনা করা চলে না। অধিকন্তু কৌটিল্যের অথবা "অর্থশাস্ত্রে"র ভারতবিবরণের সঙ্গে "ইন্দিকা" নামক মেগাস্থেনিসেব রচনার মিল নাই বহুক্ষেত্রে।

---

* ১৮৯৬ সালে ষ্ট্রাসবুর্গ হইতে প্রকাশিত "রেখ্‌ট্‌ উণ্ড সিট্টে" (অর্থাৎ "আইন ও লোকাচার" বা "ধর্ম্ম ও নীতি") নামক গ্রন্থে য়োলি হিন্দুর শাসন-সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। পরে ১৯০৫ সালে "অর্থশাস্ত্রের" আবিষ্কার অবধি য়োলি এই গ্রন্থের সমালোচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মতামত জার্ম্মানির "মর্গেনল্যেণ্ডিশে গেজেল-শাফ্‌ট" বা প্রাচ্যতত্ত্ব পরিষদের পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। অধিকন্তু "আন্তর্জাতিক তুলনা-মূলক আইন-বিজ্ঞান সম্মেলনে"র বার্লিন অধিবেশনেও (১৯১১) এই বিষয়ে য়োলির গবেষণা প্রচারিত হইয়াছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ট প্রণীত "আল্ট-ইণ্ডিশে পোলিটিক" অর্থাৎ "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি" নামক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। (য়েনা, ১৯২৩) য়োলি এবং ষ্টাইনের আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিতে চেষ্টা না করিয়াও হিলেব্রাণ্ট বলিতেছেন:—"অর্থশাস্ত্র" অতি প্রাচীন সমাজেরই আইন কানুন চিত্রিত করিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা ইহার ভিতর পাওয়া যায় এইরূপ বিশ্বাস করিতেই হইবে।" কৌটিল্য * সম্বন্ধে ইয়োরোপে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন হিলেব্রাণ্ট (১৯০৮, ব্রেসলাও)।

"সমূহ"-প্রতিষ্ঠান

যাহা হউক সঙ্ঘ শব্দ এবং এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে আলোচনা আছে। এই পর্য্যন্ত পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এই গুলার দেশ ও কাল সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ প্রচার করা এখনো সম্ভব নয়। পরিবার বা যৌন সম্বন্ধের কথা লইয়া যে সকল সন্দেহ উল্লেখ করা গিয়াছে, সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই সব উঠিবে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেনদেনের সম্বন্ধ "সঙ্ঘ" ছাড়া আরও অনেক নামের জনকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিল। "সমূহ" শব্দের দ্বারা হিন্দুনরনারী কোনো কোনো দলবদ্ধ জীবনের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত ছিল। অনেক সময় "সমূহ" "সঙ্ঘ" শব্দেরই প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইত।

যাজ্ঞবল্ক্যের "স্মৃতি" গ্রন্থে (খৃঃ অঃ ৩৫০) কয়েক প্রকার "সমূহ" দেখিতে পাই। আর্থিক লেনদেনের জন্য লোকেরা "শ্রেণী" গড়িয়া তুলিত।

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থের স্থানে স্থানে কৌটিল্য-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। কোনো নির্দিষ্ট সনতারিখের স্বপক্ষে বিপক্ষে মতামত না দিয়া এক কথায় বলিব যে জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের আলোচনা প্রণালী সর্ব্বথা গ্রহণীয় নয়। বিশেষতঃ ষ্টাইনের প্রত্যেক যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো সম্ভব। তিনি যে সব অমিলের ফর্দ্দ দিয়াছেন সেগুলা মারাত্মক নয়।

ব্যবসায়ীদের "সমূহ"কে "নিগম" বা "নৈগম"ও বলা হইত। বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি অ-সনাতন ধর্ম্মের লোকেরা "পাষণ্ড" নামে সমূহ বদ্ধ ছিল। "গণ" নামক জন-"সমূহে"র দ্বারা নগর বুঝানো হইত। এই সকল "সমূহে"র অস্তিত্ব হইতে প্রাচীন ইয়োরোপের "পোলিস" এবং "কর্পোরেশ্যন" জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়াই হিন্দু সমাজে স্পর্শ করা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যের এক ভাষ্যের নাম "বীরমিত্রোদয়"। ভাষ্যকার মিত্রমিশ্র। তাঁহার রচনায় "সমূহ" ব্যবহার করা হইয়াছে প্রতিষ্ঠানের "জাতি"-বাচক শব্দ হিসাবে,—অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে। সমূহ-জাতির অন্তর্গত এক দলবদ্ধ জীবন-কেন্দ্রের নাম "পূগ"।

মিত্রমিশ্রের ব্যাখ্যায় "পূগ" পাণিনির "পূগ" হইতে অভিন্ন। তবে জনপদের সঙ্গে সংশ্রব আছে। কাজেই এই "পূগ"কে নগর বা পল্লী-কেন্দ্রে দলবদ্ধ নরনারীর "সমূহ" বুঝিতে আর আপত্তি নাই।

একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানেশ্বর ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষ্যে ("মিতাক্ষরা"য়) "সমূহ" শব্দকে "জাতি"-বাচক রূপে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। "গণ" নামক প্রতিষ্ঠান তাঁহার মতে একটা "সমূহ।" গ্রাম ইত্যাদি জনপদ "গণ" নামে পরিচিত। অর্থাৎ মিত্রমিশ্র যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে "পূগ" বলিয়াছেন, সেই প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞানেশ্বরের পরিভাষায় "গণ"। দুই শব্দেই "মুনিসিপিয়ুম" জাতীয় কেন্দ্র বুঝিতে হইবে।

ভারতীয় সঙ্ঘের ধ্বংসাবশেষ

"সঙ্ঘ" বা "সমূহ" নামক প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-কেন্দ্র গুলা বর্ত্তমান ভারতের নরনারীর নিকট,—বিশেষতঃ "উচ্চশিক্ষিত" মহলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেননা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই সকল প্রতিষ্ঠান এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে বলা চলে।

বস্তুতঃ কিন্তু এই সমুদয় এখনো মরে নাই। সামাজিক লেনদেনে, আর্থিক জীবনের নানা স্তরে, উৎসব উপলক্ষ্যে, ধর্ম্মকর্ম্মের পালা পার্ব্বণে,—এক কথায় লোকাচারে এবং জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক আচার ব্যবহারে সঙ্ঘ সমূহ ইত্যাদি কর্ম্ম-কেন্দ্র আজও সজাগ রহিয়াছে। আইনতঃ এই গুলার কোনো কিম্মৎ এক প্রকার নাই,—রাষ্ট্রীয় জীবনেও এই সমুদয়ের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলাকে নির্জ্জীব ম্রিয়মাণ এবং অবজ্ঞেয় অবস্থায় দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান ভারতে ভারতীয় "সঙ্ঘ" বা "সমূহ" প্রতিষ্ঠানের ইজ্জৎ কতখানি বা কতটুকু? শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচ্যজগতের স্বরাজ", "তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞান" এবং "ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের ভিত্তি" নামক তিনখানা বিলাতে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থে (১৯১৫-১৯২৩) এই বিষয় বিশদরূপে বিবৃত আছে। গ্রন্থকারের প্রচারিত আদর্শ, ভাবুকতা এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যগুলা গ্রহণীয় কি না সে কথা স্বতন্ত্র। অধিকন্তু পাশ্চাত্য সমাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি প্রত্যেক গ্রন্থে যে সব মতামত ছড়াইয়াছেন, সে সব টেকঁ-সই কি না তাহাও আলোচনা করিতেছি না।

রাধাকমলের গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় "সঙ্ঘ" বা "সমূহ" প্রতিষ্ঠানের যে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিবরণ আছে, তাহা যারপরনাই মূল্যবান্। এই বিবরণের সাক্ষ্য সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিলে প্রাচীন ভারতের দলবদ্ধ জীবন কেন্দ্র সমূহের এবং হিন্দু নরনারীর সঙ্ঘশক্তির কিছু কিছু আন্দাজ করা সম্ভব। সেকেলে হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন ও শাসন এবং হিন্দু জাতির শাসন-দক্ষতা বুঝিবার জন্য প্রত্যেক গবেষককেই দুই একবার এই কেতাবগুলা ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে।

"গণ"-কেন্দ্র

(১)

প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রতি ধ্বংসাবশেষ বা "সারভাইভ্যাল" রূপে নামে মাত্র পরিচিত। ইহাদের দাম কষিয়া বাহির করা এখনো বহু গবেষণা-সাপেক্ষ।

নাম গুলায়ও গণ্ডগোল কম নাই। "গণ" শব্দটাই ধরা যাউক। মিত্রমিশ্র যে প্রতিষ্ঠানকে "পূগ" বলিতেছেন, বিজ্ঞানেশ্বর তাহাকে বলেন "গণ", উভয়েই কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষ্যকার মাত্র। যাজ্ঞবল্ক্য (২।৮, ১৮৭-১৯২, ৩৬৯) স্বয়ং "গণ" শব্দে নগর অর্থাৎ জনপদগত লোকসঙ্ঘ বুঝিতেন।

নারদের স্মৃতিতে (খৃঃ অঃ ৪৫০) "গণ" শব্দে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিষ্ঠানই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। নারদ আর মিত্রমিশ্রের মাঝামাঝি এক স্মৃতিকার কাত্যায়ন "গণ" কে কুল বা পরিবারের "সমূহ" বিবেচনা করিয়াছেন। পরিবারের "সমূহ" কে মিত্রমিশ্রের "পূগ" অথবা বিজ্ঞানেশ্বরের "গণ" অর্থাৎ নগর বিবেচনা করা সম্ভব।

দেখা যাইতেছে যে, একই নামে নানা প্রতিষ্ঠান পরিচিত হইত। আবার একই প্রতিষ্ঠান বহু নামে প্রচলিত ছিল। কাজেই স্মৃতি-বর্ণিত প্রতিষ্ঠান গুলা বর্ত্তমান যুগের পক্ষে ধাঁধাঁ স্বরূপ।

যাহা হউক,—মোটের উপর "গণ" শব্দে গ্রীক "পোলিস" বা রোমাণ "মুনিসিপিয়ুম" জাতীয় জীবন-কেন্দ্র বুঝা যাইতেছে। জাতি-বাচক অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে এই শব্দের প্রয়োগ হইত কিনা সন্দেহ। "সঙ্ঘ" বা "সমূহ" যেমন যে-কোনো "কর্পোরেশ্যন" বা দলবদ্ধ জনসমষ্টি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, "গণ" বোধ হয় সেইরূপ ব্যবহৃত হইত না।

(২)

আবার আর এক সমস্যা উপস্থিত। "পোলিস" বলিলে গ্রীকেরা নগর বা পল্লী বুঝিত। একটা গোটা দেশ কখনই বুঝা যাইত না। তবে নগর বা পল্লীই ছিল গোটা রাষ্ট্র, কাজেই "পোলিস" ছিল রাষ্ট্রেরও প্রতিশব্দ। জার্ম্মাণ পণ্ডিত শ্বেমান প্রণীত গ্রীক পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিপুল গ্রন্থে (ইংরেজি অনুবাদ, লণ্ডন, ১৮৮০) পোলিস প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অর্থও খানিকটা ধরিতে পারা যায়। অর্থাৎ "কর্পোরেশন" বলিলে মধ্য যুগে এবং বর্ত্তমান কালে যে ধরণের দলবদ্ধ জীবন বুঝায়, পোলিস বলিলেও অনেক সময়ে সেইরূপ বুঝা সম্ভবপর হইত। কিন্তু একটা গোটা দেশ অর্থাৎ একাধিক পল্লী বা নগর সমন্বিত ভূখণ্ড কোনো দিনই বুঝা যাইত না।

রোমাণ আমলের এবং মধ্য যুগের "মুনিসিপিয়ুম" ও নগর বা পল্লী মাত্র ইংরেজ রামজে প্রণীত "রোমের প্রত্নতত্ত্ব" গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮৯৮) অথবা ফরাসী ব্রিসো প্রণীত "ফরাসী শাসননীতির ইতিহাস" গ্রন্থে (মার্কিন অনুবাদ, বষ্টন, ১৯১৫) "মুনিসিপিয়ুম" অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। যে কোনো "কর্পোরেশন" মুনিসিপিয়ুম নয়। আবার বহু পল্লী বা নগর সমন্বিত জনপদ বুঝাইবার জন্যও মুনিসিপিয়ুমের নাম ডাকা হইত না।

(৩)

কিন্তু "গণ" শব্দে একটা গোটা দেশ,—অথবা একটা গোটা জাতি বা সমাজ বুঝানো হইত। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে (১০৭।৩১, ৩২) যে সকল "গণের" উল্লেখ আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে কোনো দেশের টুকরা-স্বরূপ কতকগুলা "পুর" বা "গ্রাম" বিবেচনা করা অসম্ভব। "গণ" শব্দের দ্বারা সমগ্র "দেশ" বুঝানো হইয়াছে। বস্তুতঃ, "দেশ" বা "জাতি" এই

দুইয়ের একটা বুঝিতে হইবে, কেননা দেশের সঙ্গে জনপদের যোগ অচ্ছেদ্য। কিন্তু শান্তি পর্ব্বের বর্ণনায় জনপদের উল্লেখ নাই।

মহাভারতের "গণ" গুলার প্রথম বিশেষত্ব এই যে এইসমুদয় গোটা সমাজ। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে ইহাদের নরনারীদের পরস্পর সাম্য। একের সঙ্গে অন্যের "সাদৃশ্য" সুস্পষ্ট। কাজেই "গণ" গুলাকে রাজহীন প্রজাতন্ত্রী সমাজ সমঝিয়া লইলে চলিতে পারে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক পরিভাষায় যাহাকে "পাব্লিক" বলে, "গণ" শব্দে সেই লোকসমষ্টি [illegible] বুঝা যাইতেছে।

"স্মৃতি"-গ্রন্থের এখানে ওখানে পুরাপুরি স্বাধীন—স্বরাজী গণতন্ত্রাধীন সমাজের পরিচয় স্বরূপ "গণে"র ব্যবহার আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর আন্ধ্র, কুষাণ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাব গায়ে "গণ"—প্রতিষ্ঠানের ছাপ আছে। সেই সময়কার তাম্রলিপিতেও "গণ" সমাজের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। যৌধেয়, মালব ইত্যাদি জাতীয় নরনারী "গণ"—রিপাব্লিকের লোক। এই হিসাবে "গণ" কৌটিল্যের "বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবী" "সঙ্ঘে"র প্রতিশব্দ মাত্র।

হিন্দু সঙ্ঘের সীমানা

(১)

হিন্দু নরনারীর সঙ্ঘজীবনে যে এতদূর জটিলতা ও বৈচিত্র্য প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে ধারণাই করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৮৮৩ সালে বাঙ্গালী পণ্ডিত [illegible]-প্রণীত "হিন্দুদের ব্যক্তিবিষয়ক আইন" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রথম খণ্ডে [illegible] অর্থাৎ দল

সমূহ বা সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নারদের "স্মৃতি" ছিল গ্রন্থকারের প্রধান সাক্ষী।

তাহার পর ১৮৯৭ সালে গ্যেটিঙ্গেনের জার্ম্মাণ অধ্যাপক ফিক্ শাক্য-গৌতমের সময়কার ভারতীয় "সোৎসিয়ালে গ্লিডারুং" অর্থাৎ সামাজিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহাতে শিল্পী ও বণিকদের "গিল্ড্" সঙ্ঘ, শ্রেণী বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ আছে। ফিকের বিবরণ দাঁড়াইয়া আছে, "জাতক" সাহিত্যের উপর।

ইয়াঙ্কি পণ্ডিত হপ্‌কিন্স তাঁহার "নবীন ও প্রাচীন ভারত" নামক গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক, ১৯০২) আর্থিক লেনদেনের সঙ্ঘ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজ রিস ডেহ্বিড্‌স্ প্রণীত "বৌদ্ধ ভারত" গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৯০৩) ও এই সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজহীন রিপাব্লিক পন্থী সঙ্ঘ সম্বন্ধে গবেষণা আছে।

এই সকল তথ্যের সঙ্গে "স্মৃতি শাস্ত্রের" এবং তাম্রশাসনের প্রমাণ গুলা জুড়িয়া দিয়া ভারতীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুনরনারীর সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে অনেকটা বিশদ চিত্র ফুটাইতে পারিয়াছেন। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের "প্রাচীন ভারতে লোকাল গবর্মেণ্ট" গ্রন্থ লণ্ডনে এবং শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদারের "প্রাচীন ভারতে সঙ্ঘজীবন" গ্রন্থ কলিকাতায় বাহির হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক, আর্থিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

(২)

গবেষণা গুলার ফলে যুবক ভারতে একটা "উল্টা উৎপত্তির" সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সঙ্ঘ গড়িয়া তোলাকে ভারতীয় "আত্মার" এক

অতি-বিশেষত্ব রূপে প্রচার করা যাইতেছে। কাজেই সাবধান হওয়া দরকার।

শ্লেমানের গ্রীক তথ্যগুলা, রামজের রোমাণ তথ্যগুলা, আর ব্রিসোর ফরাসী তথ্য গুলা ভারতীয় "সমূহ"-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে লাম্‌প্রেথ্‌ট্‌-প্রণীত "ডায়বেস হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌ লেবেন ইম মিট্‌টেলাল্টার" অর্থাৎ "মধ্যযুগের জার্ম্মাণ আর্থিক জীবন" নামক গ্রন্থও (লাইপৎসিগ, ১৮৮৬) ভারতীয় গবেষকদিগকে পাশ্চাত্য সঙ্ঘ, সমূহ, গণ, পূগ ইত্যাদি জীবন-কেন্দ্রের "সেকেলে" দৌড় বুঝাইয়া দিবে।

আর এক কথা। রাষ্ট্রীয় দৈব দুর্ব্বিপাকের প্রভাবে অথবা ভারতীয় নরনারীর জীবনবত্তার অভাবে পুরাণা "কর্পোরেশ্যন" বা সঙ্ঘ গুলা নব যুগে নবীন গড়ন দেখাইতে পারিতেছে না। কিন্তু পশ্চিমাদের "সঙ্ঘ"-সমূহ দিন দিন ফুলিয়া উঠিয়াছে। পুরাণা স্তর-বিন্যাস ভাঙিয়া গিয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইয়োরামেরিকায় সঙ্ঘশক্তির জোয়ার ছুটিতেছে বিলকুল এক নয়া ধাপের উপর।

নবযুগের সঙ্ঘ-জীবন

এইখানে মনে রাখা দরকার যে, আজ কালকার বিপুল লণ্ডন শহর একটা "পূগ" মাত্র। এই ধরণের আব একটা "পূগ" হইতেছে পঁচিশ মাইল লম্বা শিকাগো। বর্ত্তমান জগতের একটা "গণের" নাম "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র", একটা "সঙ্ঘের" নাম "প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়"! আজকালকার একটা "সঙ্ঘে" জার্ম্মাণির ৩০ লাখ পরিবার কেন্দ্রীকৃত। তাহার নাম "কোন্‌জুম ফারাইন" বা "খরিদদার-সঙ্ঘ"।

নিউ ইয়র্কের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী" নামক কেরোসিন তেলের ব্যাপারীদের একটা সঙ্ঘ আছে। আর একটা সঙ্ঘ বা সমূহের নাম

জার্ম্মাণির "হুগোষ্টিনেস গেজেল শাফ্ট"। ইহা কয়লা, লোহা আর জাহাজের শিল্প-পতি ও বণিকদের কর্ম্মকেন্দ্র। এই সব "সমূহ" কি চিজ ভারতবাসীর অজানা নয়।

মজুর মহলের সঙ্ঘশক্তিও জগতে সুবিদিত। "ট্রেড ইউনিয়ন", "লেবার পার্টি", "সোশ্যালিষ্ট" দল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলা বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকার অন্যতম "সমূহ" ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরণেরই এক "সমূহে"র ছাঁচে বোলশেভিক রুশিয়া ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করিতে শিখিয়াছে।

অথচ এই সকল বিপুল কর্ম্মকেন্দ্র নেহাৎ মামুলি "শ্রেণী", "পূগ" "গণ" ইত্যাদি হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। একশ' দেড়শ' দুশ' তিনশ' বৎসর পূর্ব্বেকার পশ্চিমা "সমূহ" হিন্দুনারনারীর "সমূহের"ই "মাসতুত ভাই" ছিল। কি জাতি হিসাবে কি গড়নের হিসাবে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রভেদ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইত না।

এই সকল তথ্য ঐতিহাসিক সন তারিখের সহিত হজম করিয়া লইলে ঠাণ্ডা মাথায় প্রাচীন ভারতের শাসনমহলে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে। হিন্দু সঙ্ঘ-শক্তির দৌড় ও সীমানা জরীপ করিতে যাইয়া গোলাক ধাঁধায় পড়িতে হইবে না।

পরিশিষ্ট অং ২

সন্দেহ-মূলক প্রশ্ন

হিন্দুসমাজের যৌন সংশ্রব এবং দলবদ্ধ কর্ম্মকেন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলা সন্দেহ মূলক প্রশ্ন তোলা হইল। কিন্তু সেগুলার জবাব দিবার চেষ্টা করা হইল না। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই এইরূপ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইবে।

সমস্যার মীমাংসা সম্ভব একমাত্র যুক্তিতর্ক এবং নথী পত্রের সাহায্যে। তাহার জন্য চাই অতি বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র। ভারতীয় প্রাচীন জীবনের প্রায় প্রত্যেক খুঁটিনাটিই এইরূপ সুবিস্তৃত তর্ক বিতর্কের মল্ল ভূমি। সেদিকে প্রলুব্ধ হওয়া এই কেতাবের উদ্দেশ্য নয়।

যে সকল তথ্য বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা, একমাত্র সেই সবই বর্ত্তমান প্রয়াসে স্থান পাইবে। স্থানাভাবে সেই সমুদয়েরও চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

ভারতীয় বিবাহপদ্ধতির ধারা বুঝিবার জন্য মার্কিণ নৃতত্ত্ববিৎ লোহ্বি প্রণীত "প্রাচীন (বা আদিম) সমাজ" (নিউ ইয়র্ক, ১৯২০) নামক গ্রন্থের আলোচনাপ্রণালী কার্য্যকরী হইবে। জার্ম্মাণ, ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্ প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" এই হিসাবে বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের "প্রাচীন ভারতে সঙ্ঘজীবন" নামক ইংরেজী গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯১৯) জাতিভেদ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। সেইটার সহিত প্রত্যেক গবেষকেরই পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ গ্রন্থকারদের মতামত এই গ্রন্থে আলোচিত

হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে বোধহয় কোনো ভারতীয় পণ্ডিত ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় নিবদ্ধ মতামতের স্পর্শে আসেন নাই। যাঁহারা ফ্রান্সে অথবা জার্ম্মাণিতে ছাত্রভাবে আসিয়া পরীক্ষার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধাবলীতে অবশ্য ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় আছে। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ে প্রচুর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা-জ্ঞান এবং সতর্ক যুক্তি-প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান।

হিন্দু নরনারী বহুবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছিল। সমাজ জীবনের কর্ম্মকেন্দ্র বলিয়া এই গুলায়ও সঙ্ঘ শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। শাসনদক্ষতার পরিচয় হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লেখ যোগ্য।

দানখৈরাতের শাসন।

মারাঠা পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রণীত "ডেকানের প্রাচীন ইতিহাস" নামক ইংরেজী গ্রন্থে (বোম্বাই, ১৮৮৪) গুজরাতী সেনাপতি উষভদাতের অসামান্য দাণ্ডকাণ্ড বিবৃত আছে। তিনি তিনলাখ গরু দান করিয়াছিলেন। ঘাটে ঘাটে সিঁড়ি তৈয়ারি করা, মফঃস্বলে শহরে শড়ক, পুকুর ও বাগ বাগিচা তৈয়ারি করা, নদীর উপর খেয়া পারের ব্যবস্থা করা উষভদাতের দানখৈরাতের অন্তর্গত। তিনি একলাখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ব্রহ্মচারী ছাত্রের খোরপোষও বহন করিতেন।

সেই দানাবলীর মহিমা বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কেবল এই কথাটা জানিয়া রাখা দরকার যে উষভদাতের নিজ দানকাণ্ডের জন্য সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই। গুজরাতের নাসিক জেলায় গোবর্দ্ধন নামক পল্লী বা সহর বোধ হয় সেকালে বড় গোছের একটা "পূগ" ছিল। সেই পূগের হাতে সমস্ত দান খৈরাত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কোনো ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালের অধীনে দানগুলা চাপা পড়ে নাই।

গোবর্দ্ধনের "নিগম-সভা" দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। "নিগম" শব্দে "বণিক" বুঝিলে অবশ্য গোটা শহর বা পল্লী দানগুলার শাসন করিত একথা বলা চলে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ বা "শ্রেণী" ছিল উষভদাতের "ট্রাষ্ট" বা ভারপ্রাপ্ত শাসক। দানের পরিমাণ এবং শর্ত্তগুলা সবই গোবর্দ্ধনের বিহারের দর্জ্জায় খোদা আছে। বর্ত্তমান জগতে যে সকল দলিলকে "ট্রাষ্ট-ডীড" বলে, সেই দলিলই উষভদাত মন্দিরের কপাটে খুদিয়া গিয়াছিলেন।

উষভদাত ছিলেন ক্ষত্রপ নহপানের সেনাপতি,—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

তামিল "সঙ্গম"।

সাহিত্য, দর্শন, সুকুমার শিল্প এবং বিজ্ঞানের রাজ্যে দলবদ্ধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা হিন্দু নরনারীর অভ্যাস। এই কারণে অনেক সময়ে গ্রন্থকারদের ব্যক্তিগত নাম পর্য্যন্ত জানা যায় না। অধিকন্তু প্রায় সকল গ্রন্থই "সংহিতা" বা সঙ্কলন মালা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সমবেত মস্তিষ্কের ফলস্বরূপ রচনাগুলাও সঙ্ঘশক্তিরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মোটের উপর বিদ্যা বিষয়ক সঙ্ঘ গুলাকে "পরিষৎ" নামে বিবৃত করা চলে।

এই ধরণের একটা পরিষদের সন তারিখ-সমন্বিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার তাঁহার "প্রাচীন ভারত" নামক ইংরেজি গ্রন্থে (মাদ্রাজ, ১৯১১) মাদুরা নগরে "তামিল সঙ্গম" বিবৃত করিয়াছেন। মাদুরা ছিল সেকালে পাণ্ড্য রাজাদের শাসন কেন্দ্র।

সঙ্গমে বসিয়া সভ্যেরা সাহিত্যের সু—কু চর্চ্চা করিতেন। উনপঞ্চাশ জন সাহিত্য-সেবী, সুধী ও সমালোচক এই পরিষদের মাতব্বর ছিলেন।

তাঁহাদের বিচারে পাশ হওয়া ছিল তামিল সাহিত্য-রথীদের জীবনের চরম সাধ।

তিরু বল্লুবর-প্রণীত জগৎ প্রসিদ্ধ "কুরাল" গ্রন্থ এই সঙ্গমের পরীক্ষাধীন হইয়াছিল। গ্রন্থকার স্বয়ং ঊনপঞ্চাশ পরীক্ষকের অন্যতম ছিলেন না। "মনিমেখলাই" ইত্যাদি তামিল সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও সঙ্গমের বিচারে আসিয়াছিল। সাহিত্যের আসর হইতে আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া ফেলা ছিল সঙ্গমের প্রধান কাজ।

বহুকাল ধরিয়া সঙ্গমের কাজকর্ম্ম চলিয়াছিল। খৃষ্টাব্দের প্রথম দুইতিন শতাব্দের কোনো সময়ে ইহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। তারিখ সম্বন্ধে এখনো গোলযোগ আছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী মন্ত্রী রিশলিয়্যো যে "আকাদেমি ফ্রঁাসেজ্" কায়েম করিয়া যান, তাহারই এক অগ্রজ হিসাবে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গমটা শাসনপ্রণালীর ইতিহাসে স্মরণীয়। আজকালকার দিনেও "ফরাসী-পরিষৎ" বাঁচিয়া আছে। এই পরিষদের চল্লিশ সভ্যকে বলে "চল্লিশ অমর"। সেই হিসাবে মাদুরার "ঊনপঞ্চাশ অমর"দের কাহিনী শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই।

আরোগ্যশালা

লোকহিতকর কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে আরোগ্যশালা "ভৈষজ্যগৃহ" বা হাসপাতাল হিন্দু নরনারীর অন্যতম প্রতিষ্ঠান। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই সব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা সাধু ফাহিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন বুদ্ধ-তীর্থে। তিনি পাটলিপুত্রের সার্ব্বজনিক হাসপাতাল সম্বন্ধে বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

আরোগ্যশালাগুলা চলিত "জনসাধারণে"র খরচে। দেশের পয়সা-ওয়ালা লোকেরা এই সব প্রতিষ্ঠান কায়েম করিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করিতে অভ্যস্ত ছিল। দেশবিদেশের রোগীরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং ওষুধপথ্য পাইত। ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং সমাজ-সেবার ইতিহাস বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। হাসপাতাল চালাইতে যে শাসন-দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সেইটুকু বুঝিতে পারাই সম্প্রতি একমাত্র উদ্দেশ্য।

খৃষ্টিয়ান মুল্লুকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান সুরু হইয়াছে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে,—বাদশা কনষ্টান্টিনের আমলে (৩০৬-৩৩৭)। অর্থাৎ কমসে কম ছয়শ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের লোকেরা আরোগ্যশালা কায়েম করিতে ঝুঁকিয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়

বড় গোছের শিক্ষা-কেন্দ্র চালাইতে শাসনদক্ষতার দরকার হয়। হিন্দু নরনারী এই লাইনেও সঙ্ঘশক্তির পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের এক পল্লী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূলি ও বালুকণা বহন করিতেছে। নালন্দার নাম ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র পরিচিত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যের আমলে নালান্দার কাজ-কর্ম্ম সুরু হইয়া থাকিবে। সাড়ে তিন, চার বা পাঁচহাজার ছাত্র ও অধ্যাপক এক সঙ্গে এই শিক্ষা সঙ্ঘে সেকেলে "বিশ্বকোষ" আলোচনা করিতেন। অন্ততঃপক্ষে সাত শ' বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলিত কোথা হইতে? "দেবোত্তর" সদৃশ "শিক্ষোত্তর" সম্পত্তি ছিল শিক্ষাকেন্দ্রের আর্থিক ভিত্তি। রাজরাজড়াদের দানের সঙ্গে সঙ্গে বণিক এবং অন্যান্য ধনী গৃহস্থদের দানও বিদ্যার সেবায়

আসিত। চীনা পণ্ডিত ই-চিঙ ৬৭৫ হইতে ৬৮৫ সাল পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘের চিকিৎসা ও তর্কশাস্ত্রের অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আটটা বিপুল সৌধ এবং তিন শ মামুলি ঘর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারতের সামিল ছিল। প্রায় দুই শত গ্রাম এই সকল ছাত্র অধ্যাপক ও ইমারতের ভরণ-পোষণের জন্য রসদ জোগাইত।

পরবর্ত্তী কালে চীনে এবং জাপানে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সমুদয়ের আদর্শ ই ছিল ভারতের নালন্দা। এই ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের অবসান কাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কোথাও ইহার সমান দরের প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমাণ সাম্রাজ্যের বিদ্যালয়-সমূহ কোনো দিন নালন্দার বিপুলতা লাভ করে নাই।

পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির বোলোঞায়, ফ্রান্সের প্যারিসে এবং বিলাতের অক্‌স্‌ফোর্ডে নালন্দার মতন মঠ-বিদ্যালয় কায়েম হয়। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সমুদয়ের ধন-গৌরব শাসন-গৌরব এবং বিদ্যা-গৌরব নালন্দাকে হঠাইতে পরিত না।

বিলাতী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের দলিল-পত্র ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করিলে নালন্দার তুলনায় এইগুলার ঠাঁই কবে কিরূপ ছিল বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজি পণ্ডিত লীচ প্রণীত "শিক্ষা-সনদ ও শিক্ষা-দলিল (৫৯৮-১৯০৯ খৃঃ অঃ)" নামক গ্রন্থে (কেম্ব্রিজ ১৯১১) শিক্ষা-শাসন বিষয়ক মূল্যবান্ তথ্য আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের শাসন প্রণালী।

ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলা সামাজিক জীবন-কেন্দ্রের অন্যতম। এই সমুদয়ের পরিচালনায় সঙ্ঘশক্তি এবং শাসনদক্ষতা কম লাগে না। কাজেই ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের কথা শাসন-প্রণালী বিষয়ক আলোচনায় কথঞ্চিৎ প্রণিধান যোগ্য।

ধর্ম্ম-কেন্দ্র ও রাষ্ট্র।

মধ্যযুগের ইয়োরোপে ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রভাবে চার্চ্চ, গির্জ্জা বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান অনেক সময়েই পাকাপাকি রাষ্ট্রের ঠাঁই অধিকার করিয়া বসিত। তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া দেশে ও বৌদ্ধ সঙ্ঘকে এই ধরণেরই রাষ্ট্র বিশেষ বিবেচনা করা চলে। অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলা এই সকল ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-জীবনের শাসন-কেন্দ্র মাত্র নয়। নরনারীর সমগ্র জীবনের সকল প্রকার আইন কানুনই চার্চ্চ বা বৌদ্ধ সঙ্ঘের তাঁবে পরিচালিত হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতে কোন দিন এইরূপ ঘটিয়াছিল কি? বোধ হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর শিখশাসনকে এক সঙ্গে ধর্ম্মের শাসন এবং রাষ্ট্রের শাসন বলা চলে সন্দেহ নাই। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় দেড় দুই হাজার বৎসরের ভিতর হিন্দু নরনারীর সমাজে কোন প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ধর্ম্ম-কেন্দ্র ও রাষ্ট্র-কেন্দ্র বিবেচিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রমাণের জোরে এই সময়কার কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের চার্চ্চ-কেন্দ্রের জুড়িদার বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

অথচ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানকে একটা খাটি রাষ্ট্রের মতনই চালানো হইতেছে, এরূপ দৃষ্ট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিরল নয়। ধর্ম্ম-কেন্দ্রের প্রত্যেক ওঠাবসায় ও চলাফেরায় যে সকল বিধি নিষেধ পালিত হইত, তাহার ভিতর "আইন"পদবাচ্য বস্তুই দেখিতে পাই। এই জন্যই পরিবার, দানখয়রাত, বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পর-সম্বন্ধের মিলন-কেন্দ্রের মতন ধর্ম্ম-কেন্দ্র ও ভারতীয় শাসন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ।

শাক্য গৌতমের চেলারা যে ধর্ম্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলেন তাহার নাম "সঙ্ঘ"। এই প্রতিষ্ঠানের শাসন-প্রণালীর দিকে বিহারী ব্যারিষ্টার-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশী-প্রসাদ জয়সওয়াল সর্ব্ব প্রথম গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলিকাতার ইংরেজি "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার ১৯১৩ সালের মে-জুলাই সংখ্যায় তথ্যগুলা প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম-কেন্দ্রের শাসনবিষয়ক সাহিত্যের নাম "বিনয়"। এই সাহিত্যের দুই গ্রন্থ "মহাবগ্‌গ" এবং "চুল্লবগ্‌গ" নামে পরিচিত। পালি ভাষায় সংস্কৃত "বর্গ" হইয়াছে "বগ্‌গ," আর "ক্ষুদ্র" দেখা দেয় "চুল্ল" রূপে। সহজে প্রথম গ্রন্থটাকে বলা চলে "বৃহৎসংহিতা" আর দ্বিতীয়টাকে "ক্ষুদ্রসংহিতা"।

সঙ্ঘের লোকেরা কোন্ নিয়মে জীবন ধারণ করিবে তাহার তালিকা এই দুই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। আইন কানুনের সঙ্কলন হিসাবে বই দুইটাকে "কন্‌ষ্টিটিউশ্যনে"র অর্থাৎ শাসন-প্রণালীর দলিল দস্তাবেজের "বড়" ও "ছোট" সংগ্রহ বলিতে পারি। যে সকল গবেষক ধর্ম্মকর্ম্ম পাপপুণ্য ইত্যাদির খোঁজে মোতায়েন নন, তাঁহারাও একমাত্র আইনসঙ্গত বিধি ব্যবস্থা এবং সমাজ-কেন্দ্রের গড়ন ও শাসনপ্রথা বুঝিবার জন্য এই দুই পালি "বগ্‌গ" ঘাঁটিয়া দেখিতে বাধ্য হইবেন।

"বিনয়"-সাহিত্যে শাক্য-গৌতমের (খৃঃ পূঃ ৬২৯-৫৪৩) "উপদেশামৃত" বা কথামৃত সঙ্কলিত হইয়াছে। কাজেই খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সমাজ-কথা এই সাহিত্যের আলোচ্য। কিন্তু সঙ্কলন কর্ত্তারা বোধ হয় খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর লোক। শাক্য-গৌতম তখন বুদ্ধ নামে দেবতা হইয়াছেন, অথবা হয় হয় হইতেছেন। তবে এই দেবত্ব আরও দুই তিনশ' বৎসর পরে যে কোঠায় উঠিয়াছিল, "বিনয়"-সাহিত্যে সেই মাত্রা দেখা যায় না। "মহাবগ্‌গ" এবং "চুল্লবগ্‌গ"কে মোটের উপর মৌর্য্য-ভারতের শাক্য-পন্থীদের আইন-সাহিত্য বিবেচনা করা চলিতে পারে।

সঙ্ঘের পরিচালনা।

(১)

শাসন-বিষয়ক মতামত বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। শাক্য-গৌতম সঙ্ঘের উন্নতি অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা "মহাপরিনিব্বাণ স্বত্তান্ত" গ্রন্থে জানিতে পারা যায়। সেই সকল উপদেশে সঙ্ঘজীবনের দার্শনিক ভিত্তি বা "পোলিটিক্যাল থিয়োরি"টা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই আলোচনায় সময় ক্ষেপ করা হইবে না। শাক্যপন্থীদের সঙ্ঘ-কেন্দ্রটা পরিচালিত হইত কোন্ নিয়মে একমাত্র সেই দিকেই নজর দেওয়া হইতেছে।

"চুল্লবগ্‌গ" (৯।১।৪) গ্রন্থে একটা সভার চিত্র প্রদত্ত আছে। মহা-কস্‌সপ সঙ্ঘের নিকট একটা প্রস্তাব পেশ করিবার সময় বলিতেছেন :— "সঙ্ঘের সভ্যগণ, আমার কথায় কান দিন। পাচ শ' ভিখ্‌খু বর্ষাকালে রাজগৃহে গিয়া বসবাস করিতে চাহিতেছেন। এই বিষয়ে আপনাদের প্রত্যেকের কি মত? যাঁহারা এই প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁহারা[illegible]

থাকুন। আর যাঁহারা বিপক্ষে তাঁহারা আপত্তিগুলা নির্দ্দেশ করুন। ইত্যাদি।” সঙ্ঘওয়ালাদের ব্যক্তিত্বজ্ঞান ছিল টনটনে।

“মৌনং” ছিল সঙ্ঘের নিয়মে “সম্মতিলক্ষণম”। আজকালকার ইয়োরোপে “হাঁ”, “না” বলা দস্তুর। প্রাচীন ইয়োরোপে লোকেরা হাত তুলিয়া অথবা জয় ধ্বনি করিয়া ভোট দিত। হোমারীয় সাহিত্যে এবং তোসিতুস-প্রণীত জার্ম্মাণ জাতির বিবরণে তাহার পরিচয় পাই।

(২)

রঙিন “শলাকা” বা কাঠি ব্যবহার করা হইত ভোট গুণিবার জন্য। “চুল্ল বগ্‌গে” তিন প্রকার ভোট বিবৃত আছে (৪।১৪।২৬)। এক প্রকারকে বলে “গুপ্ত” এবং আর এক প্রকারের নাম “খোলা”। কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিয়া ভোট দিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

এক এক রঙের কাঠিতে এক এক প্রকার মত বুঝা যাইত। কাঠিগুলা সভ্যদের ভিতর বিতরিত হইত। পরে গণনা করিয়া মতামতের দাম কষা হইত। এই সকল বিষয়ের কর্ত্তাকে বলে “সলাকা-গাহক”।

কাঠিগুলার ব্যবহার সম্বন্ধে কড়া নিয়ম প্রচলিত ছিল। “বে-আইনি” বাঁচাইয়া সকলকে ভোট দিতে হইত। “চুল্ল বগ্‌গ” (৪।১০) পাঠ করিলে দশ প্রকার বে-আইনির কথা জানিতে পারি। তাহার ফলে ভোট “পচিয়া” যাইত।

(৩)

সঙ্ঘের পরিচালনায় আইনসঙ্গত বিধানের ইজ্জৎ ছিল খুব বেশী। যা-খুসী তা করিবার জো ছিল না। প্রত্যেক সভ্যকে খুঁটি-নাটি মানিয়া চলিতে হইত। কোনো বিষয়ে ত্রুটি ঘটিলে “বে-আইনি” দোষে কাজকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যাইত।

আজকালকার দিনের সভ্যজীবনে দস্তুর এই যে, সভ্যদের এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলে সভার কাজ মঞ্জুর হইতে পারে না। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে "কোরুম" বলে। বিনা "কোরুমে" যে কাজ সম্পন্ন হয় সেই কাজ কাজের মধ্যে গণ্য নয়।

এই "কোরুম"-নীতি "মহা বগ্‌গে" (৯৩৷২) বিবৃত আছে। কোরুম-হীন সভাকে অসম্পূর্ণ সভা বলে। এইরূপ অসম্পূর্ণ সভায় যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইত, সবই "বে-আইনি,"—এই ছিল শাক্যপন্থীদের সঙ্ঘের গোড়ার কথা।

সভাস্থলে কতপ্রকার "বে-আইনি" ঘটনা ঘটিতে পারে তাহার বিশদ আলোচনা আছে "মহাবগ্‌গে" (৯৷২৷১,৭)। আইন মানিয়া সভার কাজ চালাইবার দিকে দৃষ্টি ছিল খুব বেশী।

(৪)

খৃঃ পূঃ ৪৪৩ সালে বেসালি নগরে ভিখ্‌খুদের এক সম্মেলন বসিয়া ছিল। সেই সম্মেলনে "কোরুম"-নীতির কড়াক্কড়িকে খানিকটা মোলায়েম করিবার চেষ্টা হয়।

সভায় যদি কোরুম-অনুযায়ী লোক সংখ্যা না থাকে তাহা হইলে সভার কাজ কি একদম পচিয়া যাইবে? বেসালিতে এই প্রশ্নের আলোচনায় ঠিক হয় যে,—"সভার কাজ আইন সঙ্গতই বিবেচিত হইবে। তবে অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন উপস্থিত হইবে তখন তাহাদের সম্মতি লইয়া লইলেই চলিবে।" বেসালির এই নিয়মকে "অনুমতি-কপ্প" বলা হইত।

কিন্তু অন্যান্য কেন্দ্রের ভিখ্‌খুরা আইনের বিধানকে নরম করিতে দিতে রাজি হয় নাই। তাহারা বেসালি-সম্মেলনের বিধানের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। বিচারে "অনুমতি-কপ্প" বে-আইনি বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

(৫)

এই ধরণের অসংখ্য কথা "বিনয়"-সাহিত্যে জানিতে পারি। আইনের ধারার চুল-চেরা বিশ্লেষণ "মহাবগ্‌গে" এবং "চুল্লবগ্‌গে" প্রচুর। লেখকেরা বা সঙ্কলন-কর্ত্তারা পুরাদস্তুর তর্ক-বাগীশ পণ্ডিত এবং আইন-বিজ্ঞানের ওস্তাদ।

"বিনয়"-সাহিত্য শাক্য গৌতমের বাণীরূপে প্রচারিত হইয়াছে। আগা গোড়া সবই তাঁহার "কথামৃত" এরূপ বিশ্বাস করা হয়ত সহজ নয়। আইনগুলা হয়ত শাক্য গৌতমের জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নানাস্থানে কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। কিছু কিছু হয়ত তাঁহার নিজ মাথারই সৃষ্টি। আবার পরবর্ত্তী কালেও সঙ্ঘের কাজ চালাইতে চালাইতে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা মাফিক নূতন নূতন বিধি নিষেধও কায়েম হইয়া থাকিবে।

তবে শাক্য-গৌতমের কৃতিত্ব "বিনয়"-সাহিত্যে যথেষ্টই আছে। এই হিসাবে পরবর্ত্তী কালের রোমাণ সমাজের উকীল-পণ্ডিতেরা তাঁহার সঙ্গে আইনের আখ্‌ড়ায় পাঞ্জা কষিয়া আনন্দিত হইতেন সন্দেহ নাই। "সঙ্ঘ"-প্রতিষ্ঠাতার মাথা ছিল পরিষ্কার। রচনাকৌশলে কোনো গোঁজামিল নাই।

(৬)

এই সঙ্গে আর একটা বিধানের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। দুনিয়ার অতি প্রাচীন সমাজে মতামত সম্বন্ধে সহজ প্রথা প্রচলিত ছিল। লোকেরা হয় প্রস্তাবটা গ্রহণ করিয়া বলিত "হাঁ," না হয় সেটার বিরুদ্ধে সটান বলিত "না"। প্রস্তাব সম্বন্ধে একাধিক মত থাকা প্রাচীন সমাজে বড় একটা দেখা যায় না। এই বিষয়ে নৃতত্ত্ব-সেবীরা চিত্তাকর্ষক অনুসন্ধান চালাইতে পারেন। কিন্তু "বিনয়"-সাহিত্যে যে সমাজ চিত্রিত আছে সেই সমাজে

"আধুনিকতা"ই লক্ষ্য করিতে হইবে। "চুল্লবগ্‌গে"র বিধান (৪।১৪।২৪) নিম্নরূপ :—"সলাকাগাহক কাঠিগুলা সংগ্রহ করিয়া গুণিয়া দেখিবে। বেশী লোক যে রঙের কাঠি নিয়াছে সেই রঙেরই জয় বুঝিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পারিভাষিকে ইহাকে বলে "ল অব দি মেজরিটি" বা "বেশীর জয়।" এই বিধানকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানব সমাজের এক অতি উন্নত ব্যবস্থা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। মজার কথা এই যে, এই প্রথা ইয়োরোপীয়ানদেরই আবিষ্কার এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা গৌরবান্বিত বোধ করিয়াও থাকেন।

বিলাতের দার্শনিক বোসাঙ্কে তাঁহার "রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্ব" (লণ্ডন ১৮৯৯) গ্রন্থে বলিতেছেন :—"প্রাচীন গ্রীসের দৈনন্দিন জীবনে 'বেশীর জয়' নীতি সর্ব্বপ্রথম কায়েম হইয়াছিল।" এইরূপ তথ্যের উপর ভর করিয়াই দার্শনিক মহাশয় প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে বিপুল প্রভেদ আবিষ্কার করিয়াছেন!

সমাজ ও ধর্ম্মশাসন।

বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম্মে যে সকল নিয়ম পালন করা হইত সে সব কি এক মাত্র বৌদ্ধদের সমাজকেন্দ্রের একচেটিয়া? না জৈন, "সনাতন" এবং অন্যান্য ভারতীয় দলবদ্ধ জীবনেও এই ধরণের আইন চলিত? সকল প্রকার ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানেই এক প্রকার বিধিনিষেধের প্রভাব ছিল এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে খাঁটি ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব আছে।

আর এক কথা। এই আইনগুলা কি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানেরই বিশেষ বিধান? না সামাজিক জীবনের অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রেও এই ধরণের আইন মানিয়া কাজ চালানো হইত।

ফরাসী পণ্ডিত গীজো প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে দেখা যায় যে ইয়োরোপের চার্চ্চ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে; আবার রাষ্ট্রও চার্চ্চের পরিচালনা-প্রণালীর নিকট কোনো কোনো বিষয়ে ঋণী। জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোলারের "চার্চ্চের ইতিহাস" গ্রন্থে ও ধর্ম্ম-কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের এইরূপ আদান-প্রদান স্পষ্ট ধরিতে পারি।

ভারতীয় শাসন প্রণালীর ইতিহাসেও সমাজ-জীবনের সকল কেন্দ্রেই এক প্রকার আইন কানুন চলিত এইরূপ "স্বীকার" করিয়া লওয়া সম্ভব বটে। কিন্তু যেখানে যেখানে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সকল ক্ষেত্রেই জোরের সহিত মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আর্থিক জীবনের গড়ন ও শাসন

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজ-সম্বন্ধের ভিতর আর্থিক লেনদেনের ঠাঁই বিশেষ বিস্তৃত ও গভীর। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উপর মস্ত প্রভাব বিস্তার করে। আবার রাষ্ট্রের প্রত্যেক কাজেই কিছু না কিছু ধনদৌলতের অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়। হিন্দু নরনারীর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক কথা এই কারণে শাসন-দক্ষতার বৃত্তান্তে যারপরনাই আবশ্যক।

পাশ্চাত্য সমাজে আর্থিক দলিল

ইয়োরোপের মধ্যযুগে কিষাণ, মজুর, শিল্পী, বণিক, সুদখোর, মহাজন ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কিরূপ আর্থিক জীবনযাপন করিত, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত পাওয়া কঠিন নয়। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হেপ্‌কে-প্রণীত "হ্বিট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌-গেশিষ্টে" অর্থাৎ "আর্থিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থে (লাইপৎসিগ্‌ ১৯১২) এই বিষয়ে বহুসংখ্যক পুরাণা দলিল উল্লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চুক্তিপত্র, দোকানদারির হিসাব, পল্লীবাসী বা নাগরিকদের তালিকা, কোতায়ালের হুকুম-বহি, শাসনকর্ত্তাদের আদেশ বা আইন সবই পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধেও এই ধরণের তথ্য অনেক।

অষ্ট্রিয়ার ইন্‌স্‌ব্রুক নগরের "আর্থিভ" বা "পুথি-খানায়" হাজার হাজার লেখা কাগজ পত্র দেখিতে পাই। এইগুলা অতি প্রাচীন কালের সমসাময়িক সাক্ষী। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও পল্লীতে পল্লীতে এবং নগরে নগরে সেকালের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলাকে সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে পাকড়াও করিতে পারি। এই সকল প্রমাণের জোরেই লাম্পরেখ্‌ট্‌ লিখিয়া গিয়াছিলেন, "মধ্যযুগের জার্ম্মাণ আর্থিক

জীবন" (লাইপৎসিক ১৮৮৬)। আর কার্ল ব্যিশুর প্রণীত "ডি এন্ট্‌-ষ্টেয়ুঙ ড্যর ফোল্‌ক্‌স্‌ হ্বির্ট্‌ শাফ্‌ট" (লাইপৎসিগ ১৯২২) নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থেও এই ধরণের সাক্ষীই অতীত সম্বন্ধে কথা কহিতেছে।

"শ্রেণী" গৌরবে ইয়োরোপ ও ভারত

এই ধরণের সাক্ষ্য ভারতের অতীত সম্বন্ধে পাওয়া যায় কি? একদম যায় না বলিলেই ঠিক বলা হইত। তবে সাবেক কালের তাম্রলিপি এবং প্রস্তর-শাসন গুলার ভিতর প্রায় এই দরেরই আর্থিক জীবন-বিষয়ক প্রমাণ কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষীর জমানবন্দি এই গ্রন্থে লওয়া হইবে না। তাহার জোরেই হিন্দু জাতির আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক চিত্র-প্রদান-করা সম্ভব।

জার্ম্মাণ সমাজে যাহাকে "ইন্নুঙ" বা "ৎসুন্‌ফ্‌ট" বলে, ইতালিতে ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে যাহাকে "গিল্ড্‌" বলে, সেই ধরণের আর্থিক দল, সমিতি বা সঙ্ঘ হিন্দুজীবনে দেখা দিয়াছিল। সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান "শ্রেণী" নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য সমাজে "শ্রেণী"র উদ্ভব হয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় "শ্রেণী"র চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরের কথা আলোচিত হইতেছে না। তবে পরবর্ত্তী কালে ইয়োরোপের আর্থিক দলগুলা যে সকল কাজকর্ম্ম করিত, প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্ম্ম সেইরূপই ছিল বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গ্রীসে "গিল্ড্‌" প্রথা সবিশেষ পুষ্ট হয় নাই। কিন্তু রোমাণ সাম্রাজ্যের এখানে ওখানে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাল হিসাবে রোমাণ সাম্রাজ্যের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান গ্রন্থের সামিল। কিন্তু "শ্রেণী"-গৌরবে ইয়োরোপের মধ্যযুগ "রোমাণ কাল" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই হিন্দু জাতির আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলা বুঝিবার সময় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্ম্মাণির ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করাই সঙ্গত।

কিষাণ শ্রেণী

ইয়োরোপের কিষাণ সমাজে "গিল্ড" বা "ইনুঙ" গড়িয়া উঠে নাই। ভারতের কৃষকদেরও "শ্রেণী"র কথা শুনিতে পাই। কোনো তাম্রশাসন বা প্রস্তর লিপি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় না। কোনো সমসাময়িক স্বদেশী গ্রন্থকার বা বিদেশী পর্য্যটকের রচনায়ও তাহার প্রমাণ নাই।

কিন্তু গৌতম (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), মনু (খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শতাব্দী), এবং বৃহস্পতি (খৃঃ অঃ সপ্তম শতাব্দী) ইত্যাদির সঙ্কলিত "ধর্ম্ম" বা "স্মৃতি" শাস্ত্রে কৃষক "শ্রেণী"র উল্লেখ আছে। শুক্র-সঙ্কলিত অথবা শুক্রের নামে প্রচারিত "নীতি-শাস্ত্রে"ও কৃষকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ রূপে আন্দাজ করিতে পারি।

কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে "ধর্ম্ম" "স্মৃতি" ও "নীতি" বিষয়ক গ্রন্থ গুলাকে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় ইতিহাসের ইজ্জৎ দেওয়া হইতেছে না। প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠান বিষয়ক মতামত, তত্ত্ব বা "থিয়োরি" হিসাবে এই গুলার দাম নির্দ্ধারিত করা হইতেছে। কোনো প্রকার "থিয়োরি" এই কেতাবের আলোচ্য বিষয় নয়।

রাখাল-শ্রেণী

দল বাঁধিয়া জানোআর চরাণো সম্বন্ধে মান্দ্রাজ হইতে সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। বাদশা রাজেন্দ্র চোলের আমলে—একাদশ শতাব্দীতে—

দক্ষিণ ভারতের এক পল্লীতে মেষ-পালকেরা শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে ব্যবসায় চালাইত। এরাণ সওন নামক তাহাদের একজন এক পল্লী-মন্দিরের রাখাল নিযুক্ত হয়। চৌপর দিনরাত ঘিয়ে একটা বাতি জ্বালাইয়া রাখা ছিল তাহার মন্দির-সেবার প্রধান অঙ্গ। এই জন্য মন্দিরের সম্পত্তি হইতে তাহাকে দেওয়া হয় ৯০টা মেষ।

ভেঁড়ার পরিবর্ত্তে ঘি "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ",—এই গেল চুক্তির গোড়ার কথা। কিন্তু চুক্তিটা রক্ষা করার ভার পড়িয়াছিল গোটা রাখাল-দলের উপর। এরাণ সওন যদি পলাইয়া যায় অথবা জেলে যায় তাহা হইলে বাতিটা জ্বালাইবে কে? তাহার "শ্রেণী",—এইরূপই ছিল চুক্তিপত্রের মোসাবিদা। গোটা "শ্রেণী" দলবদ্ধ ভাবে এক জন সভ্যের দায়িত্ব লইল,—এইটুকু তথ্য ছাড়া তাম্রশাসনে আর কিছু বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপযোগী বস্তু নাই।

বণিক-শ্রেণী

ইংরেজ পণ্ডিত গ্রোস প্রণীত "গিল্ড মার্চ্যাণ্ট" বা "শ্রেণীবদ্ধ বণিক" নামক দুই খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থে (অক্স্ফোর্ড ১৮৯০) বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ের "সেকেলে" প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আছে। তাহার তুলনায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিযোগ বিষয়ে অতি সামান্ত ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে (খৃঃ অঃ ৩২০-৫৫০) পাটলিপুত্র ছিল ভারতের রোম বিশেষ। এই নগরে বণিকদিগের "সমূহ", "সঙ্ঘ" বা "শ্রেণী" ছিল একাধিক। সকলগুলা মিলিয়া একটা কেন্দ্র-"সমূহ" বা কেন্দ্র-"শ্রেণী" গড়িয়া তুলিয়াছিল। সাম্রাজ্যের মফঃস্বলেও—নানা

ছোটশহরে এবং পল্লীতে,—বোধ হয় এই কেন্দ্র-শ্রেণীর শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

"শ্রেষ্ঠী" নামে বোধ হয় সে যুগে টাকার তোড়াওয়ালা মহাজন বা ব্যাঙ্কারগণ পরিচিত ছিল। "সার্থবাহ" এবং "কুলিক" বলিলে হাটুয়া দোকানদার ব্যবসায়ী ইত্যাদি বণিক বুঝা যাইত। ১৯০৩-০৪ সালের "আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে"র বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাই যে গুপ্ত আমলের বণিকেরা মাটির মুদ্রা দিয়া চিঠি-পত্রের সীলমোহর লাগাইত।

এই গেল উত্তর ভারতের কথা। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে দ্বাদশ শতাব্দীর বিক্রম চোলের (১১১৮) যুগ একটা সাক্ষ্য দেয়। পাঁচশ' জন বণিক কোনো "শ্রেণী"র সভ্য ছিল। সমগ্র চোল সাম্রাজ্যে এই শ্রেণীর কারবার এবং লেনদেন চলিত।

কারিগর-শ্রেণী

(১)

শিল্পী বা কারিগরদের "শ্রেণী" সম্বন্ধে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর "দলিল" আছে। গুজরাত প্রদেশের তথ্যই বেশী পাওয়া যায়। নাসিক অঞ্চলে প্রাপ্ত তাম্রশাসন বা প্রস্তরলিপি এই যুগের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সাক্ষী।

তাঁতী, গান্ধিক এবং কলু ইত্যাদি শিল্পীদের "শ্রেণীর" কথা জানিতে পারি। "শ্রেণী"রা জনগণের টাকা কড়ি জমা রাখিত। অনেক সময়ে শতকরা নয় টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাইয়া গৃহস্থরা "শ্রেণীর" ব্যাঙ্কে টাকা মজুত রাখিত।

সেনাপতি উষভদাতের দানের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। গোবর্দ্ধন নগরের এক তাঁতী-"শ্রেণী" উষভদাতের

২০০ কার্ষাপণ জমা রাখিয়াছিল। আর এক তাঁতী-শ্রেণীর হাতে ১,৫০০ কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়া সেনাপতি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ১২০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

তৃতীয় শতাব্দীতে গোবর্দ্ধন নগরের কয়েকটা শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা গিয়াছে। কুমোর "ওদ-যান্ত্রিক" (জলের কলওয়ালা), এবং কলু এই তিন জাতীয় শিল্পীর "শ্রেণী"রা কতকগুলা দান পাইয়াছিল। এই সকল দানের সুদ হইতে তাহারা কোনো বৌদ্ধ সঙ্ঘের সাধু সন্তদিগকে ওষুধ পত্র জোগাইত।

(২)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শিল্পীরা শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে ব্যবসা চালাইত। কুমার গুপ্ত যে সময়ে সম্রাট (খৃঃ অঃ ৪১৩-৪৫৫) সেই সময়ে দশ-পুর নগরে রেশম-তাঁতীদের একটা "শ্রেণী" গড়িয়া উঠে। তাঁতীরা গুজরাত হইতে আসিয়া এই খানে বাস্তভিটা গড়িয়া ছিল।

দশপুরে যে সকল গুজরাতী তাঁতী উঠিয়া আসে তাহাদের সকলেই তাঁতের শিল্পে লাগে নাই। পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ লড়াইয়ের ব্যবসায় মন দিয়াছিল। কেহ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চায় লাগিয়া যায়। আবার সন্ন্যাস ধর্ম্মেও কাহারও কাহারও মতি ঝুঁকিয়াছিল। বাপ দাদাদের "জাতি"গত ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়া সেকালে অসম্ভব ছিল না।

৪৬৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে ইন্দ্রপুর নগরে কলুদের এক "শ্রেণী" একটা এককালীন দান পাইয়াছিল। দানের সুদ হইতে কোনো মন্দিরের বাতি জ্বালানো ছিল শ্রেণীর দায়িত্ব। ইন্দ্রপুর নগর ত্যাগ করিয়া গেলেও "শ্রেণীর" এক্তিয়ার ও জিম্মা পচিয়া যাইবে না; তবে "শ্রেণী"টা যদি উঠিয়া যায়, একমাত্র তাহা হইলেই সম্পত্তির উপর অধিকার এবং

খাতি দেওয়ার দায়িত্ব লুপ্ত হইবে। এইরূপ ছিল দানপত্রের চুক্তি কথা।

ভারতের "শ্রেণী" সাহিত্য

কি বণিক-"শ্রেণী", কি কারিগর-"শ্রেণী" উভয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অল্পবিস্তর খবর পাওয়া যায়। পালি "জাতকে"র কাহিনীতে পাঁচশ', সাতশ' সওদাগরের দল উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া স্বর্ণকার, চর্ম্মকার ইত্যাদি "আঠারো" শিল্পের "শ্রেণী"র কথাও শুনিতে পাই। সে খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সমাজ।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" যে সমাজ চিত্রিত আছে তাহাতেও কারিগর এবং বণিক উভয় সম্প্রদায়েরই "শ্রেণী" দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম, স্মৃতি এবং নীতি বিষয়ক আইন-গ্রন্থেও শ্রেণী বিষয়ক বিধিনিষেধ আলোচিত আছে।

কিন্তু "জাতকে"র গল্প অথবা "শাস্ত্রে"র বিধানগুলার সাহায্যে সন-তারিখ সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বড় জোর এইগুলা ব্যবহার করিয়া ঠারে ঠোরে হিন্দু নরনারীর সমাজ ব্যবস্থার চিত্র প্রদান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এইরূপ চিত্রেরও মূল্য আছে। কিন্তু তাহার জন্য এই কেতাব প্রণীত হইতেছে না।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা নিজ নিজ দেশ সম্বন্ধে আর্থিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনাপ্রণালী ভারত সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে আমাদের দেশের মূর্ত্তি কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "লোকাল গবমেণ্ট" বিষয়ক গ্রন্থে "লিপি" এবং "সাহিত্য" উভয় তরফ হইতেই "শ্রেণী"-বিষয়ক তথ্য

একত্র করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের [illegible] গ্রন্থেও এই দুই তরফের উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] লেখকগণকে এই সব উপকরণ অনেক বাছিয়া বাছিয়া [illegible] অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মগণ্ডী

"শ্রেণী" সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল, তাহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, পল্লী বা নগরে লোকেরা এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক স্বরূপ ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া, দাতারা "শ্রেণী"কে ট্রাষ্টী করিয়া দেবোত্তর ইত্যাদি সম্পত্তি দান করিতে অভ্যস্ত ছিল। এই দুই তথ্যে সমাজে শ্রেণীর প্রভাব বুঝিতে পারি। শ্রেণীগুলা যে নরনারীর বিশ্বাসভাজন ছিল, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

জাতকের কথা, মহাভারতের কথা, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রের কথা এই সঙ্গে জুড়িয়া দিলে শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের "আর্থিক" এবং "রাষ্ট্রীয়" কর্ম্ম-গণ্ডী ও ধরিতে অন্ততঃ পক্ষে আন্দাজ করিতে পারা যাইত। প্রত্যেক "শ্রেণী" নিজ নিজ আইন সৃষ্টি করিতে অধিকারী ছিল। আবার বিচারের কাজেও প্রত্যেক "শ্রেণী"র স্বারাজ্য এই সকল সাহিত্যে বিবৃত আছে। কিন্তু কোন্ রাজরাজড়ার আমলে এবং কোন্ মুল্লুকে শ্রেণীগুলা বাস্তবিক পক্ষে আইন-স্রষ্টা এবং বিচারক রূপে কার্য্য করিয়াছে তাহা এখনো প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। কাজেই সম্প্রতি সেই সকল কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইয়াঙ্কি পণ্ডিত হপ্‌কিন্‌স্ এবং জার্ম্মাণ হিলেব্রাণ্ট্ ইত্যাদির রচনায় এই বিষয়ে "শাস্ত্রের" নজির উদ্ধৃত হইয়াছে।

বৃহস্পতির "শ্রেণী"-বিধান

তবে "থিয়োরি" বা দার্শনিক মতবাদের তরফ হইতে এই সঙ্গে একটা আলোচনার ইসারা করিতেছি। জার্ম্মাণ পণ্ডিত গিয়ের্কে প্রণীত "মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় মতবাদ" নামক গ্রন্থে "দল" "সমূহ", "সঙ্ঘ" "শ্রেণী" ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের "কর্পোরেশ্যন" লইয়া দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক আছে। মেইটল্যাণ্ডের ইংরেজি তর্জ্জমায় সেই গ্রন্থ (কেম্বিজ ১৯০০) সকলের বোধগম্য।

প্রশ্নটা এই :"—সঙ্ঘ" কাহাকে বলে? কতকগুলা লোক কোনো ঘরে বা মাঠে বসিয়া কেনো বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছে দেখিলেই কি বলিব যে উহারা দলবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ, শ্রেণী-বদ্ধ? বর্ত্তমান ভারতে যাঁহারা আইনের ব্যবসা করেন তাঁহারা বলিবেন, "না"। এক সঙ্গে "একাধিক" লোকের কাজ চলিতেছে অথচ কাজটাকে কোনো "এক ব্যক্তির"ই কাজ বলিয়া যখন ধরিয়া লওয়া হয়, তখনই বলাচলে যে, এ একটা "কর্পোরেশ্যন" বা "সঙ্ঘ" বটে।

সেকালের হিন্দুসমাজে মাথাওয়ালা লোকেরা "সঙ্ঘ", "শ্রেণী" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে এই রূপ "আধুনিক" চোখে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল। সেকালের পশ্চিমারা ও এইরূপ "আধুনিক"ই ছিল।

হিন্দু নরনারীর সাক্ষী বৃহস্পতির "ধর্ম্মশাস্ত্র"। গ্রন্থটা সপ্তম শতাব্দীর সঙ্কলন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে "সমূহ বিষয়ক যে সকল বিধান আছে সেই সব যে-কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খাটে এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। তবে সেই বিধান অনুসারে হর্ষবর্দ্ধন অথবা পুলকেশীর আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলিত সে কথা বলিতেছি না। সমূহ, সঙ্ঘ, শ্রেণী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কাহাকে বলে এই সম্বন্ধে সেকালের একটা মত বুঝিয়া দেখিবার জন্য বৃহস্পতির এই অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে।

"সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বা ঐক্যবিশিষ্ট লোক-সমষ্টি

(১)

এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রথম "লক্ষণ"ই এই যে, বিনা "সভায়" কোনো কাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সভায় দুইজন, তিনজন বা পাঁচজন লোক থাকা দরকার। এই কয়জন লোক লইয়া সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয় বুঝিতে হইবে।

একটা দল বা শ্রেণী অপরাপর দল বা শ্রেণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে অধিকারী। কোনো ব্যক্তি বিশেষ ও দলের বা শ্রেণীর সঙ্গে "সম্বিদ" বা চুক্তি কায়েম করিতে পারে। এই সকল "সম্বিদ" দেশের ভিতরকার অন্যান্য সম্বিদের মতনই আইনের চোখে স্বীকার্য্য। এই হইতেছে "সমূহ" সম্বন্ধে বৃহস্পতির দ্বিতীয় কথা।

"সমূহের" তৃতীয় লক্ষণ এই যে, যে-কোনো ব্যক্তি ইহার প্রতিনিধি-স্বরূপ সরকারী বা সার্ব্বজনিক কর্ম্মকেন্দ্রে হাজির হইতে পারে। এই প্রতিনিধির যে-কোনো কাজ "সমূহের"ই কাজ স্বরূপ গৃহীত হইবে। কাজেই প্রতিনিধির হাতে যে সকল টাকা কড়ি বা অন্য কোন দায়িত্ব আসিয়া জুটে সেই বিষয়ে "সমূহের" একতিয়ার সম্পূর্ণ। আবার প্রতিনিধি যে-সকল দেনা করিবে তাহার জন্য "সমূহ"ই ষোল আনা দায়ী।

এই গেল বৃহস্পতির বিধান। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতেও (খৃঃ অঃ ৩৫০) এই ধরণের "সমূহ"-নীতির কিছু কিছু পরিচয় আছে।

কিষাণ, শিল্পী বা বণিক যখন এইরূপ লক্ষণওয়ালা দলের সভ্য হয় তখন তাহাদিগকে "কতকগুলা লোকের ভিড়" মাত্র বলা চলে কি ? গোটা "সঙ্ঘ" বা "শ্রেণী" তখন "একটা ব্যক্তির" মতন কাজ করিতেছে। এই

ধরণের দলকে পাশ্চাত্য পারিভাষিকে "গ্রুপ্-পার্সন" বা "সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বলে। কিছু সহজে তাহাকে "ঐক্যবিশিষ্ট লোক-সমষ্টি" বলিতে পারি।

(২)

এই বিষয়টা আর ও স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারি কাত্যায়নের কথায়। কাত্যায়ন বৃহস্পতির পরবর্ত্তী স্মৃতিকার। মিত্রমিশ্রের "বীরমিত্রোদয়" এবং চণ্ডেশ্বরের "বিবাদ রত্নাকর" নামক যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির দুই ভাষ্যে কাত্যায়নের মতামত আলোচিত আছে।

কাত্যায়ন বলেন যে, "শ্রেণী" ইত্যাদি "সমূহ" গঠিত হইয়া যাইবার পরেও নতুন নতুন লোককে শ্রেণীর সভ্য করা সম্ভব। এই নতুন সভ্যেরা "শ্রেণী"র সকল সম্পত্তি এবং অধিকার ভোগের দাবী করিতে পারে। আবার "শ্রেণী"র পুরাণা দেনা শুধিবার দায়িত্বও ইহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তবে একমাত্র "সর্ব্বসম্মতি" ছাড়া নয়া মেম্বর "শ্রেণীতে" প্রবেশ করিতে অনধিকারী। অর্থাৎ "শ্রেণী"তে সভ্যসংখ্যা বাড়িলে কমিলে ইহার স্বরূপ বদলাইয়া যায় না। শ্রেণীর "ব্যক্তিত্ব" যে-কে-সেই থাকে। কাত্যায়ন "শ্রেণী"কে "সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বুঝিতেন বেশ পরিষ্কার রূপেই।

মিত্রমিশ্র "গ্রুপ্-পার্সন"-তত্ত্বের চরম মত দিয়াছেন। নতুন সভ্যেরা "শ্রেণীর" আর্থিক লাভালাভ ভোগ করিতে অধিকারী ত বটেই। তাহারা "শ্রেণী"র পুরাণা "আধ্যাত্মিক পুণ্য" ভোগেরও দাবী রাখে। অর্থাৎ দান খৈরাত, লোকসেবা ইত্যাদি সৎকর্ম্মের জন্য "শ্রেণী"র প্রতিষ্ঠাতারা "পরলোকে" যে পদ পাইবে সেই পদে ইহার ভবিষ্য সভ্যদেরও অধিকার। "শ্রেণী"র অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ একই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর বা বয়স মাত্র।

পাশ্চাত্য পারিভাষিকে এই অবস্থাকে বলে,-"কর্পোরেশন অমর।" কাত্যায়ন এবং মিত্রমিশ্র "শ্রেণীর বা সঙ্ঘের মরণ নাই" তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। যতই নতুন লোক ভর্ত্তি হউক না কেন,-"শ্রেণী" তাহার ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য রক্ষা করিয়া যুগে যুগে অগ্রসর হইতেছে।

"শ্রেণী" ও নগরশাসন

নগরশাসনের সঙ্গে শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের কিরূপ যোগাযোগ ছিল? ব্রিসো-প্রণীত "ফরাসী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান" বিষয়ক গ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে "শ্রেণী"গুলা নগরে খুব প্রতাপশালী ছিল বটে। কিন্তু "শ্রেণী"র "মুখ্যে"রাই একমাত্র নগরশাসক ছিল না। নগরের "স্বরাজ" হইতে শ্রেণীর "স্বরাজ" স্বতন্ত্র রূপে রক্ষিত হইত। শ্রেণীগুলা আর্থিক-কেন্দ্র,—কিন্তু নগর একমাত্র আর্থিক কেন্দ্র নয়।

এই ধরণের আলোচনায় যোগ দেওয়া ভারতীয় ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্প্রতি অসম্ভব। কেননা মালমসলার খাঁকৃতি যৎপরোনাস্তি।

আর এক প্রশ্ন। "শাস্ত্র"-গ্রন্থে "শ্রেণী"গুলাকে "স্বরাট্"—প্রায় ষোল কলায় পূর্ণ স্বরাট্-রূপে বিবৃত করা হইয়াছে। কিন্তু "সার্ব্বভৌম," "চক্রবর্ত্তী" ইত্যাদি স্থানীয় মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল, চোল, ইত্যাদি বাদশাদের আমলে রাজধানীর "বড় কর্ত্তারা" "মফঃস্বলের" স্বরাজ-কেন্দ্রগুলার কতখানি মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন? রাজধানীর "শ্রেণী"গুলাও সরকারী আদালতের ছায়ায় নিজ নিজ স্বারাজ্য কতখানি সামলাইয়া চলিতে পারিত?

এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার সময় গৌতম, কৌটিল্য, মনু বা শুক্রের "বিধিলিঙ্"ওয়ালা ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান আওড়াইলে চলিবে না। চাই খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য। যাহা ঘটিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত। এই ধরণের বৃত্তান্তই পাই ইংরেজ অধ্যাপক আনুইন-প্রণীত "লণ্ডনের গিল্ড" নামক গ্রন্থে (১৯০৮)

পরিশিষ্ট নং ৩

"বিনয়" সাহিত্য এবং "ধর্ম্ম", "স্মৃতি" ও "নীতি" শাস্ত্র

"বিনয়"-সাহিত্য ও শাসনসাহিত্য আবার "ধর্ম্ম"-"স্মৃতি"-এবং "নীতি"-শাস্ত্র ও শাসন-সাহিত্য। আর এই দুই প্রকার "আইন"-গ্রন্থেরই সন তারিখ জানা নাই। তথাপি বর্ত্তমান গ্রন্থে শাসন-প্রণালীর তরফ হইতে "বিনয়"কে যে পদ দেওয়া হইল "শাস্ত্র" গুলাকে সেই পদ দেওয়া হইল না। এই পক্ষপাতের কারণ কি?

গৃহত্যাগী সাধুসন্তদের জীবন শাসন করা "বিনয়ে"র উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের বাহিরের নরনারীর সঙ্গে সঙ্ঘওয়ালাদের লেনদেন "বিনয়ে"র "আইনে" শাসন করা সম্ভব নয়। কিন্তু "শাস্ত্র"গুলার ফকীর ভিখারী ভিখ্‌খু মোহন্ত-দের জন্য আইনই একমাত্র আইন নয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মজুর, ধনী, দরিদ্র, ছোঁড়া, বুড়া, সুদখোর, কেরাণী, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা, প্রজা, কিষাণ, কারিগর ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষের জন্য এবং মানুষের "দলের" জন্য যত রকমের আইন সম্ভব, প্রায় সবই "শাস্ত্র"-সাহিত্যের অন্তর্গত।

"বিনয়" মানিয়া চলিত দুশ, পাঁচশ, দু হাজার, পাঁচ হাজার ব্যক্তি। "শাস্ত্র" যাহাদের জন্য রচিত তাহাদের সংখ্যা লাখ লাখ, কোটি কোটি।

কাজেই "বিনয়ের" আইন গুলাকে রাষ্ট্র মানিয়া চলুক বা না চলুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্র চলিতে পারে আপন মনে, আর সঙ্ঘও চলিতে পারে আপন মনে। কিন্তু শাস্ত্রের আইন যদি রাষ্ট্র না মানিয়া চলে তাহা হইলে "শাস্ত্র" গুলা শাস্ত্রই নয়, অথচ তাহাতে রাষ্ট্রের "ইজ্জৎ কোনো মতেই খাটো হয় না। কেননা রাষ্ট্র নিজের মতলব মাফিক বয়সন্দ নিজ আইন কায়েম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

এই জন্যই প্রতিপদে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—শাস্ত্রগুলার কোন্ কোন্‌টা, আবার কোন্ কোন্‌টার কোন্ কোন্ ধারা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল? কোন্ যুগের কোন্ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক?

আর এক কথা। "বিনয়ে"র স্রষ্টা কে বা কাহারা জানা আছে। শাক্য গৌতম নামক ব্যক্তি বিশেষের উপদেশের উপর ভর করিয়া তাঁহার চেলারা নিজেদের আখ্‌ড়া সামলাইবার জন্য ওকালতী বুদ্ধি খাটাইয়া কতকগুলা বিধিনিষেধ কায়েম করিয়াছিল। "সঙ্ঘে"র ইতিহাসে জানা যায় যে এই সকল বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হইত ও। তবে "আদর্শ" হইতে চ্যুত হইয়াছিল কত জন ভিখ্‌খু কবে কবে তাহার "ষ্টাটিষ্টেক্‌স" হয়ত পুরা মাত্রায় পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু মৌর্য্য, পাল বা চোল রাজারা যে সকল আইন কায়েম করিয়াছিলেন সেগুলা ঢুঁড়িতে হইবে কোথায়? "শাস্ত্র"-সাহিত্যে, না আর-কোথাও? অথবা কিছুকিছু "শাস্ত্র"-সাহিত্যে এবং কিছু কিছু আর কোথাও?

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুরাষ্ট্রে স্বরাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র-শাসন

প্রথম অধ্যায়ে যে সকল কথা আলোচিত হইল সে সব পরিভাষিক হিসাবে "শাসন-নীতি" বা "রাষ্ট্র-শাসনে"র অন্তর্গত নয়। কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রের "গড়ন" এবং শাসন-প্রণালী বুঝিবার জন্য এই সকল তথ্য জানা দরকার।

ব্যক্তিবিষয়ক বা ব্যক্তি-গত আইন।

হিন্দু নরনারীর "শাসন-দক্ষতা" আলোচনা করিতে গিয়া হিন্দুজাতির সাংসারিক চরিত্রের বনিয়াদ বুঝিতে পারা গেল। সমাজ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসে তাহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। রাষ্ট্রের রং, রাষ্ট্রের রূপ, রাষ্ট্রের ভিত্তি,—রাষ্ট্রের অনেক জীবন-কথাই এই সকল প্রতিষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর ঢুঁঢ়িতে হইবে। অথচ "শাসন-নীতি" বা "রাষ্ট্র-শাসন" বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা এই সবের শাসনে এবং এই সব-ঘটিত আইনে পাইবার জো নাই।

ব্যক্তির সঙ্গে ধনদৌলতের কি সম্বন্ধ এই কথা আলোচনা করিবার জন্ত একবার পুরুষের আইন আর একবার নারীর আইন আলোচনা করা

হইয়াছে। তাহার পর যাহা কিছু আলোচনা করা হইয়াছে তাহার মোটা কথা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ-নির্ণয়। বিবাহ, যৌন সংস্রব, জাতিভেদ, পরিবার, পাঠশালা, আরোগ্য-শালা, ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, কিষাণ-শিল্পী-বণিকদের "শ্রেণী" প্রত্যেকেরই আবহাওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেনদেনের তথ্য বিরাজ করিতেছে।

ব্যক্তিগত বিধিনিষেধ, ব্যক্তিগত আইন, ব্যক্তিগত "ধর্ম্ম" একমাত্র এই সবই এই পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। সঙ্ঘ, শ্রেণী ইত্যাদি দলগুলাও "ব্যক্তিই"। ইহাদিগকে "সঙ্ঘ-ব্যক্তি" বা "ঐক্যবিশিষ্ট লোক সমষ্টি" বলা হইয়াছে।

ইংরেজিতে যাহাকে "প্রাইভেট্ ল," ফরাসীতে যাহাকে "দ্রোআ সিভিল" বলে, তাহাকেই বলিতেছি "ব্যক্তিবিষয়ক বা ব্যক্তিগত আইন।" যে-কোনো দেশের যে কোনো উকীলকে এই "দ্রোআ সিভিল" লইয়া ব্যবসা চালাইতে হয়।

"পাবলিক্ ল" বা শাসন-নীতি

"রাষ্ট্র-শাসন" বা "শাসন-নীতি" তাহা হইলে কি চিজ? ফরাসীতে তাহার নাম "দ্রোআ প্যিব্লিক"। ইংরেজি নাম "পাব্লিক ল"। পাশ্চাত্য "জুরিস্ প্রুডেন্স্" বা অনুশাসন-বিজ্ঞানে "আইন," "ল" বা "ধর্ম্ম" নানাপ্রকার। তাহার ভিতর কতকগুলা পড়ে "ব্যক্তি-গত বা ব্যক্তি-বিষয়ক" আইনের শ্রেণীর ভিতর। "পাব্লিক ল" বলিলে যে শ্রেণীর আইন বা "ধর্ম্ম" নজরে আসে সে গুলাকে সাধারণতঃ আইন বলিয়া বুঝা হয় না।

উকীলদের ব্যবসায় অন্ততঃ "পাব্লিক্ ল" কখনো কাজে লাগে না। ইংরেজি-ফরাসী ইতালিয়ানে তাহাকে সহজ কথায় "কন্‌ষ্টিটিউশ্যন" বলে।

এই শব্দের উচ্চারণ এক এক ভাষায় এক এক প্রকার। জার্ম্মাণে তাহার নাম "ফার্ফাস্সুঙ্"। তাহার বাংলা নাম দেওয়া গেল "শাসন-নীতি" বা "রাষ্ট্র-শাসন" বা "শাসন-বিষয়ক আইন।"

মণ্টেগু-চেল্‌ম্‌স্‌ফোর্ডের মোসাবিদা অনুসারে ১৯১৯ সালে যে "গবমে'ণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্" জারি হইয়াছে, সেই "অ্যাক্‌ট" টা "পাব্‌লিক্ ল" বা "কন্‌ষ্টিটিউশুন" অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসন। বর্ত্তমান ভারতে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিতেছে তাহা "পাব্‌লিক্ ল"-ঘটিত আন্দোলন। তাহার ভিতর "দ্রোআ সিহ্বিল" আত্ম প্রকাশ করে না।

"স্বরাজ" "শাসন-নীতির" কথা, "ব্যক্তিগত আইনের" কথা নয়। বিধবাদের বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য অথবা জমিদারি প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য যে সকল আন্দোলন ঘটে, তাহা "স্বরাজ" আন্দোলনের কথা নয়। সে সব "ব্যক্তি-গত" বা ব্যক্তিবিষয়ক আইনের অন্তর্গত।

হিন্দু কন্‌ষ্টিটিউশুন

এইবার হিন্দুরাষ্ট্রের "শাসন-নীতি" আলোচনা করা যাউক। ভারতে ইয়াঙ্কি পণ্ডিত উড্রো হ্বিলসন প্রণীত "ষ্টেট" বা "রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থ সুপরিচিত। সেই গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ সম্বন্ধে যে শ্রেণীর তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে, সেই শ্রেণীর তথ্যই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্বন্ধে সঙ্কলিত হইবে। ফরাসী পণ্ডিত য়োসেফ্-বার্থেলেমি-প্রণীত "লেজ অ্যাঁ-স্তিতিউসিয়োঁ পোলিটিক দ' লাল্‌মাঞ্‌ কোঁতেম্পোরেণ" (প্যারিস ১৯০৫) গ্রন্থে বর্ত্তমান জার্ম্মাণি সম্বন্ধে এবং "ল' গুবর্ণামাঁ দ'লা ফ্রাঁস্" (প্যারিস ১৯২০) গ্রন্থে ফ্রান্স সম্বন্ধে এই শ্রেণীর "দ্রোআ প্যিবলিক"-ঘটিত কথাই পাওয়া যায়। মার্কিন হ্বিলোবি-প্রণীত "বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রশাসন" (নিউইয়র্ক ১৯১৯) ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

হ্বিলসন এবং জোসেফ-বার্থেলেমি উভয়েই প্রতিষ্ঠানগুলা বিবৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয়ের সু-কু সমালোচনাও করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঐ ধরণের সমালোচনার সময় এক প্রকার দেওয়া হইবে না। কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠান গুলার দর বুঝিবার জন্য সমসাময়িক গ্রীস, রোম ও ইয়োরোপীয়ান মধ্যযুগের কথা মাঝে মাঝে ইসারায় ইঙ্গিতে তোলা হইবে।

রাষ্ট্র ও রাজ্য

একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার। আজকালকার বাংলায় "রাষ্ট্র" শব্দ যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে সেই অর্থই বর্ত্তমান গ্রন্থে ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে "রাষ্ট্র"-শব্দের অর্থ ছিল অন্যরূপ। "রাষ্ট্র" বলিলে সেকালের হিন্দু নর নারী বুঝিত "জন" বা "জনপদ"। দেশের "লোক" অথবা "দেশ" এই অর্থে "রাষ্ট্রে"র ব্যবহার দেখা যায় কৌটিল্যে, মনুসংহিতায়, যাজ্ঞবল্ক্যে, শুক্রনীতিতে, মহাভারতে এবং অন্যান্য সাহিত্যে। এই অর্থেই আজকাল হিন্দী ভাষায়ও "রাষ্ট্র" শব্দের কায়েম হইয়া থাকে। বাঙালীরা যে সব বস্তুকে "জাতীয় আন্দোলন" "জাতীয় শিক্ষা," "জাতীয় ভাষা" বলে, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের লোকেরা সেই সবকে "রাষ্ট্রীয়" উপাধি দিতে অভ্যস্ত।

বাঙালীরা আজকাল যাহাকে "রাষ্ট্র" বলিতেছে, তাহা বিদেশী "ষ্টেট" "ষ্টাট" অথবা "এতা"র প্রতিশব্দ। প্রাচীন হিন্দু নরনারী যাহাকে "ষ্টেট" বলিত, তাহার নাম ছিল "রাজ্য"। "সপ্তাঙ্গং রাজ্যম্",-এই বুখ্‌নি "শাস্ত্র"-সাহিত্যের মার্কামারা, পেটেণ্ট-করা মাল। "দ্রোআ প্যিব্‌লিক" বলিলে সেকালের ভারতবাসীরা বুঝিত "রাজ্য-শাসন"। সেকালের চিন্তায় "রাষ্ট্র" অর্থাৎ লোক বা দেশ ছিল "রাজ্যের" সাত অঙ্গের এক অঙ্গ।

রাষ্ট্র-"লক্ষণ"

(১)

"রাষ্ট্র" (ব. রাজ্য) কাহাকে বলে ? কোন্ অর্থে বর্ত্তমান গ্রন্থে "রাষ্ট্র" অর্থাৎ "ষ্টেট" শব্দ ব্যবহৃত হইবে ? কোনো ব্যক্তি "রাষ্ট্র" নয়। কোনো পরিবার "রাষ্ট্র" নয়, কোনো "ধর্ম্ম-সঙ্ঘ" "রাষ্ট্র" নয়, কোনো বণিক-সঙ্ঘও "রাষ্ট্র" নয় ? যদিও কি পরিবার, কি ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, কি বণিক-সঙ্ঘ প্রত্যেকের আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলাবিধানের জন্য আইনসঙ্গত কাজ করা হইয়া থাকে।

প্রত্যেকের শাসনেই রাষ্ট্র-সদৃশ "গড়নে"র ইঙ্গিত পাই। হয়ত কোনো কোনো যুগে কোনো কোনো দেশে পরিবার ধর্ম্মসঙ্ঘ, বণিকসঙ্ঘ ইত্যাদি দলবদ্ধ নরনারী প্রায় ষোল আনা রাষ্ট্রের গড়ন বা রূপ পাইয়া থাকিতেও পারে। তথাপি এই সকল রূপ বা গড়নকে বর্ত্তমান আলোচনায় "ষ্টেট" বা "রাষ্ট্র" উপাধি দেওয়া হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন রক্তের, ভিন্ন ভিন্ন পরিববারের, এবং ভিন্ন ভিন্ন দলের একত্র বসবাসের ঠাঁই বা দেশ থাকা চাই। তাহা হইলে জন-কেন্দ্রকে রাষ্ট্র বলা চলে। দেশ-বদ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তি বা লোক সমষ্টির সমবায় রাষ্ট্র।

এই ব্যাখ্যায় "রাষ্ট্রে"র সংখ্যা যারপরনাই কমিয়া যাইবে। প্রাচীন ইয়োরোপের এবং প্রাচীন ভারতের অনেক সামাজিক গড়নই,—অনেক দলবদ্ধ জীবন-কেন্দ্রই,—রাষ্ট্র নামের দাবী করিতে অনধিকারী। সেই সকল সমাজ-কেন্দ্রে লোকেরা সুখে ছিল কি দুঃখে ছিল, তাহার ব্যবস্থায় সুশাসন চলিত কি কুশাসন চলিত সে কথা আলোচনার বহির্ভূত। শাসন-প্রণালী

সমন্বিত যে কোনো লোক-সমষ্টিই "রাষ্ট্র" নয় এই পর্য্যন্ত ধরিয়া লইতেছি মাত্র।

(২)

লোক-সমষ্টির ভিতর রক্তবৈচিত্র্য এবং বংশবিভিন্নতা না থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্র বলা হইবে না। তাহার সঙ্গে একটা দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও তাহার নাম রাষ্ট্র নয়। এই দুই রাষ্ট্র-"লক্ষণে"র সঙ্গে আর একটা "লক্ষণ" জুড়িয়া দিতেছি। রাষ্ট্রের শাসনে যাহারা মোতায়েন তাহারা "সমাজ" হইতে আলাদা হইয়া পড়ে। তাহার ফলে একটা স্বতন্ত্র শাসন-যন্ত্র গড়িয়া উঠে। শাসন-যন্ত্রটার সু-কু অন্য কথা। কিন্তু শাসন-যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য সমাজে লক্ষ্য করিবার বস্তু।

মানবজাতির ইতিহাসে এই তিন লক্ষণওয়ালা লোকসমষ্টি গুন্‌তিতে বড় বেশী নয়। অন্যান্য লোকসমষ্টির গড়ন গুলা অ-রাষ্ট্রীয় বা প্রাক্-রাষ্ট্রীয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে রাষ্ট্রীয় গড়ন গুলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই সব অ-রাষ্ট্রীয় এবং প্রাক্-রাষ্ট্রীয় লোকসমষ্টির গড়ন এবং শাসন-প্রণালীও আলোচনা করিতে হয়।

"রাষ্ট্র" এক অতি নবীন প্রতিষ্ঠান। চিরকাল "রাষ্ট্র" নামক লোক-সমষ্টি জগতে ছিল না। ভবিষ্যতেও যে চিরকাল "রাষ্ট্র" থাকিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসরে রাষ্ট্রীয় অ-রাষ্ট্রীয় এবং প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রত্যেক গড়নেরই ইজ্জৎ আছে। তবে কখন কোন্ লোকসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হইতেছে এবং কোন্ লোকসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হইতেছে না, তাহা যথা সময়ে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পারি-ভাষিকের ব্যবহারে সতর্ক না হইলে হিন্দুনরনারীর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গুলার "কুলশীল" লইয়া গোলে পড়িতে হইবে।

হিন্দু শাসননীতির সাক্ষী

হিন্দু "কন্‌ষ্টিটিউশ্যন" বিবৃত করা সহজ নয়। ১৯১৯ সালের "গবমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্‌ট" অর্থাৎ "ভারত শাসন-বিধি" যে ধরণের দলিল, সেই ধরণের দলিল প্রাচীন ভারতের কোনো যুগ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমের নানা যুগ বিষয়ক "পাব্‌লিক ল" পাওয়া যায়।

বাদশা যুস্তিনিয়ানের আমলে (৫২৬-৫৬৫) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চারশ' বৎসরের "কন্‌ষ্টিটিউশ্যন" বা শাসন-প্রণালী "কোদ্‌" নামে একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। এই "কোদ্‌" অবশ্য তাঁহার সঙ্কলিত "দিজেস্ত" এবং তাঁহার প্রচারিত "ইন্‌স্তিতিউৎ" হইতে স্বতন্ত্র। কেন না সেই দুইটা সংগ্রহে ব্যক্তি বিষয়ক বা "সিহ্বিল্‌" আইনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌর্য্য আমল বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রাচীনতম খুঁটা। আর শেষ খুঁটা হইতেছে সেন ও চোল আমল। এই ষোল সতের শ' বৎসরের রাষ্ট্রশাসন বুঝিবার জন্য তাম্রশাসন, প্রস্তর লিপি, মুদ্রা এবং পর্য্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

"ধর্ম্ম", "স্মৃতি" এবং "নীতি"-শাস্ত্রের সাক্ষ্য লওয়া হইবে না। এমন কি, কৌটিল্যকেও কালেভদ্রে এক আধবার মাত্র সাক্ষী ডাকা যাইবে। রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি সাহিত্যের ডাক পড়িবে না।

এই সকল সাহিত্যের জোরে হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-চিন্তা বা রাষ্ট্র-দর্শন প্রকাশ করা সম্ভব। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রণীত "হিন্দু রাষ্ট্র-চিন্তার ইতিহাস" নামক ইংরেজি গ্রন্থে (কলিকাতা ১৯২৩) এই কার্য্য-সাধনের চেষ্টা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান লেখকের "হিন্দু সমাজের বাস্তব ভিত্তি" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগেও (এলাহাবাদ ১৯২১) এই প্রয়াস আছে। কিন্তু বাস্তব রাষ্ট্রশাসনের বৃত্তান্ত হিসাবে এই দুই গ্রন্থ চলিবে না।

১৮৯৫ সালে লাইপৎসিগে প্রকাশিত হইয়াছিল ফয়-প্রণীত "ক্যো'নিগ-লিখে গেহ্বাল্ট"* বা "রাজশক্তি"। এই জার্ম্মাণ গ্রন্থে আছে একমাত্র হিন্দু "সাহিত্যে"র প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই ইতিহাস ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রীতি দেখিতে পাই হপ্‌কিন্‌স্‌ হইতে হিল্লেব্রাণ্ট পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশী বিদেশী লেখকের গ্রন্থে। বর্ত্তমান গ্রন্থকার এই আলোচনা-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী।

* এক কথায় বলা যাইতে পারে যে,—আজ পর্য্যন্ত ভারত-তত্ত্ববিদেরা যে সকল প্রমাণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সেই সব বর্ত্তমান গ্রন্থে পুরাপুরি বাদ দেওয়া হইয়াছে। শাসন সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য আবিষ্কার করিবার দিকে গবেষণা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লী কেন্দ্রের শাসন-প্রথা

মৌর্য্য আমল (খৃঃ পূঃ ৩২৩-১৮৫) হইতে চোল আমল (খৃঃ অঃ ৮৫০-১৩১০) পর্য্যন্ত ভারতে পল্লীকেন্দ্রকে কোথাও কখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে দেখা যায় না। বস্তুতঃ পল্লীশাসন সম্বন্ধে প্রমাণ একপ্রকার পাওয়াই যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে বুঝি যে, পল্লী বড় একটা রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যতম অঙ্গ মাত্র।

পল্লী বা গ্রাম এই শব্দ "শাস্ত্র" এবং অন্যান্য সাহিত্যে পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লীর শাসনে কিরূপ প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত "ধর্ম্ম," "স্মৃতি" এবং "নীতি"-শাস্ত্রে আছে কিনা সন্দেহ। পল্লীর জন্য সাম্রাজ্যের সদর কর্ম্মকেন্দ্রের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীর নাম করিয়াছেন কৌটিল্য (৩।১০)। পল্লীর "গোপ"কে ছাড়া এইসকল "শাস্ত্র" আর কাহাকে বোধ হয় জানে না।

পল্লী-শাসন সম্বন্ধে যা কিছু খবর সবই দক্ষিণ ভারত এবং লঙ্কা হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাও আবার খৃষ্টীয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। সবই "লিপির" প্রমাণ।

দক্ষিণ ভারতে পল্লী-স্বরাজ

(১)

চোল সম্রাট প্রথম রাজরাজের আমলে (৯৮৫-১০১৩) পল্লীবাসীরা "সার্ব্বজনিক সভা" ডাকিয়া জনপদের সমবেত মতলব হাঁসিল করিতে অভ্যস্ত ছিল। একটা "মহাসভার" কথা শুনিতে পাই। তাহাতে "যুবা বুড়া" সকলেরই ঠাঁই ছিল।

মহাসভায় আসিত পল্লীর সকল লোকই। কিন্তু আসল কাজ চলিত মহাসভার অন্তর্গত বা অধীনস্থ কয়েকটা ছোট খাটো সভার সাহায্যে। বাগবাগিচার তদ্বির করিত এইরূপ এক সভা। "খাল বিল পুকুর" থাকিত দ্বিতীয় এক সভার আওতায়। এক সভার তাঁবে ছিল সোণা-রূপার চলাচল। বিচার চলিত অপর এক সভার অধীনে। "পঞ্চবর" নামক সভায় বোধ হয় একটা কোনো বিশেষ কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইত। এই পাঁচটা সভাছাড়া প্রত্যেক বৎসর একটা করিয়া সকলের মিলিত সভা বসিত।

(২)

সভায় আসিত কিরূপ লোক? "যুবা বুড়া" বা বয়স নির্ব্বিশেষে "মহাসভা"য় আসিয়া তর্কবিতর্কে যোগ দিত। কিন্তু আসল কার্য্যকরী সভায় ঠাঁই ছিল কিরূপ লোকের?

ত্রিশ বৎসরের কম যাহাদের বয়স তাহারা ছিল "নাবালক"। আর পঁচাত্তরের কোঠা যাহারা পার হইত তাহারা সভায় মাতব্বরি করিতে পাইত না।

এই গেল বয়সের সীমানা। ধনদৌলতের সীমানাও আছে। প্রথমতঃ, কম সে কম সিকি "বেলি" অর্থাৎ পাঁচ বিঘা জমির মালিক হিসাবে সরকারকে খাজনা দেওয়া চাই। তাহার উপর যে বাস্তু ভিটায় বসবাস তাহার মালিক হওয়া চাই। "হাভাতে" "হাঘরে" লোকেরা পল্লীর কার্য্যকরী সভার মেম্বর হইতে পারিত না। চোল আমলে মান্দ্রাজীরা "ধন-তন্ত্র" স্বীকার করিয়া চলিত।

তাহার উপর ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ ত ছিলই। "ব্রাহ্মণ্য" শব্দে "বিদ্যাতন্ত্র" বুঝিলেও চোল স্বরাজের সীমানাটা নজরে আসিতে ছাড়ে না।

পল্লীশাসনে সভার মাহাত্ম্য চোলকওলের এক বড় কথা। আর স্বরাজটা যে "রামাশ্যামার" রাজ্য নয়, এই কথাও সেই যুগের আর এক বড় তথ্য।

(৩)

মান্দ্রাজীরা আরও কতকগুলা নিয়ম কায়েম করিয়া শাসন-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। টাকা পয়সার হিসাব লইয়া যে সকল সভ্য একবার গণ্ডগোলে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে আর "সভামুখো" হইতে দেওয়া হইত না। "মহাপাতকে" দোষী যে সব লোক, তাহারাও সভার বাছাইয়ে দাঁড়াইতে পাইত না।

এই দুই নিষেধ সহজেই বোধগম্য। আর একটা নিষেধের নিয়ম শিক্ষাপ্রদ। তিন বৎসর উপরাউপরি কোনো লোক সভায় ঠাঁই পাইয়া থাকিলে তাহাকে চতুর্থবার সভায় যাইবার সুযোগ দেওয়া হইত না। এই নিষেধটা শাসনপ্রণালীকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের অতিবৃদ্ধি হইতে বাঁচাইবার উপায়।

(৪)

দক্ষিণ ভারতে যে সকল "লিপি" পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনো কোনোটায় নারী সভ্যের নাম দেখিতে পাই। কাজেই সভায় নারীর ঠাঁই আইন-সঙ্গত ছিল, এইরূপ বুঝিয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু নারী সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোনো কথা স্বতন্ত্র ভাবে কোনো সভার নিয়মে বলা নাই।

"মহাসভা"য়ও নারীরা হাজির থাকিত, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কার্য্যকরী সভায় যখন নারীদের উপস্থিতি সম্ভব, তখন সার্ব্বজনিক বাকবিতণ্ডার মেলায়ও নারীর ঠাঁই সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে। লোহ্বি-প্রণীত "আদিমসমাজ" নামক গ্রন্থে (নিউইয়র্ক ১৯২০) নারীর

ইজ্জৎ উঁচুই দেখিতে পাওয়া যায়।" "সভ্যতা" বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নারীর রাষ্ট্রীয় ইজ্জৎ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই কমিয়াছে।

পল্লী-স্বরাজের বাছাই-মঙ্গল

(১)

চোল ভারতের পল্লী-কেন্দ্রে মহাসমারোহের সহিত সভ্য-বাছাই অনুষ্ঠিত হইত। উত্তর মল্লুর জনপদে আবিষ্কৃত "লিপি"টা প্রাচীন মাদ্রাজীদের স্বরাজ প্রথা সম্বন্ধে সাক্ষী।

পল্লীতে ত্রিশ জন সভ্য দরকার হইত। এই কারণে পল্লীকে ত্রিশ পাড়ায় ভাগ করিয়া লওয়া হইত। প্রত্যেক পাড়ার প্রত্যেক লোক এক এক জনের নাম লিখিয়া দিত। নামগুলা পল্লীর বিভিন্ন পাড়া হিসাবে পৃথক পৃথক রাখিয়া দেওয়া হইত। নামের গোছার উপর নিজ নিজ পাড়ার নম্বর আঁটিয়া দিবার ব্যবস্থাও ছিল।

তাহার পর "মহাসভার" ভিড়। যুবা বুড়ার আনা গোনা। পুরোহিতেরা হাজির থাকিতে বাধ্য। এই মেলায় এক হাঁড়ির ভিতর গোছা ত্রিশটা রাখিয়া দেওয়া হইত। পুরোহিতদের মধ্যে বয়সে যে সবসে প্রবীণ সে আসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া হাঁড়িটা ধরিত। তাহার হুকুমে সভার এক ছোকরা কিছু না দেখিয়া হাঁড়ি হইতে একটা গোছা তুলিয়া লইত।

সেই গোছাটার উপর যে সব লোকের নাম আছে সেইগুলা পরে আর এক হাঁড়িতে ফেলা হইত। নাম গুলা হাঁড়ির ভিতর এলোমেলো ভাবে "ছেলে" ছোকরা একটা একটা করিয়া নাম তুলিয়া দিত। নামটা পাঠ করিবার ভার থাকিত একজন কর্ম্মচারীর হাতে। শুনিবা মাত্র পুরোহিতেরা সভাস্থলে জানাইয়া দিত।

(২)

"লিপি"টা যদি জাল না হয় তাহা হইলে এই বিবরণকে অসত্য বলা কঠিন। তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, চোল আমলে পল্লীর "প্রত্যেক লোক" লিখিতে পারিত।

পল্লীতে নরনারীর "প্রতিনিধিরা" শাসনের দায়িত্ব পাইত। অর্থাৎ সকল নরনারীই শাসনকর্ত্তা ছিল একপ বুঝা যায় না। তাহাদের বাছাই-করা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক শাসনের ভার পাইত। বুঝিতে হইবে,-পল্লীর লোক সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

তাহা ছাড়া, পল্লীবাসীরা সকলেই "ভোট" দিতে অধিকারী। নাম লিখিয়া দেওয়ার এক্তিয়ারই তাহার প্রমাণ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত "লটারি" করিয়া নাম-বাছাই হইত। কাজেই "কপালের জোর" না থাকিলে পল্লী-স্বরাজে কর্ত্তামি করা সম্ভব পর হইত না।

প্রতিবৎসরই এইরূপ ভোট ও লটাবি চলিত। কাজেই কোন লোকের কপালে বড় বেশী দিন স্ববাজ-"যোগ" থাকিত না। পল্লীর বহু লোকই "ত্রিশের একজন" হইবার সুযোগ পাইত। সার্ব্বজনিক রাষ্ট্রীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে চোল পল্লীগুলা মানব জাতিব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

পল্লীবাসীর রাষ্ট্রীয় এক্তিয়ার

(১)

পল্লীকেন্দ্রের শাসন ষোল আনাই পল্লীবাসীর তাঁবে ছিল। সভার বাছাই হইবার পব সভ্যেরা যা খুসী তা করিতে পারিত না। তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতাও সভার হাতে ছিল। পল্লীর কর্ম্মচারীরা পল্লীর বাহিরের কোনো উপরওয়ালার ধার ধারিত না এইরূপ বুঝা যায়।

পল্লীবাসীরা সকল প্রকার কর বা খাজনা পল্লী-সভাকে বুঝাইয়া দিত। কোনো কোনো জনপদকে খাজনা হইতে রেহাই দিবার এক্তিয়ারও পল্লী-সভার ছিল। ব্যক্তিবিশেষও পল্লীসভার অনুগ্রহে খাজনা হইতে রেহাই পাইত। কখনো বা পল্লীসভার ভারপ্রাপ্ত কোনো কোনো "সঙ্ঘ" বা "সমূহ" নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির তদারক করিতে পারিত। পল্লীসভার কর্ত্তৃত্ব এই বিষয়ে ছিল একপ্রকার অসীম।

কোনো কোনো জমিজমায় পল্লী-সভার স্বত্বাধিকার নির্দ্দিষ্ট ছিল। নতুন নতুন জমিন সৃষ্টি হইলে তাহাও পল্লী-সভার দখলে আসিত। সাম্রাজ্যের সদর খাজনা দিতে যে সকল পল্লীবাসী অপারগ, তাহাদের সম্পত্তি দখল করিয়া বেচিবার এক্তিয়ারও ছিল পল্লী-সভার হাতে।

পল্লীর মামলা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইত পল্লী-সভায়। খুনী আসামীদের বিচারও পল্লী-সভায়ই অনুষ্ঠিত হইত। এমন কি মৃত্যু দণ্ড দিতে হইলে ও পল্লী-সভা সদর আদালতের মতামত চাহিয়া পাঠাইত না। আসামী যদি অজ্ঞানে বা দৈবক্রমে কোনো লোককে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শাস্তি হইত জরিমানা মাত্র। মৃত্যুদণ্ড রদ করিয়া জরিমানার হুকুম করা পল্লী-সভার মামুলি ক্ষমতার অন্তর্গত বিবেচিত হইত।

(২)

সাম্রাজ্যের এক কর্ম্মচারী পল্লীতে মোতায়েন থাকিত বটে। কিন্তু পল্লী-স্বরাজে হস্তক্ষেপ তাহার পক্ষে একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। খুনাখুনির মামলায়ও পল্লী-সভার বিচারকেরা এই কর্ম্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত না।

এই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত অন্যান্য ক্ষমতাও পল্লী-সভার ছিল। কারিগর-"শ্রেণী"রা যেমন লোকের টাকা জমা রাখিত, চোল-

মণ্ডলের পল্লী-সভাগুলাও সেইরূপ জনগণের ধনভাণ্ডার বা ব্যাঙ্কওয়ালার কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিল। ভূসম্পত্তি এবং টাকাকড়ি দুই প্রকার ধনই পল্লী-সভা জমা লইত। যাহারা জমা দিত, তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে টাকা খরচের ব্যবস্থা করাও পল্লী-সভার অন্যতম কাজ ছিল। এই জন্য বৎসর বৎসর কর্ম্মচারী বাহাল করিয়া গচ্ছিত টাকার সদ্ব্যবহার করা হইত।

আত্ম-কর্তৃত্বে চোলমণ্ডল

চোলমণ্ডলের নরনারী রক্তের হিসাবে "দ্রাবিড়" জাতীয় লোক। তথাকথিত "আর্য্য" রক্ত (?) তাহাদের শিরায় বহিত না। লিপিগুলা তামিল ভাষায় রচিত। এই সকল রচনায় পালি বা সংস্কৃতের গন্ধ নাই। কিন্তু হিন্দু নরনারীর আত্মকর্তৃত্ব, ব্যক্তিত্ব জ্ঞান এবং শাসন-দক্ষতা তামিল ভারতের পল্লী-বিধানে যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা অপেক্ষা বেশী-কিছু "বিনয়"-সাহিত্যের সঙ্ঘ-শাসনে অথবা বৃহস্পতির "সমূহ"-কানুনে পাওয়া যায় না।

তামিল শাসন-বিধিতে পল্লী-কেন্দ্রের অনেক কথা জানা গিয়াছে। সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর নাই। কয়েকটা তথ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রথমতঃ, নরনারীরা জনপদ হিসাবে এই শাসন-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। রক্তের টান, বংশের কথা, বা যৌন সম্বন্ধের আত্মীয়তা এই কেন্দ্রের বন্ধন-রজ্জু নয়। পল্লী, পল্লীর পাড়া, এক কথায় "দেশ" ছিল তাহাদের স্বরাজ, আত্ম-শাসন এবং স্বভাগ্যগঠণের বাহন। এই শাসন-কেন্দ্রকে একটা "বৃহদাকার পরিবার" অথবা "পরিবার-সমবায়" বা সমরক্ত বংশের বিস্তার রূপে দেখিলে ভুল বুঝা হইবে। চোল পল্লীগুলাকে কোনো মতেই হোমারীয়-গ্রীক, বৈদিক-হিন্দু অথবা তাসিতুস-

বর্ণিত ব্যাপার পল্লীর ভূমিদার বিবেচনা করা অসম্ভব। এমন কি শাক্য-গৌতমের সমসাময়িক বিহার প্রদেশের "গণ"-তন্ত্রী সমাজগুলা ও এই দ্রাবিড় শাসন-কেন্দ্রের অনুরূপ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রগুলা কোনো সুবিস্তৃত রাষ্ট্র-কলেবরের "অঙ্গ" বিশেষ। রোমাণ সাম্রাজ্যের "মুনিসিপিয়ুম" নামধারী স্বরাজশীল জনপদ যে বস্তু, চোল পল্লীসমূহ ঠিক তাই। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পল্লী বা নগর যে ছাঁচের স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ ভোগ করে, চোল আমলে দক্ষিণ ভারতের এই সকল জনপদও সেই ছাঁচের স্বরাজই ভোগ করিত।

তৃতীয়তঃ, চোল নরনারীর আত্মকর্ত্তৃত্বের খতিয়ান করিতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে সমাজের "অধিকারী"-"অনধিকারী" ভেদ। ধন-তন্ত্র এবং বিদ্যা-তন্ত্র যে স্বরাজের গোড়ার কথা সেই সমাজে সাম্য নাই, ব্যক্তি মাত্রের হাতে আত্মভাগ্য নির্ণয় নাই, এক কথায় ষোল আনা স্বাধীনতা নাই। এইখানে জিজ্ঞাস্য, পুরাপুরি সাম্য ও স্বাধীনতা দুনিয়ার কোথায় এবং কবে ছিল বা আছে? "অধিকারী" আর "অনধিকারী" আজ কালকার সুইস এবং মার্কিণ গণতন্ত্রী স্বরাজেও দেখিতে পাই। সেকালের আথেনিয় রাষ্ট্রের (খৃঃ পূঃ ৪৩০) চরম সাম্য-যুগেও "অধিকারী"দের অধীনে জনপ্রতি বিশ জন করিয়া "অনধিকারী" ছিল। রোমেও রাজ-তন্ত্রের আমলে সাৰ্বিয়ুস তুলিয়ুস (খৃঃ পূঃ ৪৯০) যে শাসন-প্রথা কায়েম করেন, তাহাতে "অনধিকারীরা" অধিকারীদের আইন-কানুনকেই "স্বরাজ" বলিয়া গিলিতে বাধ্য থাকিত।

চতুর্থতঃ, তামিল ভারতের পল্লী বিধানে "অধিকারী"রা যতদিকে যতখানি আত্মকর্ত্তৃত্ব ভোগ করিয়াছে, ততদিকে ততখানি আত্মকর্ত্তৃত্ব-ভোগের সুযোগ বর্ত্তমান জগতে "পাব্লিক্ ল" কোনো দেশেই দেয় না।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শাসন-বিষয়ক আইন "মুনিসিপিয়ুম" বা নগর ও পল্লীগুলাকে সদর-কেন্দ্রের আওতায় ঐক্যবদ্ধ এবং শৃঙ্খলী-কৃত রাখিতে প্রয়াসী। স্বাস্থ্যরক্ষার তদবির করা, গাঁয়ের পাঠশালা চালানো ইত্যাদি কাজ ছাড়া বর্ত্তমান জগতের পল্লী, শহর "কর্পোরেশন"গুলা আর কিছুর উপর হাত দিতে অধিকারী নয়।

কিন্তু চোল পল্লা-বিধানে নরনারীর স্বরাজ-গণ্ডী বিস্তৃততর। এইখানে ইয়োরোপীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "নগর'-শাসন, "লিবার বুর্গ'স্" বা নাগরিকদের স্বাধীনতা ইত্যাদিব চিত্র মনে আসা স্বাভাবিক। বর্ত্তমান জগতেব "ন্যাসন্যালিজ্‌ম" বা এক-রাষ্ট্রীয়তা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্যেব খাতিরে পল্লী ও নগব হইতে মধ্যযুগের আত্মকর্তৃত্বকে খর্ব্ব করা হইয়াছে।

পল্লী-বিজ্ঞান

(১)

পল্লী-শাসনের আলোচনায় জমিজমা এবং টাকাকড়ির আইন কানুন সবিশেষ আলোচ্য। জগতের নানা দেশে পল্লীর গড়ন কবে কিরূপ ছিল তাহার আলোচনায় বহু পণ্ডিত সময় দিয়াছেন। পল্লীজীবনের আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় ধারা ধাপে ধাপে বুঝিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

ডোপ্‌শ-প্রণীত "ভির্ট্‌শফ্‌ট্‌ লিখে উণ্ড্‌ সোৎসিয়ালে গ্রুণ্ড্‌লাগে ড্যর অয়রোপেবিশেন কুল্‌টুর" (ভিয়েনা, ১৯১৮) নামক গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইয়োবোপীয় জীবনের আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি বিবৃত আছে। ফরাসী পোল লাফার্গ-প্রণীত "ধনদৌলতের রূপান্তর" গ্রন্থ আর্থিক ইতিহাসে পল্লীর ঠাঁই নির্দ্ধারিত কবিয়াছে। রুশ পণ্ডিত ভিনোগ্রাদোফ তাঁহাব "ইংলিশ সোসাইটি ইন দি ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি"

(অক্‌স্‌ফোর্ড, ১৯০৮) গ্রন্থে নরম্যান আমলের ইংরেজ সমাজের পল্লীব্যবস্থা এবং আর্থিক লেনদেন বিবৃত করিয়াছেন। ধনবিজ্ঞানবিৎ আশ্‌লে-প্রণীত "সার্ভে'জ্‌ হিষ্টরিক অ্যাণ্ড ইকনমিক" (লণ্ডন ১৯০০) নামক প্রবন্ধমালায় পল্লী-বিধানের ধনদৌলত আলোচিত আছে। তাহা ছাড়া তথাকথিত "ভিলেজ কমিউনিটি" (বা যৌথ-পল্লী অর্থাৎ পল্লী-সাম্য) সম্বন্ধে দুনিয়ার অলি গলি হইতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে নানা দেশীয় নানা নৃতত্ত্ববিদের গ্রন্থাবলীতে।

(২)

কিন্তু ভারতীয় পল্লীর "বিকাশ-ধারা" বুঝিবার দিকে বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। একটা সামান্য প্রশ্ন করা যাউক ?—"চোলমণ্ডলের পল্লী-স্বরাজ কত লোকের কত যুগের সংগ্রাম ও সাধনার ফল ?" এই "দ্রোআ প্যিব্‌লিক" বা শাসন-বিষয়ক আইন-কানুন কি থপ্‌ করিয়া হঠাৎ এক দিন কোনো মহাপুরুষ রাজা বা পল্লী-সর্দারের মগজ হইতে বাহির হইয়াছিল ? না, তামিল ভাষাভাষী দ্রাবিড় নরনারী এখানে আজ একটা অধিকার, ওখানে কাল একটা ক্ষমতা লাভ করিতে করিতে অনেক কষ্ট কছরতের পর এই অপূর্ব্ব আত্মকর্ত্তৃত্ব দখল করিয়াছিল ? না, মান্ধাতার আমলের "ধন-সাম্য" এবং "জাতি-গত" সমাজের স্বরাজ খর্ব্ব হইতে হইতে এই অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছিল ?

এই ধরণের প্রশ্ন পশ্চিমা পণ্ডিতেরা নিজ নিজ দেশের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী হিসাবে জেলা ধরিয়া ধরিয়া গা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তথ্য বাহির করা তাঁহাদের দস্তুর। "মধ্যযুগের পল্লী" এই ধরণের সহজ-সরল শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন না। মধ্যযুগের ভিতরও স্তর-বিভাগ আছে, যুগ-পরম্পরা

আছে। পল্লীজীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সেই সকল তন্ত্র-বিন্যাসের কাঠামে না ফেলিতে পারা পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্য শেষ হয় না।

পল্লী-বিধানে ধনদৌলত

ভারতীয় পল্লীর আর্থিক বিকাশ-ধারা বুঝা রাষ্ট্রীয় বিকাশ-ধারার মতনই কঠিন। কেননা চোল পল্লী-বিধানে যে সকল আইন-কানুন দেখিতে পাই তাহাতে তথাকথিত "মধ্যযুগের" বা "আদিম" সভ্যতার বা "বার্ব্বার" জীবনের চিহ্ন নাই। প্রায় পুরাদমে "আধুনিক" ব্যবস্থাই দেখিতে পাই।

(১)

চোল আইনে পল্লীবাসীরা জমী "কেনা বেচা" করিতে অধিকারী। পল্লী-সভার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই সন্দেহ নাই। কিন্তু জমি ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। নবসভ্যতার যে যুগে জমিজমা পল্লীর "যৌথ" সম্পত্তি, সে যুগ তামিল অনুশাসনে চিত্রিত নয়।

দ্রাবিড়েরা নিজ নিজ জমীর জন্য "খাজনা" দিত। খাজনা না দিতে পারিলে জমি "বাজেআপ্ত" হইত। ইহাও "ধনসাম্যশীল" "যৌথ"-নীতি-শাসিত সমাজের কথা নয়।

দ্রাবিড় সমাজে "বাস্তভিটা"র উপর অধিকারও ব্যক্তিগত। এই অধিকারের জোরেই সভায় বসিবার দাবী চলিত। বাস্তভিটাগুলা কোনো পরিবার-সমবায় বা যৌথপল্লীর সমবেত সম্পত্তি নয়।

অধিকন্তু ধন-তন্ত্র এবং বিদ্যাতন্ত্র যে পল্লী-সমাজের স্বরাজের বনিয়াদ, সেই সমাজে পল্লী-সাম্য, ধন-সাম্যশীল আইনকানুন অথবা "বসুধৈব কুটুম্বকং"-নীতি চলিত না এ কথা সহজেই অনুমেয়। তবে পল্লী-সভা

নামক শাসনকর্ত্তাদের "সঙ্ঘ-শক্তি" কতকগুলা জমির মালিক ছিল,-ইহা কল্পনা করা যে-কোন যুগ সম্বন্ধেই সম্ভব।

(২)

খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর কথা বলা হইতেছে। এই সময়ে ইয়োরোপে,-বিশেষতঃ ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে শার্ল্যমেঞের বংশধরদের যুগ চলিতেছিল। ইহাকে মধ্যযুগের প্রথম স্তর বলা হয়।

এইযুগে নানা অঞ্চলে খাঁটি যৌথ সম্পত্তিশীল সমাজের জের চলিতেছিল। বিখ্যর-প্রণীত "এন্ট্ষ্টেয়ুঙ্ ড্যর ফোল্ক্স্-হ্বির্টশাফ্ট" (ট্যিবিঙ্গেন ১৯১৩) নামক আর্থিক জীবন ধারার ইতিহাস-গ্রন্থে অথবা গের্ড্সে-প্রণীত "গেশিষ্টে ডেস ড্যয়চেন বাওয়ার্ণটুম্স্" অর্থাৎ "জার্ম্মাণ কিষাণ সমাজের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও জমিজমার কেনাবেচা বহু পল্লীতে প্রচলিত হয় নাই। পল্লী-সভায় ভাঁবে জনপদের জমিগুলা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিবারে পরিবারে বাঁটিয়া দেওয়া হইত মাত্র।

পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে আর্থিক চিত্র পাওয়া যায় রোমাণ সেনাপতি তাসিতুসের "জার্ম্মানিয়া" গ্রন্থে তাহা হইতে এই ব্যবস্থা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দশম একাদশ শতাব্দীর চোলপল্লীর বহু পশ্চাতে এই সকল ইয়োরোপীয় পল্লীর স্থিতি। তবে অল্পকালের ভিতরেই চোল পল্লী-বিধানের ব্যক্তিত্বই ফ্রান্সে এবং জার্ম্মানিতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

তথা কথিত "যৌথপল্লী" বা "হ্বিলেজ কমিউনিটি"

"হ্বিলেজ কমিউনিটি" শব্দটা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লেখকেরা সর্ব্বদা বিশদ করিয়া দেন না বলিয়া কোন্ প্রতিষ্ঠানকে কখন "হ্বিলেজ কমিউনিটি" বলা হইতেছে বুঝিতে গোল বাঁধে।

চাষবাসের কাজে চোল আমলের পল্লীবাসীরা পরস্পর-পরস্পরকে সাহায্য করিত। এই টুকু স্বীকার করিয়া লওয়া সহজ। ইহার নাম যদি "যৌথ" ব্যবস্থা, পল্লী-"সাম্য," বা "সমবেত" পল্লী-বিধান হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ইয়াঙ্কি যুক্ত রাষ্ট্রের "ফার্ম্মার" বা কিষাণ-মালিকেরাও "ভিলেজ কমিউনিটি"তে বসবাস করিয়া থাকে। ব্যাভেরিয়ায়ও পল্লী-সমবায় চলিতেছে।

সামাজিক লেনদেন, পূজাপার্ব্বণ, খেলা ধূলা, অতিথি সৎকার ইত্যাদি অনুষ্ঠানে "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" নীতি, কি মধ্যযুগে কি বর্ত্তমান যুগে,—দুনিয়ার সর্ব্বত্রই পল্লী-বিধানে দেখা যায়। ইহাকেই কি "ভিলেজ কমিউনিটির" "ধন-সাম্য" নীতি বলা হইবে? তাহা হইলে "কমিউনিজম্" মানব রক্তের স্বধর্ম্ম। প্রত্যেক নৃতত্ত্ব-সেবীর গবেষণায় এই সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

তাহা ছাড়া, গোচারণের মাঠ "খড়কুটা" কুড়াইবার বন জঙ্গল ইত্যাদি "খাশমহাল"-শ্রেণীর জমি পল্লী-সভার সম্পত্তিরূপে নেহাৎ আধুনিক কালেও জগতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। দশম একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর চোল-ভারতেও এই ধরণের খাশমহাল পল্লীর "যৌথ সম্পত্তি" ছিল এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন নয়। এই জন্যই যদি দ্রাবিড় হিন্দু নরনারীকে "কমিউনিষ্ট" বা ধন-সাম্যপন্থী বলিতে হয় তাহা হইলে কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলাই আবশ্যক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পল্লী

দেখা গেল, কি—রাষ্ট্রীয় হিসাবে, কি আর্থিক হিসাবে পল্লী-কেন্দ্র ভারতীয় নরনারীর বিশেষত্ব নয়। জগতের অন্যান্য দেশেও নানা যুগে পল্লী নামক জনপদ শাসন-কেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আজও দুনিয়ায় পল্লী নামক রাষ্ট্রীয় "অণুর" সংখ্যা কম নয়।

পল্লী-স্বরাজে ভারতীয় নরনারী যে দরের আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিয়াছে তাহা গ্রীসে এবং রোমে অজানা ছিল না। ইয়োরোপের মধ্যযুগেও এই দরের "লিবার বুর্গ'স" সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত ছিল। এইখানে পল্লী আর নগরকে "জনপদগত" কেন্দ্র হিসাবে সমশ্রেণীভুক্ত করা হইল।

চোল অনুশাসনে "খাঁটি" "যৌথ সম্পত্তির" বিধান পাওয়া যায় না। সে বিধান যে-প্রাচীনতর সমাজের সাক্ষী, সেই সমাজ দক্ষিণ-ভারতের চোল আমলে কোথাও ছিল কিনা এই প্রশ্ন সহজে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে "যৌথ সম্পত্তি"র লাগাও ব্যবস্থা অর্থাৎ যৌথনীতির জের বা চিহ্নোৎ এই যুগের ভারতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। কিন্তু কি খাঁটি যৌথ সম্পত্তি কি "নিম্" যৌথনীতি দুই-ই ইয়োরোপেও যুগে যুগে প্রচলিত ছিল।

ভারত সম্বন্ধে পল্লীশাসন বিষয়ে যাহা কিছু বলা সম্ভব, সবই ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই কোনো না কোনো যুগে খাটে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাতী পাল্যামেণ্টে মেটকাফ সাহেব ভারতীয় "পল্লী-স্বরাজ" সম্বন্ধে এক দলিল পেশ করিয়াছিলেন। সেই দলিলটা পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া ভারতীয় পণ্ডিত ও রাষ্ট্রিকেরা যেখানে সেখানে যখন তখন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। "ভারতের পল্লী-প্রতিষ্ঠানগুলা অমর" আর "পল্লী-স্বরাজ ভারতীয় শাসনদক্ষতার অন্যতম (অথবা বোধ হয় একমাত্র ?) বিশেষত্ব", এই হইতেছে তাঁহাদের রচনার বা বক্তৃতার ধুআ।

এই সঙ্গে ইংরেজ নৃতত্ত্ববিৎ গম তাঁহার "প্রিন্সিপল্‌স্ অব লোক্যাল গবমে'ণ্ট" (লণ্ডন ১৮৯৭) নামক গ্রন্থে বিলাতী পল্লী-কেন্দ্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই চোখ ঠাণ্ডা হইবে। তাঁহার মতে "ইংল্যাণ্ডের পল্লীগুলা যুগযুগান্তর ধরিয়া নানা বাধা বিপত্তি বিপ্লব সত্ত্বেও আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। হাজার রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এই

সকল কেন্দ্রেব মার নাই। ইংলণ্ডের মানচিত্রে গোটা দেশটার মতনই স্বরাজ-কেন্দ্রের পল্লী-জনপদগুলাও অটুট রহিয়াছে।

বিলাত যে বিলাত,—যে বিলাত "কন্‌ষ্টিটিউশ্যন", "পাব্‌লিক ল," শাসন-বিষয়ক আইন, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে ইয়োরামেরিকার সকল দেশের গুরু,—সেই বিলাতেও উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর সমাজে পল্লী-কেন্দ্রের ঠাঁই অবনমন। প্রাচ্যই বা কোথায়, আর পাশ্চাত্যই বা কোথায়?

সাম্রাজ্য বনাম স্বরাজ

(১)

দক্ষিণ ভারতের পল্লী-গুলা পুরাপুরি স্বাধীন রাষ্ট্র কেন্দ্র নয়। এই গুলা একটা বিস্তৃতের দেশের—চোল সাম্রাজ্যের "অণু" বিশেষ। কাজেই প্রশ্ন উঠে,—বিরাটের সঙ্গে অণুর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? সাম্রাজ্যের অঙ্গ বা অংশ রূপে পল্লীগুলার কি ঠাঁই ছিল? তামিল ভাষী দ্রাবিড়েরা যে একটা সাম্রাজ্যের প্রজা তাহার পরিচয় কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাম্রাজ্যের একজন প্রতিনিধি কর্ম্মচারী রূপে পল্লীতে মোতায়েন থাকিত, কিন্তু প্রায় কোনো শাসন কাজেই পল্লীসভার মাতব্বরেরা এই কর্ম্মচারীর তোআক্কা রাখিত না। এই তোআক্কা রাখা না রাখা ব্যাপারটা কিছু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। কেন না এইখানেই সদর বনাম পল্লী অর্থাৎ সাম্রাজ্য বনাম স্বরাজ সমস্যা ঘনাইয়া রহিয়াছে।

পল্লীবাসীরা যে স্বরাজ ভোগ করিত, তাহার বিধান দিত কে? পল্লী-গুলা যদি স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিত না। কেন না তাহা হইলে পল্লীস্বরাজের স্রষ্টা পল্লীর নরনারী নিজেই। কিন্তু পল্লী যেখানে অন্যান্য পল্লী-নগর-বন-পাহাড-খাল-দরিয়া সমন্বিত সাম্রাজ্যের মফঃস্বল-কেন্দ্র

মাত্র, সেখানে পল্লীর "বাহিরে", পল্লীর "উপরে" একটা মাথা আছে। সেই উপরওয়ালার নাম সদর; রাজধানী বা সাম্রাজ্যের বড় দপ্তর।

(২)

চোল ভারত সম্বন্ধে ইহা সপ্রমাণ করা কঠিন নয়। পল্লী-স্বরাজের একটা আইন পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার জোরে তিন বৎসরের খাজনা না পাইলে পল্লী-সভা জমির মালিকদিগকে জমিহীন করিয়া দিতে পারিত। সেই জমি বেচিয়া ফেলিবার ক্ষমতাও সভার ছিল। অতি উঁচু একতিয়ার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একতিয়ার আসিল কোথা হইতে?

৯৮৬ খৃষ্টাব্দে বাদশা প্রথম রাজরাজ তাঞ্জোরে বসিয়া এই মর্ম্মে ফার্ম্মাণ জারি করিয়াছিলেন। রাজার হুকুম, সাম্রাজ্যের আদেশ, সদরের অনুশাসনই পল্লী-স্বরাজের জন্মদাতা। আজকালকার দিনে ভারতে যাহাকে "লোক্যাল সেল্ফ-গবর্মেণ্ট অ্যাক্ট্" বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিধি বলে, চোল আমলের দ্রাবিড়েরা সেইরূপ শাসন-বিধির জোরেই পল্লী-স্বরাজে আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করিত।

আবার জিজ্ঞাসা করা হউক,—"অধিকারিন্" নামক সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারী মহাশয় পল্লীতে বসিয়া কি কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিতেন? পল্লী সমাজের মাতব্বরেরা কি তাহাদের আত্মকর্তৃত্বের "চার্টার" -দাতার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিত? সাম্রাজ্য তাহা হইলে কিসের?

(৩)

এই বিষয়েও অকাট্য প্রমাণ আছে। ১২৩০ খৃষ্টাব্দের একটা ঘটনা উল্লেখ করা চলে। কোনো পল্লীতে "রাজদ্রোহ" দেখা দিয়াছিল। রাজদ্রোহীদের "ভিটেমাটি" উচ্ছন্ন করা ছিল ন্যায়ের বিধান। জমিজমা

নিলামে উঠিয়াছিল। কিন্তু এই নিলাম কাণ্ডের কর্ত্তা ছিল কাহারা? পল্লী-সভার মাতব্বরেরা নয়। সদর হইতে আট আটজন কর্ম্মচারী আসিয়াছিল। যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারাই সম্পত্তির নিলাম ও দাম ঠিক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

আর একটা পল্লী সম্বন্ধেও তামিল লিপির সাক্ষ্য আছে। "রাজদ্রোহিন্" দিগকে কাবু করিবার জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী বাহাল হইয়াছিল। এই কর্ম্মচারী সাধারণ "অধিকারিন্" হইতে স্বতন্ত্র।

দেখা যাইতেছে যে, "রাজদ্রোহ" বিষয়ক শাসনের ভার পল্লী-স্বরাজের হাতে ছিল না। অর্থাৎ "পোলিটিক্যাল" বা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার জন্য পল্লী বাসীরা সাম্রাজ্যের ক্ষমতা সর্ব্বদাই সহিতে অভ্যস্ত ছিল। এই খানেই পল্লী এক বৃহত্তর সমষ্টির অঙ্গ মাত্র। পল্লী যাহাতে হাত ছাড়া না হইয়া যায় অথবা বেআড়া না হইয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা যে সাম্রাজ্য করিতে না পারে সে সাম্রাজ্যই নয়।

অন্যান্য মামুলি বিষয়েই বা পল্লী স্বরাজ সদরের "অধিকারিন্"কে অগ্রাহ্য করিতে পারিত কি? একটা দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ। কোনো পল্লীসভার তাঁবে একটা মন্দিরের কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। সভার মাতব্বরেরা টাকাটা আত্মসাৎ করে। সভার বিরুদ্ধে মন্দিরওয়ালাদের নালিশ রুজু হয়। মোকদ্দমাটা চলিয়াছিল কোথায়? পল্লীতে নয়, একদম রাজধানীর সদর কাছারিতে। সাম্রাজ্যের আদালতে উভয় পক্ষকেই হাজির হইতে হইয়াছিল। সভার মাতব্বরদের সাজা হয়। মন্দির-ওয়ালারা দোষীদের নিকট টাকা হইতে টাকা ফিরাইয়া পায়।

আর একটা বিষয়ে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পল্লী সমাজে বেশ মালুম হইত। পল্লী সভার খরচ পত্রের খাতাগুলা পরীক্ষা করিত সদরের কর্ম্মচারীরা। চোল রাজাদের "অধিকারিন্"দের একতিয়ার পল্লী স্বরাজে নেহাৎ নিন্দনীয়

ছিল না। পল্লীর নরনারী বুঝিত যে, সাম্রাজ্য নামক একটা জ্যান্ত পদার্থ আছে। তাহার নিকট কুর্ণিশ না করিয়া চলা পল্লীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

৪

এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে, পল্লী স্বরাজে হস্তক্ষেপ করা সাম্রাজ্য নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিত। স্বরাজের সীমানা ই ছিল এই হস্তক্ষেপের গণ্ডীর ভিতর। নিত্য নৈমিত্তিক হিসাবে দশম ত্রয়োদশ শতাব্দীর চোল মণ্ডলে "সদর মফঃস্বলের" সম্বন্ধ এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাউক। এই ব্যবস্থায় নরনারীর আত্মকর্ত্তৃত্ব বোধ হয় বড় বেশী খর্ব্ব হয় না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অপর দিকে সাম্রাজ্যের ইজ্জৎ ও বজায় থাকে।

দেখিতেছি পল্লীগুলা স্ব স্ব প্রধান ভাবে "আপ্‌সে আপ" চলিতে পারিত না। মফঃস্বলের জনকেন্দ্রগুলাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিবেচনা করা সম্ভব নয়। সদরের সঙ্গে নিয়মিত লেন দেনের ব্যবস্থা থাকায় মফঃস্বলের তামিল নরনারী "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" করিবার সুযোগ পাইত। পল্লী স্বরাজকে নেহাৎ "পাড়া গেঁয়ে" বিবেচনা করিলে সাম্রাজ্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা হইবে।

সে যাহা হউক, "স্বরাজের" দৌড়টা আরও সতর্কভাবে জরীপ করা আবশ্যক। "সিডিশ্যন" বা রাজদ্রোহের কাণ্ডে সাম্রাজ্য পল্লীসভাকে বিশ্বাস করিত না। না করাই হয়ত স্বাভাবিক। পল্লী সভার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা সঙ্ঘের মামলা বাধিলে একজন উপরওয়ালার হাতেই বিচারের ভার থাকাও যুক্তি সঙ্গত। সেই পরিমাণে কম স্বরাজ পল্লীবাসীদের দখলে থাকিবে,—কিন্তু তাহা অনিবার্য্য।

তবে পল্লীস্বরাজের হিসাব পত্র সবই সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীর তদারকে ছিল। এই তথ্য বিশেষ গুরুতর। ধরা যাউক যেন,—আজকালকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামক সঙ্ঘের হিসাবপত্র নিয়মিত রূপে লাট-সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ কোনো মন্ত্রী অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই সঙ্ঘের "স্বরাজ" বাঁচে কতখানি? চোল ভারতের "লোক্যাল সেল্‌ফ্ গবমে'ণ্ট" সম্বন্ধেও এই প্রশ্নই উঠিবে।

স্বরাজের দৌড়

পল্লী স্বরাজের সীমানা ঠাওরাইবার জন্য এই ধরণের আরও অন্যান্য তথ্য জানা আবশ্যক। অনেক গুলা বড় বড় কারবারে নরনারী আত্মকর্ত্তৃত্ব ভোগ করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যের নজর এবং শাসন তাহাদের উপর বেশ কড়া এইরূপ না বুঝিলে খাঁটি অবস্থা বাহির হইতে পারে না। হয়ত এই কারণেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে "বিদ্রোহ" দেখা দিত। চোলমণ্ডলের "রাজদ্রোহিণ্"রা কি উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যক্তিত্ব এই উপায়ে ফুটাইয়া তুলিত তাহা সম্প্রতি পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জো নাই। কিন্তু স্বরাজে সাম্রাজ্যে ঠোকাঠুকি এই ধরণের বিদ্রোহের কারণ হওয়া হয়ত অসম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বরাজের লড়াই অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সাম্রাজ্য চায় স্বরাজগুলাকে সদরের তাঁবে আনিতে। চোল মণ্ডলের "সার্ব্বভৌম" "চক্রবর্ত্তী" বাহাদুরেরা নিজ নিজ শক্তিযোগের পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীর নরনারীকে যথেচ্ছ ভাবে চলিতে দেওয়া তাঁহাদের স্বধর্ম্ম ছিল না। কিন্তু ঠিক কতখানি শাসন চালাইলে সাম্রাজ্যের ইজ্জৎ, সাম্রাজ্যের ঐক্য, সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়? এই সম্বন্ধে নানা "সার্ব্বভৌমের" নানা মত থাকিতে পারে। হয়ত ছিল। এই জন্য ভারতে নানা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াও থাকিবে।

যতদিন সাম্রাজ্যের কোমরে জোর ছিল, ততদিন স্বরাজকে তাঁবে রাখিতে তামিল সম্রাটেরা কসুর করেন নাই। এইরূপ বুঝিতেছি। কিন্তু সাম্রাজ্যের সকল যুগই শক্তিযোগের যুগ নয়। চোল বাদশারা সকলেই "সার্ব্বভৌম" নেপোলিয়ান ছিলেন না। সাম্রাজ্যের পায়া যখন দুর্ব্বল পল্লী-সভাগুলা তখন "অধিকারিণ্" মহাশয়ের একতিয়ার কতখানি স্বীকার করিত? পল্লীগুলা তখন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ কর্ম্ম চালাইত কি? সদরের সঙ্গে মফঃস্বলের যোগাযোগ সেই অবস্থায় সুদৃঢ় ছিল কি? বিশ্ব-শক্তির স্রোত হইতে পলী-স্বরাজগুলা তখন খানিকটা দূরে সরিয়া পড়িত না কি? পল্লী-স্বরাজ তখন প্রায় ষোলকলায় পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মূর্ত্তি-গ্রহণ করিত না কি? এই সকল প্রশ্নের জবাব চাই তাম্রশাসনের সাক্ষীদের নিকট হইতে।

কৌটিল্যের "গোপ"

সাম্রাজ্য প্রবল থাকিলে পল্লীর অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা "আন্দাজ" করিবার একটা উপায় উল্লেখ করা যাইতেছে। মৌর্য্য-ভারতের "সার্ব্ব-ভৌম শান্তি" বা সাম্রাজ্যিক ঐক্য সম্বন্ধে নানা প্রমাণ বাহির হইয়াছে। প্রমাণগুলা সবই "লিপি"র প্রমাণ নয়। তবে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"কে যদি সেই সাম্রাজ্যের নিদর্শন বিবেচনা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পল্লী-সম্বন্ধে কি দেখিতে পাই?

"অর্থশাস্ত্রে" পল্লীর "গোপ" নরনারীর গরু বাছুর পর্য্যন্ত মাথা গুণিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু পল্লীসভা নামক কোনো প্রতিষ্ঠানে নরনারীরা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব চালায় কিনা সে কথা উল্লেখ করা তাঁহার খেয়ালে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় নাই। কৌটিল্যে পল্লী-স্বরাজের খবর পাই না। তাই বলিয়া মৌর্য্যসাম্রাজ্যে মফঃস্বলের লোকের স্বাধীনতা বা আত্মভাগ্যনির্ণয়সম্বন্ধে

সন্দেহ করিতেই হইবে, এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু যদি এইরূপ সন্দেহ করা যায়, তাহা হইলে কি জবাব দেওয়া যাইবে?

সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা জানা আছে। ব্রিসো প্রণীত "ফরাসী পাব্‌লিক ল" নামক গ্রন্থে চতুর্দ্দশ লুইয়ের প্রবল প্রতাপ দেখিতে পাই। তাঁহার মন্ত্রী রিশলিয়্যো পল্লীতে পল্লীতে "আঁ্যাতেঁদা" অর্থাৎ "অধিকারিণ্" পাঠাইয়া সাম্রাজ্যকে শৃঙ্খলীকৃত এবং ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবেত্তা তোক্‌হ্বিল বলেন যে, রিশলিয়্যোর সাম্রাজ্যশাসনে ফরাসী-নরনারীর স্বরাজ কুপোকষা হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

কৌটিল্যের ব্যবস্থায় রিশলিয়্যোর কেন্দ্রী-করণ অতএব স্বরাজ-হরণ ঘটে নাই কে বলিতে পারে? মৌর্য্য "গোপ" আর চোল "অধিকারিণ" কবে কতকটা চতুর্দ্দশ লুইয়ের "আঁ্যাতেঁদা" অথবা ব্রিটিশ ভারতের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুচরবর্গের সম-শ্রেণীভুক্ত স্বাধীনতার শত্রু ছিল, তাহা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখা আবশুক।

পরিশিষ্ট নং ৪

"লিপি"-সাহিত্য বনাম "শাস্ত্র"-সাহিত্য

(১)

দক্ষিণ ভারতের তামিল লিপিগুলা এতদিন হুল্‌ট্‌শ-সম্পাদিত গ্রন্থে এবং সরকারী আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের নানা বার্ষিক বিবরণীতে বন্দী হইয়া ছিল। মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার ১৯১১ সালে প্রকাশিত "প্রাচীন ভারত" নামক ইংরেজি গ্রন্থে এই সমুদয়ের কোনো কোনোটা সর্ব্বপ্রথম খালাশ করিয়া দেন। তারপর ১৯১৫ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত "বৃটিশ ভারতে পল্লী-শাসন" নামক গ্রন্থে মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জন মাঠাই প্রাচীন চোলমণ্ডলের তাম্রশাসন হইতে কিছু কিছু সাক্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আজকাল বাংলা দেশে তামিললিপির দিকে অভিযান বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ দুইটা (১৯১৯) এই বিষয়ে অগ্রণী।

এই সকল লেখকের মতামত বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনা করিবার অবসর নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রায় অধিকাংশই "ব্যাখ্যার" তরফ হইতে অপরিষ্কার, আংশিক এবং কিছু কিছু ভ্রমাত্মক। তবে ঐতিহাসিক হিসাবে তথ্যগুলার দাম আছে। কিন্তু নৃতত্ত্ব, শাসনবিজ্ঞান এবং আর্থিক ইতিহাস এই সকল বিদ্যার কাঠামে না ফেলিলে পল্লীবিষয়ক তথ্যরাশি কতকগুলা হাবিজাবি জবরজঙ্‌ মাত্র থাকিয়া যাইবে। এই দিকে গবেষণা বাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক।

১৯১৯ সালে ইংরেজ পণ্ডিত হাভেলের 'ভারতে আর্য্যশাসনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। লেখক প্রত্যেক যুগেই

তথাকথিত "ভিলেজ কমিউনিটি" অর্থাৎ যৌথপল্লীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থকার "ভারতবন্ধু" সাজিয়া কেতাব লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ভারতসন্তানের সপক্ষে যে যে বিষয়ে উকীলী করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে প্রমাণের জোর বেশী নাই। হাভেল প্রধানতঃ "শাস্ত্র" সাহিত্যের নজির দিয়াছেন।

(২)

প্রাচীন ভারতের পল্লী-স্বরাজ বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে একটা গুরু-তর সমস্যা উপস্থিত। "লিপি" সাহিত্যের ব্যবহার সুরু হওয়া অবধি "শাস্ত্র" সাহিত্যের ইজ্জৎ লইয়া খানিকটা টানাটানি পড়িয়াছে।

তামিল তাম্রশাসনে ভারতীয় নরনারীর স্বাধীনতা, আত্মকর্তৃত্ব, ব্যক্তিত্ব জ্ঞান এবং স্বরাজসাধনা যে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে, সেই মূর্ত্তির ছায়া পর্য্যন্ত "শাস্ত্র" সাহিত্যে নাই কেন? "ধর্ম্ম", "স্মৃতি," এবং "নীতি" (ও "অর্থ") শাস্ত্রের এপিঠ ওপিঠ তন্ন-তন্ন করিয়া ঢুঁড়িলেও বোধ হয় "পঞ্চায়ৎ" "পল্লীসভা" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ঢুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে অনেক। "বোধ হয়" বলিতেছি এই জন্য যে, অনুসন্ধানের অসম্পূর্ণতা থাকা খুবই সম্ভব। পল্লীবিষয়ক "বৃদ্ধ"দের সম্বন্ধে যাহা কিছু এই সকল সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহাতে চোলমণ্ডলের দ্রাবিড় ভারতের স্বাধীন ধরণ ধারণ কোনো মতেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

কেন এরূপ ঘটিল? "শাস্ত্র"-সাহিত্যকে কি তাহা হইলে হিন্দু-নর-নারীর বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সাক্ষী বিবেচনা করা উচিত নয়? উচিত হইলে, কতখানি, কোন্ কোন্ বিষয়ে?

"শাস্ত্র"-সাহিত্যের রচয়িতারা কি দ্রাবিড় ভারতের খোঁজ রাখিতেন না? দ্রাবিড় ভারতের নরনারী কি এই সকল গ্রন্থে কোন ছাপ মারিতে পারে নাই? এই সকল বিষয়েও জিজ্ঞাস্য,—কতখানি, কোন্ কোন্ বিষয়ে?

"লিপি"-সাহিত্যে চোলমণ্ডলের দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পল্লী-স্বরাজ বিবৃত আছে। "শাস্ত্র"-সাহিত্য কি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তথ্য লইয়া রচিত? তাহা হইলে চিন্তা সাহিত্য ও দর্শনের তরফ হইতে "আর্য্যাবর্ত্তে আর দাক্ষিণাত্যে" হিন্দু-নরনারীর যোগাযোগ এবং লেনদেন কতটুকু ছিল?

"লিপি"-সাহিত্যের স্বাধীনতা ও স্বরাজপ্রয়াস "শাস্ত্র"-সাহিত্যে না থাকিবার কারণ কি? লেখকেরা পল্লীর খবর রাখিতেন না বলিয়া? লেখকদের চিন্তায় স্বরাজ একটা জ্যান্ত বস্তু ছিল না বলিয়া? লেখকেরা "রাজার লোক," খোসামুদে, "শহুরে" জীব বলিয়া? এক কথায় শাস্ত্রকারগণ "ইম্পিরিয়ালিষ্ট", সাম্রাজ্যবাদী, "সার্ব্বভৌম শান্তির" ধুরন্ধর বলিয়া?

"শাস্ত্র"-সাহিত্যে স্বরাজ উল্লেখযোগ্য ঠাঁই পায় নাই। উল্লেখ নাই বলিয়াই "শাস্ত্র"-লেখকগণকে স্বরাজ সম্বন্ধে একদম অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে-যে যুগের অথবা যে-যে দেশের বিবরণ এই সকল সাহিত্যে পাই, সেই সকল যুগ এবং দেশকে একমাত্র এই কারণেই "স্বরাজহীন" বিবেচনা করাও উচিত হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নগর শাসন।

পল্লী ও নগর।

শাসনের তরফ হইতে পল্লীনামক জনকেন্দ্র আর নগর নামক জনকেন্দ্র প্রায় এক গোত্রেরই অন্তর্গত। দুইয়ের শাসনেই এক প্রকার দক্ষতার দরকার। স্বাধীনতার কথা, স্বরাজের কথা, "অধিকারী" "অনধিকারী" প্রভেদ, সাম্রাজ্যের এক্তিয়ার, এই সকল প্রশ্ন উভয় জনপদ সম্বন্ধেই সমান ভাবে উঠে। নরনারীর রাষ্ট্রীয় জীবনে, জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের আলোচনায় এবং সামাজিক শক্তিযোগের বিচার-ক্ষেত্রে পল্লীর যে ঠাঁই, নগরেরও সে ঠাঁই।

এই দুয়ে প্রভেদ কোথায়? প্রধানতঃ আর্থিক কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে পল্লী ও নগর দুই স্বতন্ত্র জন-সমষ্টি। পল্লী-কেন্দ্রে চাষ আবাদ এবং জানোআর চরানো আসল কথা। নগরের আসল কথা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য।

পল্লীতেও কামার ছুতার কুমোর চামার বসবাস করে। পল্লীতেও হাট বাজার মেলা বসে। আবার নগরবাসীরাও গরু পুষে, ছাগল পুষে। নগরের লোকেরাও বাগানে তরীতরকারী জন্মায়। ফলফুলের গাছ নগরের নরনারীদেরও আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু প্রাধান্য পল্লীতে কৃষি ও পশুপালনের, আর নগরে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের। কি ভারত, কি ইয়োরোপ, সর্ব্বত্রই এই প্রভেদ।

(২)

যে দেড় দুই হাজার বৎসরের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইতেছে, সেই সকল যুগে পল্লীই ভারতীয় নরনারীর একমাত্র জীবনকেন্দ্র ছিলনা। হিন্দুজাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সামাজিক লেনদেন নগরকেন্দ্রেও প্রচুর পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগরজীবনের বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষ সাধন ভারতবাসীর কৃতিত্বের অন্যতম সাক্ষী।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পল্লী বনাম নগর সমস্যা ভারতে ছিল না। ইয়োরোপেও ছিল না। তবে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক লেনদেনের কর্ম্মক্ষেত্রে পল্লীতে নগরে এবং কিষাণে আর শিল্পী-বণিক-"জমিদারে" টক্কর চলিত কিনা তাহা আলোচনার বিষয়। ইয়োরোপে এইরূপ টক্কর চলিত। ফরাসী পণ্ডিত গীজো প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে সদর মফঃস্বলের লড়াই আর শহরের প্রতাপ চিত্রিত আছে। গের্ডেস প্রণীত "জার্ম্মান কিষাণ সমাজের ইতিহাস" গ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে, এই লড়াইয়ে চাষীদের চরম দুর্গতি ঘটিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে কিষাণরা পুরাদস্তুর গোলাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু ভারতে পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীর বিরোধ ঘটিত কি না, ঘটিলে তাহার আকার প্রকার কিরূপ ছিল, সেই সকল বিষয়ে সন তারিখ সমন্বিত প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা আবশ্যক।

তবে জীবনের গড়ন হিসাবে পল্লীকে বিশেষ ভাবে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা ভ্রমাত্মক একদেশদর্শিতার ফল। আর নগরকেন্দ্রকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় জীবনের বিশেষত্ব বিবেচনা করাও সেইরূপই অনৈতিহাসিক কল্পনামূলক "দার্শনিক" আলোচনার সাক্ষী। এইখানে মনে রাখিতে

হইবে যে, লাখলাখ নরনারীওয়ালা বিপুল নগরকেন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোথায়ও ছিল না। এই গুলির অধিকাংশই বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছে। "ষ্টাটিষ্টিক্‌সের" তথ্য ও অঙ্কের সাহায্যে একথা প্রমাণিত করা সহজ। সেকালের ভারতীয় নগরে যত লোক বাস করিত তাহার তুলনায় সমসাময়িক পাশ্চাত্য নগরগুলা অতি-কিছু বিবেচিত হইবে না।

বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় নগর।

ভারতের নগর-সম্পদ দেশবিদেশে সুপরিচিত ছিল। রোমাণ ঐতি-হাসিক প্লিনি প্রণীত "ন্যাচার‍্যাল হিষ্টরি" নামক "বৃহৎ সংহিতা" ধরণের বিশ্বকোষে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় নগরাবলীর চিত্র পাওয়া যায়। সেই যুগেই মিশরের এক গ্রীক সওদাগর আরব সাগরের ব্যবসাবাণিজ্য আলোচনা করিতে গিয়া ভারতীয় বন্দর ও নগর সমূহের আর্থিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক ভৌগলিক টলেমির "ভূগোল" গ্রন্থ ১৪০ খৃষ্টাব্দে এবং কস্‌মাস প্রণীত "খৃষ্টিয়ান টপোগ্রাফি বা প্রাকৃতিক সংস্থান" গ্রন্থ ৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। এই সকল কেতাবেও ভারতবাসীর নগর-জীবন কথা রহিয়াছে।

সিন্ধুর মোহনা ও বদ্বীপ হইতে গঙ্গার মোহনা ও বদ্বীপ পর্য্যন্ত কোনো নগর ও বন্দর বোধ হয় এই সকল রচনায় বাদ পড়ে নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের কিনারা হইতে কথঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত নগরের ছাপও পড়িয়াছে।

এই গেল পশ্চিমাদের বিবরণ। ভারতের চীনা ছাত্রেরা দলে দলে ভারতীয় নগর দেখিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিয়াছিলেন "ভক্তিযোগী" ফাহিয়ান। "কর্ম্মযোগী" যুয়ান-চুয়াঙ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৬২৯—৬৪৫) ভারতে বুদ্ধতীর্থ করিয়াছিলেন। সেই

শতাব্দীরই শেষের দিকে (৬৭১—৬৯৫) "জ্ঞানযোগী" ইনচিঙ ছিলেন ভারতবাসীর অতিথি।

চীনারা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে ওস্তাদ। ইহাঁরা সকলে নিজ নিজ ডায়েরিতে ভারতীয় নগরের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতের বহুপ্রদেশ সম্বন্ধেই অনেক ভিতরকার কথা চীনা সাহিত্যে প্রচুর। চীনা পর্য্যটকেরা ভারতীয় নরনারীদিগকে কেবল পল্লীবাসী সমঝিত না। ভারতীয় নগর চাখিয়া দেখিবার সুযোগ তাহাদের অনেক জুটিয়া ছিল।

নগর সভ্যতায় হিন্দু নরনারী।

"নমোনমঃ" করিয়া কয়েকটা ভারতীয় নগরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। অন্যান্য বিষয়ের মতন এই বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

তক্ষশিলা ছিল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আফগান রাজধানী। এই কেন্দ্রের কেল্লা হইতেই হিন্দু সেনাপতিরা ভারতীয় উত্তর পশ্চিম সীমানায় গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ এক বড় বিদ্যা ছিল।

পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মাদুরার কথা জানিতে পাই প্লিনির কেতাবে। মালাবার উপকূলের বন্দরের মারফৎ মাদুরার ব্যাপারীরা রোমাণ সাম্রাজ্যের নগরে নগরে সওদা পাঠাইত। এই নগরেই সুপ্রসিদ্ধ "তামিল সঙ্গম" সাহিত্যের উপর জজিয়তি করিত।

মাদুরা যেমন দক্ষিণ ভারতে, তেমনি উত্তর ভারতের মালব প্রদেশে উজ্জয়িনী ছিল এক বিপুল বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পথেই আর্য্যাবর্ত্তের সওদা বোম্বাই উপকূলে পৌঁছিত এবং পরে সাগর ডিঙাইয়া মিশর পারস্য, রোম, এবং ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য ঘাটে হাজির হইত। এই

নগরেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫০৫) বরাহমিহির পৃথিবীর মাপজোক চালাইয়াছিলেন।

অজন্তাগুহার চিত্রশিল্প সুবিদিত। এই জনপদেই আজকালকার বিজাপুর জেলার বাতাপি নগর।
চালুক্য (মহারাষ্ট্রীয়) দের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল। পারস্যের সাসানবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় খুস্রু (৫৯১-৬২৮) এই শহরের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন।

গঙ্গার উপরকার কনৌজ আর্য্যাবর্ত্তের সমাজে ও রাষ্ট্রে চিরপ্রসিদ্ধ। এই দুর্গ-রক্ষিত নগরের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান য়ুয়ান-চুয়াঙের বিবরণে জানিতে পারা যায়। দশহাজার বিদ্যার্থীর কথা ইনি উল্লেখ করিয়াছেন। চার মাইল ছিল সহরের বিস্তার। সপ্তম শতাব্দীর ইয়োরোপে এই বিস্তার নিন্দনীয় বিবেচিত হইত না।

সপ্তম শতাব্দীতেই তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল ধনী ব্যবসাদারদের জীবন-কেন্দ্র। বাংলার সঙ্গে এসিয়ার এবং ইয়োরোপের যোগাযোগের অন্যতম "জাহাজ-ঘাটা" হিসাবে এই শহর প্রাচীন জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

পাটলিপুত্রের কথা গৌড় লেখমালায় কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। পাল আমলে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই সহরের গৌরব তাহার শেষ অধ্যায় প্রকটিত করিয়াছিল। ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "বাঙ্গালী আদর্শ" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া পাটলিপুত্রের সামরিক চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

"দুনিয়ার রাজরাজড়ারা" বাঙ্গালী সম্রাটকে অগণিত ঘোড়া দান করিতেন। ঘোড়ার খুরে ধুলা উঠিত এত বেশী যে দুপুর বেলায়ও সূর্য্য দেখা যাইত না। এই সহরে পদানত রাজরাজড়াদের পল্টন আসা যাওয়া করিত ঘন ঘন। ইহাদের চলাফেরার চাপে ধরিত্রী গভীরভাবে নামিয়া পড়িত। এই সব কথা লিপিসাহিত্যে খোদা আছে।

বলা বাহুল্য, লিপি সাহিত্যের কবিরা বোধহয় কালিদাস ঘাঁটিয়া বাদসাহী মেজাজ লাভ করিবার পর "প্রশস্তি" লিখিতে বসিতেন। অথবা কি সেকালে পাটলিপুত্রের আবহাওয়ায়ই আপনা আপনি এইরূপ সামরিক ও সাম্রাজ্যিক নেশা দেখা দিত?

ভারতীয় নগরের গড়ন।

রামায়ণের "বালকাণ্ডে" অযোধ্যার বিবরণ আছে। মহাভারতের দ্বারকা বন্দর দেখিয়াও হিন্দুনগরের গড়ন সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। সুবন্ধুর "বাসবদত্তায়" পাটলিপুত্রের চুণকাম করা দেওয়ালওয়ালা ঘরবাড়ীর কথা জানিতে পারি। ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানকালের এই চিত্র। বাণ-প্রণীত "হর্ষচরিত" গ্রন্থে কনৌজের চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে।

এই সকল কাব্যের ও উপন্যাস বা আখ্যায়িকার বিবরণকে "রিয়ালিষ্টিক" অর্থাৎ বাস্তব বলা যাইতে পারে কি? অথবা আজকালকার সাহিত্য সমালোচনার পরিভাষায় এই সবকে কি "ইম্‌প্রেশ্যনিষ্টিক" বলিতে হইবে? অর্থাৎ সমগ্র নগর লেখকের চিত্তে যে ছাপ বসাইত, সেই ছাপের একটা ছবি এই সাহিত্যে পাই কি? তাহা হইলে কবিদের এই স্মরণশক্তির উনিশবিশ অনুসারে দৃশ্যাবলীর কাটাছাঁটা সব বিবরণে যত পাইবার কথা, সঠিক খুঁটিনাটি তত পাইবার কথা নয়।

আর যদি কাব্য, গল্প, নাটক ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্যে "এক্‌স্‌প্রেশ্যনিষ্টিক্" ঝোঁক বেশী থাকে, তাহা হইলে কি বাল্মিকী, কি বাণ সকলের চেতনায়ই হৃদয়ের অনুভূতি, জীবনের আবেগ, অন্তঃকরণের সাড়া, আদর্শ, ভাবুকতা, ইত্যাদি বস্তুই বেশী পরিমাণে পাই। এই গুলাও বাস্তব কম নয় সত্য, কিন্তু নরনারীর আর্থিক অবস্থা বুঝিবার পক্ষে

অথবা নগর নির্ম্মাণের কৌশল বুঝিবার পক্ষে এই সাহিত্যে সাহায্য পাওয়া যায় না।

"বাস্তু-শাস্ত্র" নামক এক প্রকার সাহিত্য আছে। তাহাতে নগরের গড়নই প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুক্র-নীতি, যুক্তিকল্পতরু, ইত্যাদি নীতি-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাবলীতেও শহরের সড়কগলি ঘরবাড়ী দোকান পাট বাগ বাগিচা নির্ম্মাণ করিবার কায়দা বিবৃত আছে। নগর নির্ম্মাণ বিষয়ক হিন্দুমত হিসাবে এই সাহিত্যের দাম খুব বেশী। কিন্তু ভারতের কোন্ কোন্ যুগে কোন কোন্ নগর এই সকল শাস্ত্রের মাপজোক অনুসারে গড়া হইয়াছিল? তাহা না জানা পর্য্যন্ত নগর বিকাশের ইতিহাসে এই সাহিত্যের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্ততঃ বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার ঠাঁই নাই।

ক্লাইবার—প্রণীত "ডি গ্রুণ্ড্‌বিস্‌বিল্ডুঙ্‌ ডার ডায়চেন ষ্টাট্‌ ইম্ মিট্টেলাল্টার" অর্থাৎ "মধ্যযুগের জার্ম্মাণ নগরের গড়ন ভঙ্গী" (বার্লিন ১৯১২) ইত্যাদি গ্রন্থে জার্ম্মানীর শহরগুলা সে কালে ঠিক যেমন ছিল, সেইরূপ বিবৃত দেখিতে পাই। বাস্তুশিল্পীরা এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম অঞ্চলের নানা নগর যথাযথরূপে চোখের সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছেন। এই সকল ক্ষেত্রে বাস্তব প্রত্নতত্ত্ব কথা কহিতেছে।

তামিল নগরের পথঘাট

ভারতীয় নগর সম্বন্ধে সেরূপ বাস্তু-বিবরণ এখনো সম্ভব নয়। তবে দক্ষিণ ভারতের তামিল সাহিত্যে কোনো কোনো নগরের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করি। "প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নগর-নির্ম্মাণ" নামক ইংরেজী গ্রন্থে (মাদ্রাজ ১৯১৬) শ্রীযুক্ত আয়ার যে বৃত্তান্ত প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে খাঁটি ইতিহাসের খানিকটা যোগ আছে মনে হইতেছে।

মাদুরা নগরের রাজবাড়ী ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল। রাস্তাগুলি সোজা বাঁকা ছোট বড় মাঝারি সব রকমের। প্রত্যেক সড়কে গলিতে "পুরিমম্" থাকিত। জঞ্জাল ফেলিবার জন্য এই ব্যবস্থা। "পুরিমম্" গুলা ইটের তৈয়ারি চূণকাম করা আধার। শহরের চারিদিকে ছিল দেওয়াল। দেওয়াল ঘিরিয়া ছিল পগার বা নর্দ্দমা। এই নর্দ্দমায় আসিয়া পড়িত শহরের সকল নর্দ্দমার জল। শহরের এক নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে বেশ্যারা ঠাঁই পাইত। সাধারণ নরনারীর বাগ বাগিচা স্নানাগার ইত্যাদি হইতে বেশ্যাদের আরাম-বিহারের স্থান গুলা স্বতন্ত্র ছিল।

কাবেরী-প্পুম্পট্টিনম্ নগরে রোমাণ বণিকদের জন্য সমুদ্রের কিনারায় ঘরবাড়ী তৈয়ারি করা হইয়াছিল। জাহাজের সুবিধার জন্য কূলে আলোক-গৃহের ব্যবস্থা ছিল।

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে চেররাজের রাজধানী ও বন্দর অবস্থিত ছিল। নাম তাহার বঞ্জি বা করূর। মাদুরার মতন বঞ্জি সহরের দেওয়াল ঘিরিয়াও পগার ছিল। "তুম্বু" বা নলের সাহায্যে সহরের জল এই পগারে বহিয়া আসিত। রাজবাড়ী, সার্ব্বজনিক ভবন এবং ধনীদের বসতবাড়ীতে "কলের জলের" ব্যবস্থা ছিল। পয়সা খরচ করিতে পারিলেই লোকেরা ঘরে ঘরে কলের জল পাইত। কল টিপিয়া জলের চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর ছিল।

আয়ার যে সকল পুঁথি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রমাণে ভর করিলে দ্রাবিড় দেশের নরগগুলাকে সাধারণতঃ নয় মাইল লম্বা বলিতে হয়। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা আলোচনার বিষয়। স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে নগরশাসকদের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ।

নগরকেন্দ্রের শাসন প্রথা।

কি দেশী কি বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় নাগরিকদের "পাবলিক ল" বা শাসন বিষয়ক আইন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না। ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক নগর হইতেই মধ্যযুগের এবং প্রাচীনকালের নগর শাসকদের দলিল, হিসাবপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে। কয়টগেন প্রণীত "উরকুন্ডেন ৎসুর ষ্টেটিশেন ফার্ফাস্সুংস্ গেশিষ্টে" অর্থাৎ "নগরশাসন বিষয়ক প্রমাণ পঞ্জী" নামক গ্রন্থে (বার্লিন) ১৯০১ পাশ্চাত্য দলিলের বন্তা দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য ভারতীয় নগর সম্বন্ধে এইরূপ শাসন প্রণালী বিষয়ক "চার্টার," ফার্ম্মান বা অন্য কোন সরকারী কাগজপত্র পাওয়া যায়না।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোবর্দ্ধন নগর আন্ধ্রনরপতিদের এক বড় শহর ছিল। গুজরাতের নাসিক জেলায় ইহার অবস্থান। সেনাপতি উষভদাত দুই "শ্রেণীর" হাতে কিছু টাকা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। দান-খৈরাতের বৃত্তান্তে এই তথ্য পুর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, এই দান কাণ্ডে "নিগমসভা"কে সাক্ষী মানা হইয়াছিল।

"নিগম সভা"টা কি? "নিগম"কি নগর বা পুর শব্দের জুড়িদার? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে নগরের লোকেরা "সভা" কায়েম করিয়া কাজ কর্ম্ম চালাইত। পল্লীশাসনে যেমন সভার প্রভাব দেখা গিয়াছে নগরের বেলায়ও সেই রূপই বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেখিতেছি, পল্লীস্বরাজের মতন নগর-সভাও দানখৈরাতের জন্য সুশাসনের দায়িত্ব লইত।

আর একটা নগরের কথা সামান্য মাত্র শুনিতে পাই। দশম শতাব্দীতে গোয়ালিয়র নগরের শাসনকর্ত্তারা দুই টুকরা "খাসমহাল"

জমি দুই দেবতার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিল। তদ্বিরের ভার নগর নিজের হাতে রাখে নাই। দুই "শ্রেণী"র হাতে দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া নগরশাসকেরা নিশ্চিন্ত ছিল। গোবর্দ্ধনে ছিল নগর কোন নাগরিকের দানের সুশাসনের জন্য দায়ী। গোয়ালিয়রে দেখিতেছি "শ্রেণী" নগরের দানের অভিভাবক।

নগরশাসনের বিশেষত্ব।

শাসন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে পল্লীকে নগরের গোত্রেই ফেলিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া পল্লী সম্বন্ধে যে দু'চারটা স্বরাজ বিষয়ক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেই গুলা বিনা বাক্য-ব্যয়ে নগর সম্বন্ধেও কায়েম করা সম্ভব নয়।

লোকসংখ্যা হিসাবে নগরে পল্লীতে প্রভেদ প্রচুর। আবার নরনারীর ভিতর সামাজিক বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা নগরে যত বেশী, পল্লীতে তত নয়। অধিকন্তু নগরের শিল্পবাণিজ্যের প্রধান ধান্ধাই কেনা-বেচা এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে মালবিনিময়। অপরপক্ষে, পল্লীর আর্থিক জীবন অনেকটা প্রধানতঃ আত্মনির্ভর এবং স্বকেন্দ্রী।

কাজেই পল্লীর শাসন কার্য্যে যতটা সহজ সরল প্রণালী চলে, নগরের শাসনে সেরূপ সম্ভব নয়। নগর-শাসনের সমস্যাগুলা বিশেষত্বপূর্ণ। সমস্যাগুলার কিনারায় আসিতে চেষ্টা করিয়া ভারতীয় নরনারীরা "নগর স্বরাজ" গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল কি ?

কারিগর আর বণিকদের "শ্রেণী" ছিল। ভাল কথা। এই সকল শ্রেণীতে কলু, কামার, মুচী, তাঁতী, হাটুয়া, দোকানদার, আড়তদার ইত্যাদি ব্যবসার লোকেরা "নিজ নিজ কোঠের ভিতর" স্বরাজ ভোগ করিত। বেশ কথা। কিন্তু এই সকল গণ্ডা গণ্ডা স্বরাজের বাহিরে যে সব নরনারী বসবাস করিত, তাহাদের সঙ্গে ইহাদের লেনদেন চলিত কোন্ কানুন

অনুসারে? "শ্রেণী" "শ্রেণী"তে পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত কিসের জোরে?

নগর ত কেবল কারিগর আর বণিকদের একচেটিয়া কর্ম্মস্থল নয়। প্রত্যেক নগরে একটা করিয়া সভা ছিল এই রূপ ধরিয়া লইলেও প্রশ্ন উঠিবে—সভায় শ্রেণীগুলার ঠাঁই কিরূপ ছিল, আর শ্রেণীর বহির্ভূত লোকদের, স্বদেশী বিদেশী সকল প্রকার নরনারীর ঠাঁই বা কিরূপ ছিল? "শ্রেণী"দের আর্থিক প্রভাবে এবং সামাজিক ক্ষমতায় নগরের অন্যান্য লোক উৎপীড়িত হইত না কি? "শ্রেণী স্বরাজে"র অত্যাচার এবং যথেচ্ছাচার হইতে "নগর স্বরাজ"কে বাঁচাইবার কোন্ কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল?

যদি বলা যায় যে এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীরা নগরের শান্তি রক্ষা করিত, তাহা হইলে "নগর স্বরাজে"র ইজ্জৎ থাকে কোথায়? আর তাহা হইলে শ্রেণী-স্বরাজের দামই বা কত খানি? শ্রেণীর সঙ্গে নগরের সম্বন্ধ এবং উভয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ এই দুই বিষয়ে তথ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারতের নগর জীবন সম্বন্ধে কোন কথা বলা অসম্ভব। "ড্যয়চে ষ্ট্যেটে উণ্ড্ ব্যির্গার ইম্ মিট্টেলাণ্টার" অর্থাৎ "মধ্যযুগের জার্ম্মাণ নগর ও নাগরিক" নামক গ্রন্থে ইয়োরোপ সম্বন্ধে এই ধরণের প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়। এই আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়া ভারতীয় গবেষকদিগকে নগর-শাসনের আলোচনায় প্রবেশ করিতে হইবে।

পাটলিপুত্রের ত্রিশ মাতব্বর

(১)

হিন্দু নরনারীর নগর-জীবন এবং নগরশাসন সম্বন্ধে কথা উঠিলে পাটলিপুত্রের নাম মনে না আসিয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে

শিশুনাগ বংশের রাজা উদয়ের আমলে বোধহয় এই নগরের গোড়া পত্তন হইয়াছিল। পাল সাম্রাজ্যের আমলেও এই নগরের রাষ্ট্রগৌরব বজায় ছিল।

উত্তর ভারতে যখনই "সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য" স্থাপিত হইয়াছে, তখনই পাটলিপুত্র হইত রাজধানী। হর্ষবর্দ্ধনের আমল ছাড়া বোধ হয় আর কখনো এই নগর তাহার সাম্রাজ্যকেন্দ্র সম্বন্ধীয় গৌরব হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া যুগে যুগে পাটলিপুত্র হিন্দুনর-নারীর রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ দেখিয়াছে। ইয়োরোপের জীবন-ধারায় রোম যে দরের নগর, এসিয়ার সভ্যতা বিকাশেও পাটলিপুত্রের ইজ্জৎ সেইরূপ।

(২)

৩০২ খৃষ্ট পুর্ব্বাব্দে এসিয়া মাইনরের গ্রীক (হেলেনিষ্টিক) রাজ সেলিউকস মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নিকট মেগাস্থেনিসকে প্রতিনিধি বা দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। মেগাস্থেনিস পাটলিপুত্রেই বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা "ইন্দিকা" নামক গ্রন্থের কয়েক টুকরায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কেতাবের ভিতর অনেক বাজে কথা স্থান পাইয়াছে। তবে কাজের কথাও কিছু কিছু আছে। তাহার কতকগুলা বিশ্বাসযোগ্যও বটে। গ্রীক অথবা ইয়োরোপীয়ান বলিয়া মেগাস্থেনিস ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য নয়। প্রত্যেক তথ্যই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাটলিপুত্রের খবর মেগাস্থেনিসের মুখে খানিকটা পাওয়া যায়। ত্রিশ জন নগর শাসকের কথা শুনিতে পাই। তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নগরের

সকল প্রকার শাসন তদবির করিতেন। এই সভা ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন কমিটিতে বা উপ-সভায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক উপ-সভায় পাঁচজন করিয়া বাহাল থাকিত। এই হিসাবে উপসভা গুলা ছিল এক একটা "পঞ্চায়ৎ" বা "পাঁচের রাজ্য" বিশেষ।

ষ্টাইন দেখাইয়াছেন যে, কৌটিল্য-বিবৃত নগর শাসনের সঙ্গে মেগাস্থেনিসের পাটলিপুত্র কথার মিল নাই। প্রভেদ খুব গুরুতর। বস্তুতঃ, "অর্থশাস্ত্রে" নগর শাসন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। অর্থাৎ কৌটিল্যের বিবরণ "আংশিক" ও অসম্পূর্ণ।

(৩)

এক বিভাগের অধীনে কারিগরদের ব্যবসা অর্থাৎ শিল্পকর্ম্মের তদবির করা হইত। বিদেশী পর্য্যটক ও ব্যবসাদারদের সঙ্গে লেনদেন চালানো ছিল দ্বিতীয় বিভাগের কাজ। বিদেশীদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা বোধ হয় এই বিভাগের এক উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ব্যবস্থায় বিদেশীদের সুবিধাও জুটিত অনেক। তাহাদিগকে বসতবাড়ি ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য বেগ পাইতে হইত না। এই বিভাগ তাহার ব্যবস্থা করিত। মারা গেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইত এই বিভাগ হইতে। টাকা-পয়সা আত্মীয়দের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য দায়িত্বও এই বিভাগ লইত।

তৃতীয় বিভাগ লোক গণনার জন্য দায়ী ছিল। খাজনা আদায় করা অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য। তবে নাগরিকদের জন্ম এবং মৃত্যু সংবাদ যথাযথ ভাবে টুকিয়া রাখিবার দিকেও নগরশাসকদের ঝোঁক ছিল খুব বেশী। ব্যবসা বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ছিল চতুর্থ বিভাগের আওতায়। কেনাবেচা, হাটবাজার, দাঁড়িপাল্লা, ওজনের বাটখারা ইত্যাদি সবই দস্তুর মতন আইন-মাফিক শাসিত হইত।

সরকারী সার্ব্বজনিক নিলামে চড়াইয়া নগরের শিল্প-জাত দ্রব্য বিক্রী করা হইত। এই নিলাম ও বিক্রয়ের ভার ছিল অন্যতম বিভাগের। নয়া আর পুরাণা মাল কোন মতেই মিশাইতে দেওয়া হইত না। মিশাইলেই শিল্পীরা দণ্ডার্হ বিবেচিত হইত। দণ্ড ছিল জরিমানা।

নগর-শাসক-সঙ্ঘের ষষ্ঠ বিভাগ বিক্রয়ের উপর কর উস্থল করিত। প্রত্যেক বেচার জন্য দোকানদারেরা দামের দশমাংশ নগরকে দিতে বাধ্য থাকিত। এই দশমাংশ করের দেনাপাওনায় জুয়াচুরি করিলে দোকানদারদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত।

(৪)

ইয়াঙ্কি পণ্ডিত গুড্‌নো প্রণীত "মিউনিসিপ্যাল গবমে'ণ্ট" (নিউ ইয়র্ক ১৯০৯) ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ত্তমান জগতের নগর-শাসন বিবৃত আছে। তাহার সঙ্গে তুলনায় পাটলিপুত্রকে "আধুনিক" বলিয়াই মনে হইবে। মৌর্য্য আমলের হিন্দু নরনারীর মাথায় গোঁজামিল আর বুজরুকির ঘর ছিল না।

দেখা যাইতেছে যে, পাটলিপুত্রের নগর-সভার চার বিভাগ আর্থিক কাণ্ডকারখানায় ব্যস্ত থাকিত। অন্যান্য দুই বিভাগে বিদেশী লেনদেন এবং আদমসুমারি পরিচালিত হইত। নগরশাসনে শিল্প-বাণিজ্যের প্রভাব কত বেশী, তাহা এই বৃত্তান্ত হইতে সহজেই মালুম হয়।

তথাকথিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবন মৌর্য্য সমাজে কিরূপ ছিল, তাহার বাস্তব প্রমাণ অশোকের বক্তৃতায়ও পরিষ্কার রূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে যুগের নরনারী "ভাতকাপড়ের ধাক্কা"কে জীবনে উঁচু ঠাঁই দিত। রাষ্ট্রকেন্দ্রের শাসন প্রথা হইতে তাহা হাতে হাতে ধরা পড়িতেছে। হিন্দু জাতির চরিত্র ও দর্শন বুঝিবার সময় পাটলিপুত্রের এই আবহাওয়াটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

অথবা নগর নির্ম্মাণের কৌশল বুঝিবার পক্ষে এই সাহিত্যে সাহায্য পাওয়া যায় না।

"বাস্তু-শাস্ত্র" নামক এক প্রকার সাহিত্য আছে।
গড়নই প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুক্র-নীতি,
শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাবলীতেও শহরের
বাগ-বাগিচা নির্ম্মাণ করিবার

পাটলিপুত্রে "স্বরাজ" ছিল কি? এই নগরের নরনারীরা আত্মকর্ত্তৃত্ব ভোগ করিত কি? কারিগরদের এবং বণিকদের "শ্রেণী"গুলা হয়ত কিছু কিছু স্বরাজ ভোগ করিত। কিন্তু এই "ত্রিংশ-সঙ্ঘে" লোক বাছাই হইত কোথা হইতে? "শ্রেণী"রা কোনো কোনো মাতব্বর পাঠাইত কি? আজকালকার কলিকাতা কর্পোরেশ্যনে "মাড়ওয়ারি ব্যবসায় সঙ্ঘ" প্রতিনিধি পাঠায়। সেইরূপ কোনো প্রতিনিধি ত্রিশের বৈঠকে বসিতে পাইত কি?

চোল পল্লীর বিভিন্ন পাড়া হইতে লোক বাছাই করিয়া সভায় "মহাজন" পাঠানো হইত। পাটলিপুত্রের পাড়ায় পাড়ায় এইরূপ লোক বাছাইয়ের ব্যবস্থা ছিল কি? নগরের নরনারীরা এই ত্রিশের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিতে সুযোগ পাইত কোথায় এবং কিরূপে? শাসন-যন্ত্রের ভিতর সহজেই বিনা বিদ্রোহে এবং বিনা রক্তপাতে, নরনারীর সঙ্গে ত্রিংশ-সঙ্ঘের সংযোগ সাধনার কি কি উপায় ছিল?

প্রধান কথা। তাহার ফলে "মফঃস্বলের" স্বাধীন এক্তিয়ার সদরের তাঁবে অনেক পরিমাণে চাপা পড়িয়াছে। স্বরাজ-হরণ "জাতীয়তার" অন্যতম লক্ষণ।

তবে এই যুগে মফঃস্বলের,—অর্থাৎ পল্লীর এবং ছোট খাট নগরের, এক কথায় জেলার ও প্রদেশের—লোকেরা "প্রতিনিধি" পাঠাইয়া সমগ্র দেশ বা গোটা রাষ্ট্রকে শাসন করিবার এক্তিয়ার পায়। কাজেই বর্ত্তমান জগতের সদর বা রাজধানী মফঃস্বলের উপর যে সকল এক্তিয়ার খাটায়, সেই সকল এক্তিয়ার প্রকারান্তরে—প্রতিনিধি-সূত্রে—মফঃস্বল-বাসীদেরই এক্তিয়ার। কিন্তু মধ্যযুগে মফঃস্বল কোনো মতেই সদরের শাসনে অধিকার পাইত না।

পাটলিপুত্রের ত্রিংশ-সভায় কতখানি স্বরাজ ছিল, এই কথা আলোচনা করিবার সময় বর্ত্তমান যুগের নগর-স্বরাজের অধিকার অনধিকার গুলাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সমগ্র সাম্রাজ্যশাসনের কাজে পল্লী নগরের লোকেদের বাছাই-করা প্রচলিত ছিল কিনা, তাঁহার উপর এই সকল সমস্যার মীমাংসা নির্ভর করিতেছে।

রোম দুগুণে পাটলি-পুত্র

(১)

এই ত্রিশ মাতব্বর প্রজার লোক কি রাজার লোক এই বিষয়ে প্রশ্নটা খোলা থাকুক। কিন্তু তাঁহাদের শাসন-দক্ষতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিবার কথা নয়। পাটলিপুত্র-সভার অধীনে জিম্মাদারি ছিল বিপুল। নগরের চৌহদ্দিটা দেখিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্রের সমান বিশাল নগর দুনিয়ার আর কোথাও ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি আথেন্স তাহার চরম বিস্তার লাভ করে। সেই আথেন্স ছিল পাটলিপুত্রের চার ভাগের একভাগ মাত্র। সম্রাট অগুস্তসের আমলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রোম সর্ব্বপ্রথমে সাম্রাজ্য-নগর পদ লাভ করে। এই অবস্থায় রোম ছিল আথেন্সেরই মতন, মৌর্য্য পাটলিপুত্রের চারআনা।

রামজে প্রণীত "রোমের প্রত্নতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৮৯৮) রোম নগরের চতুঃসীমা যুগ হিসাবে বিবৃত আছে। বাদশা অরেলিয়ানের সময়ে (খৃঃ অঃ ২৭০-২৭৫) রোমের চরম বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল দেখিতে পাই। প্রথমকার রোম দেওয়ালের পরিধিতে ছিল সাড়ে দশ মাইল। দেওয়ালটা ১৬ ফটকে ফুঁড়িয়া বাহির হওয়া যাইত। ৩৮৩ টা শিখর বা চূড়া ছিল দেওয়ালের পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র।

এইখানে মৌর্য্য-পাটলিপুত্রের মাপজোক ফেলা যাউক। মেগাস্থেনিসের কথায় বুঝিতে পারি যে, সহরের চারিদিকে পরিখা বা খাল কাটা হইয়াছিল। বিস্তারে সেটা ২০০ গজ আর গভীরতায় ১০ গজ। এ এক বিশাল সাগর সন্দেহ নাই।

দেওয়ালটা ছিল কাঠের তৈয়ারী। ইহার ভিতরকার ছেঁদার ভিতর দিয়া ধনুক চালানো যাইত। ৫৭০টা পর্য্য-বেক্ষণ কেন্দ্রের চূড়া আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিত। সহরে যাওয়া আসার জন্য কটক ছিল গুণতিতে ৬৪।

সহর ছিল লম্বায় ৯ মাইল উভয় দিকেই। চওড়ায় উহার বিস্তার ছিল উভয় দিকেই ১½ মাইল করিয়া। অর্থাৎ পাটলিপুত্রের দেওয়াল ঘিরিয়া হাঁটিতে হইলে ২১৷৷ মাইল হাঁটা দরকার হইত। সহজে বুঝা যাইতেছে যে, বাদশা অরেলিয়ানের রোম যত বড় সহর, চন্দ্রগুপ্ত অশোকের পাটলিপুত্র তাহার দ্বিগুণ। ভারতীয় রোমের পেটের ভিতর দুই দুইটা ইয়োরোপের রোমকে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হইত।

এই বিশাল জনকেন্দ্রের শাসনভার ছিল যে ত্রিশ মাতব্বরের ঘাড়ে, তাহাদের শক্তিযোগ, সাংসারিক জ্ঞান আর শাসন-দক্ষতা কি দরের চিজ, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। এই ধরণের কর্ম্মবীর ওস্তাদ লোককেই বলে "ব্যূঢ়োরস্ক" "বৃষস্কন্ধ," "শালপ্রাংশু" আর "মহাভূজ"। যে ভারতে পাটলিপুত্রের মতন ডবল রোমসহর নরনারীদের শাসনেতিহাসের অন্তর্গত, সেই ভারতের লোকগুলা নাকি পল্লীজীবী, পাড়াগাঁয়ে আর শহর-বিমুখ নরনারী!

মৌর্য্য নগরের আইন কানুন

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" তৃতীয় চতুর্থ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের তথ্য দেয় কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু একদম দেয় না এ কথাও বলা চলে না। বরং মেগাস্থেনিসের বৃত্তান্তকে কৌটিল্যের তথ্যে খানিকটা পূর্ণ করিয়া তোলাই যাইতে পারে।

মৌর্য্য নগরাবলীর আইন কানুন কিছু কিছু এই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া ধরিয়া লইলে ত্রিশ মাতব্বরের কর্ম্মগণ্ডীর খানিকটা নতুন পরিচয়

পাওয়া যায়। দেখিতে পাই যে,—"নগরবিধিতে" স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে নজর খুব বেশী। সড়কে, স্নানের ঘাটে, মন্দিরাদি বাস্তুর নিকটে মলমূত্র ত্যাগের দোষে নাগরিকের দণ্ড হইত একপণ বা বারগণ্ডা বৃটিশ ভারতীয় পয়সা। রাস্তায় ধূলা ময়লা ফেলিলে গৃহস্থদের এই পরিমাণ জরিমানা দিতে হইত। মড়া জানোয়ার বড় সড়ক দিয়া লইয়া গেলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল আজকালকার সাড়ে চার মুদ্রা। নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ ছাড়া অন্য পথে মৃতদেহ লইয়া গেলে ৩০০০ পণ (২২৫০৲) জরিমানা হইত। তাহা ছাড়া গৃহস্থেরা ঘর বাড়ির নর্দ্দমা এবং গলিঘোঁচ পরিষ্কার না রাখিলে দণ্ডিত হইতই।

বাজার হাটের নিয়মগুলা উল্লেখযোগ্য। ত্রিংশ-সঙ্ঘের অন্যতম পঞ্চায়ৎ নগরবাসীদিগকে কসাইদের জুয়াচুরি হইতে রক্ষা করিত। মাংস বেচিবার সময় কসাইরা হাড়ের পরিমাণ মাংস দিতে বাধ্য থাকিত। ওজনে কম দিলে কসাইদের জরিমানা হইত উঁচু হারে। যে পরিমাণ মাংস বেচা হইয়াছে জরিমানা হইত তাহার আটগুণ।

পাটলিপুত্রের গৃহস্থরা ঘরের ভিতর রান্নাবাড়ি করিতে পাইত না। আগুন লাগার ভয় ছিল খুব বেশী। প্রত্যেক ঘরের সামনে পাঁচটা ঘড়ায় জল ভরিয়া রাখিবার আইন কায়েম হইয়াছিল। আশেপাশে খড়কুটা কাঠ ইত্যাদি রাখিতে দেওয়া হইত না।

ঘরে অতিথি আসিবা মাত্র গৃহস্থ পুলিশ আফিসে খবর দিতে বাধ্য ছিল। আজকালকার জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশেও এই দস্তুর। এই বিষয়ে ত্রুটি ঘটিলে গৃহস্থ'র জরিমানা হইত ২।০।

ত্রিংশ-সঙ্ঘের আফিসে প্রত্যেক গৃহস্থের জীবনযাত্রা বিষয়ক সকল খবর টুকিয়া রাখা হইত। পুরুষনারীর সংখ্যা, গরুভেড়ার সংখ্যা, আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কিছুই বাদ পড়িত না। কোন্ লোকটা বেশী খরচ

করিতেছে তাহাও জানিয়া রাখা হইত। সাধু সন্ন্যাসীদের গতিবিধি যারপরনাই কড়া নজরে দেখা হইত।

এই ধরণের গণ্ডা গণ্ডা তথ্য "অর্থ শাস্ত্রে" পাওয়া যায়। সকল কথার জন্য এই গ্রন্থে অবসর নাই। অধিকন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রত্যেক বিধান বাস্তবিকই "আইন" কিনা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, মৌর্য্য পাটলিপুত্রের নগর-কথাই যে কৌটিল্য বিবৃত করিয়াছেন সেই বিষয়ে তর্ক এখনো থামে নাই।

তবে ষ্টাইনের প্রদর্শিত প্রভেদগুলা সত্ত্বেও "ইন্দিকা" এবং "অর্থ-শাস্ত্র"কে একই যুগ ও সমাজের বৃত্তান্তরূপে গ্রহণ করা সম্ভব। কেননা কোনোটার ভিতর এমন কোনো তথ্য নাই যাহার জোরে অপরটার তথ্যগুলাকে মিথ্যা বা অসম্ভব সপ্রমাণ করা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"দেশ"-সভা

হিন্দু ও ইয়োরোপীয়ান "দেশ"

মৌর্য্য আমল হইতে চোল আমল পর্য্যন্ত হাজার দেড়েক বৎসরের ভিতর ভারতে যতগুলা রাষ্ট্র উঠিয়াছিল নামিয়াছিল, তাহার কোনটাই পল্লী-রাষ্ট্র বা নগর-রাষ্ট্র মাত্র নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একাধিক পল্লী এবং একাধিক নগর হিন্দু নরনারীর জীবন-কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। এইরূপ বহুসংখ্যক পল্লী, নগর দুর্গ, বন, ইত্যাদির সমষ্টিকে সহজে "দেশ" বলিতেছি।

সমসাময়িক ইয়োরোপেও এইরূপ "দেশ"ই রাষ্ট্র বিবেচিত হইত। পরবর্ত্তী কালে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ইত্যাদি জনপদে নানা নগর প্রচুর স্বরাজ ভোগ করিয়াছে। উত্তর জার্ম্মাণির "হান্সা" নগরাবলী প্রায় পুরাপুরি স্বাধীন রাষ্ট্রই ছিল। এইটুকু স্বীকার করিয়া লইলে কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, কি তাহার পরে, ইয়োরোপেও যুগে যুগে রাষ্ট্রের উত্থান পতনে "দেশ"কেই কেন্দ্ররূপে দেখিতে পাই।

ভারতীয় রাষ্ট্রগুলার সীমানা কিরূপ ছিল? মৌর্য্য সাম্রাজ্য আজকালকার বৃটিশ ভারতের চেয়ে বড় ছিল বিস্তারে। চোল সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি দক্ষিণ ভারতের তিন পোআ অধিকার করিত। গুপ্ত সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের আধকাংশে হাত পা ছড়াইয়াছিল। এইসকল ঐতিহাসিক কথা আলোচনা করিবার সময় সম্প্রতি নাই।

তবে ভারতীয় "দেশ"গুলার চতুঃসীমার কথা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনে রাখা আবশ্যক। ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রীম্যান-প্রণীত "হিষ্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অব্ ইয়োরোপ" অর্থাৎ "ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল"

গ্রন্থের (লণ্ডন ১৯০৩) মানচিত্র এবং চৌহদ্দির বিবরণ গুলা এই সঙ্গে চোখের সম্মুখে রাখা দরকার। বুঝা যায় যে, "দেশ" গঠনে ইয়োরোপীয় নরনারী কোনো দিনই হিন্দু নরনারীকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই।

তুলনা মূলক ইতিহাস।

ইয়োরোপে "মাৎস্য ন্যায়" নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের আট-পৌরে কথা। কোনো রাষ্ট্র বেশী দিন জীবিত ছিল না। রাষ্ট্রগুলা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরিত। বৃটিশ ভারতের এক একটা "সব-ডিহ্বিজন", জেলা, বা "ডিহ্বিজন" যতটুকু জনপদ, ততটুকু জন-পদের সীমানা ছাড়াইয়া ইয়োরোপীয়ান নরনারী সাধারণতঃ কোনো রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আর যখনই বা একটা প্রবল-প্রতাপ রাজ্য বা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তখনও গুপ্ত, চোল ইত্যাদি ভারতীয় সাম্রাজ্যের মাপকাঠি ছাড়াইয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

হিন্দু সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল, রাজেন্দ্র চোল ইত্যাদি শক্তিযোগী দিগ্‌-বিজয়ী কর্ম্মবীরের সমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নরপতি ইয়োরোপের ইতিহাসে বেশী নয়। আর, বিস্তার হিসাবে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সমান সাম্রাজ্য ইয়োরোপে একবার মাত্র গঠিত হইয়াছিল। সে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর রোমাণ সাম্রাজ্য।

আজ কালকার ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইতালি, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের মানচিত্র চোখের সম্মুখে রাখিলে ইয়োরোপীয় নরনারীর রাষ্ট্রীয় জীবন-কথা বুঝা যাইবে না। এই সব চৌহদ্দি পঞ্চাশ পঁচাত্তর, দেড়শ, দুইশ বৎসরের কথা। ইয়োরোপ যুগের পর যুগ ধরিয়া অসংখ্য টুকরায় খণ্ডীকৃত ছিল। ছোট ছোট পরস্পর-বিরোধী দেশে বসবাস করাই পশ্চিমা

জাতিপুঞ্জের স্বধর্ম্ম। "ন্যাশন্যালিটি" ছিল ডুমুর ফুলের মতনই অজ্ঞাত বস্তু। জোর যার মুল্লুক তার, এই নীতির কায়েম করিয়া যে ব্যক্তি যখন যতখানি জনপদ দখল করিতে পারিয়াছে সে তখন ততখানি "দেশ" বা তথাকথিত "জাতি" গড়িয়া তুলিয়াছে।

ভাষার সীমানা হিসাবে অথবা ধর্ম্মের সীমানা হিসাবে "দেশের", "রাষ্ট্রের" অথবা "জাতির" সীমানা কায়েম করা ইয়োরোপে কোনো দিনই সম্ভবপর পর হয় নাই। এই দিকে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই "কালকার কথা" মাত্র।

হিন্দু নরনারীর "দেশ" বলিলেও ঠিক এই রূপই বুঝিতে হইবে। কয়েকটা "সার্ব্ব-ভৌম" সাম্রাজ্য ভারতের রঙ্গমঞ্চে দেখা গিয়াছে সত্য। রাজ"চক্রবর্ত্তী"দের আমলে সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে শান্তি, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে একথাও সত্য। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রীয় জীবনের মোটা কথা ছোট ছোট রাজ্য এবং এই সমুদয়ের পরস্পর টক্কর অর্থাৎ "মাৎস্য ন্যায়।"

প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে তফাৎ করিতে বসিলে ঐতিহাসিক ভূগোলে বিদ্যার অজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। দফায় দফায় জরীপ করিয়া তুলনা করিতে বসা কর্ত্তব্য। এই দিকে দেশী বিদেশী কোনো পণ্ডিত যুক্তি খেলাইয়া মাথা ঘামান নাই। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বিদেশী পণ্ডিতেরা এই সকল বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই ভ্রমাত্মক, কুসংস্কারপূর্ণ এবং এশিয়ার উপর বিদ্বেষে ভরপূর। খাঁটি বিজ্ঞানের মুল্লুকে এই সমুদয়ের কিম্মৎ এক দামড়িও নয়। অথচ প্রাচ্যের লোকেরা এই সকল পশ্চিমা "দার্শনিকে"'র বুলি বেদবাক্য রূপেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

তামিল দেশে "মহাসভা।"

"দেশ" শাসনে হিন্দু নরনারী কতখানি স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিয়াছে এইবার তাহার আলোচনা করিব। মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কনকসভাই পিল্লেই প্রণীত "তামিল্‌স্‌ এইটিন হাণ্ড্রেড্‌ ইয়ার্স এগো" অর্থাৎ "আঠারশ বৎসর পূর্ব্বেকার তামিল জাতি" নামক ইংরেজি গ্রন্থে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর তামিল সমাজ বিবৃত আছে। এই বিবরণে চের, চোল এবং পাণ্ড্য এই তিন রাষ্ট্রের শাসন প্রণালী কিছু কিছু জানিতে পারি। অবশ্য পরবর্ত্তী কালের চোল সাম্রাজ্যের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এই চোল রাষ্ট্রের বিবরণে ঠাঁই পাইবে না।

চের, চোল এবং পাণ্ড্য এই তিন দেশ ছিল সেকালে দক্ষিণতম ভারতের তিন ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের জনপদ। প্রত্যেক দেশেই পাঁচ পাঁচটা করিয়া "মহাসভার" কথা জানিতে পারি।

এক মহাসভায় জনগণের একতিয়ার ও অধিকার সুরক্ষিত হইত। এই সঙ্ঘকে বলিত "জনগণের প্রতিনিধি" সভা। ধর্ম্মকর্ম্ম তদবির করিবার জন্য পুরোহিতদের এক মহাসভা ছিল। চিকিৎসকেরা অন্য এক মহাসভায় সঙ্ঘবদ্ধরূপে রাজা ও জনগণের স্বাস্থ্য-সেবা করিত। দিন ক্ষণ পাঁজীপুঁথি তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি হিসাব করা ছিল জ্যোতিষী মহাসভার কাজ। সেকালে ইয়োরোপের রোমেও এই ধরণের দিনক্ষণ গুণিবার জন্য "কলেজ" বা সঙ্ঘ ছিল। পঞ্চম মহাসভায় ঠাঁই ছিল অমাত্য বা মন্ত্রীদের। ইঁহারা বিচারের কাজ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য মোতায়েন থাকিতেন। সরকারী আয়ব্যয়ের খবরাখবর রাখাও এই মহাসভার অন্যতম ধান্ধা ছিল।

প্রত্যেক দেশেই রাজধানীতে পাঁচ পাঁচটা ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক এক ভবনে এক এক মহাসভার কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। মহাসভাগুলা পরস্পর স্বাধীন ভাবে কাজ চালাইবার সুযোগ পাইত।

ষ্টাইন বলিয়াছেন,—"কোল্লে গিয়ালিটেট্" অর্থাৎ সভায় বসিয়া সমবেত দায়িত্বের সহিত সার্ব্বজনিক কাজ চালানো ভারতবাসীর শাসন অভিজ্ঞতায় দেখা যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীর দক্ষিণ ভারত তাঁহার মতের বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অন্যতম সাক্ষী।

ভারতে "প্রতিনিধি তন্ত্র"

এই মহাসভা গুলাকে পল্লী-সভা বা পল্লী-পঞ্চায়ৎ হইতে স্বতন্ত্র বুঝিতে হইবে। সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্র বলিয়া এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানকে "দেশ-সভা" বলা চলে।

পাঁচ মহাসভার একটার নাম "প্রতিনিধি"-সভা। "জনগণের প্রতিনিধি" বলিলে কি বুঝা যাইবে? চের, চোল আর পাণ্ড্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী এবং নগর হইতে লোক বাছাই হইয়া আসিত? না একমাত্র রাজধানীর নরনারীই এই প্রতিনিধি-সভায় লোক পাঠাইত? তাহা হইলে এই সভাকে নগর-সভা বলিতে হইবে।

কিন্তু বোধ হয় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নগর-সভা মাত্র বুঝা উচিত নয়। গোটা দেশের সভা বুঝাইবার জন্যই "মহাসভা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, পল্লীসভা এবং নগর-সভার সঙ্গে এই মহাসভার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? "প্রতিনিধিরা" কাহাদের প্রতিনিধি? পল্লী-সভার এবং নগর-সভার? না পল্লীবাসীদের এবং নগরবাসীদের?

এই প্রশ্নটা মারাত্মক কিছু নয়! তবে পরিষ্কার জানিতে পারিলে হিন্দু "পাবলিক ল" বা শাসন-প্রণালী বিষয়ক আইনের ঝোঁক ও গতি খানিকটা গভীরতর রূপে জানিতে পারিতাম। যাহা হউক, দ্রাবিড়-ভারতের নরনারী "প্রতিনিধি-তন্ত্র" কায়েম করিয়াছিল। হিন্দু রাষ্ট্রের বিকাশ ধারায় এ এক নিরেট তথ্য।

আর এক প্রশ্ন। এইসকল দেশে আইন-কানুন তৈয়ারি করিত কে বা কোন মহাসভা? বোধ হয় "প্রতিনিধি-সভার" হাতে এই দায়িত্ব ছিল এইরূপ ধরিয়া লইতে পারি। "মন্ত্রী-মহাসভা"র সঙ্গে "প্রতিনিধি-মহাসভা"র লেনদেন কিরূপ চলিত? ঠোকাঠুকি ঘটিবার কথা। রাজার সঙ্গেই বা এই সকল "মহাসভা"র যোগাযোগ কিরূপ ছিল? সে সকল কথা পরিষ্কার জানা যায় না।

এই সকল মহাসভার আওতায় পল্লীকেন্দ্রের এবং নগর-কেন্দ্রের "লোক্যাল" বা স্থানীয় সভা বা পঞ্চায়ৎ গুলার অবস্থা কিরূপ ছিল? তাহাও জানিবার উপায় নাই।

তবে পরবর্ত্তী কালে,—নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভিতর চোল-মণ্ডলের পল্লী-সভায় জনগণের "প্রতিনিধি"রা "মহাজন" রূপে "নির্ব্বাচিত" হইত, সে কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। অতএব "প্রতিনিধি-তন্ত্র"কে দ্রাবিড় অঞ্চলের "দেশ" এবং "পল্লী" উভয় কেন্দ্রেরই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রূপে বিবৃত করা সম্ভব।

মন্ত্রি-পরিষৎ

(১)

হিন্দু রাষ্ট্রের "দেশ-সভা," "মহাসভা," "সুপ্রিম কাউন্সিল" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আর কোনো অকাট্য প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। "সভায়" বসিয়া নানালোকের মতামত আলোচনা করিয়া "সমষ্টি"র কার্য্য সিদ্ধি করা প্রাচীন ভারতে সুপরিচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্মসঙ্ঘ, শ্রেণী, পল্লী, নগর ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকেন্দ্রের শাসনে এইরূপ সভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কম বেশী সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু গোটা দেশের কাজ সামলাইবার জন্য সদরে কোনো প্রকার সভা কায়েম হইত কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না। তামিল দেশের "মহাসভা" গুলাই এই ধরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

তবে এক প্রকার "দেশ"-"সভার" কথা মহাভারতে, রামায়ণে, অগ্নি-পুরাণে এবং "শাস্ত্র"-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই। এই "সভা" গুলা সমগ্র দেশের জন্যই গঠিত এইরূপও বুঝিতে পারি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার "আস্পেক্ট্‌স্ অব এন্‌শ্যেন্ট ইণ্ডিয়ান পলিটি" অর্থাৎ "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের নানা কথা" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯২১) এই সকল কাব্য, নীতি এবং পুরাণ সাহিত্যের সাক্ষ্যগুলা একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফয় প্রণীত "ক্যেনিগ্‌লিখে গেহ্বাল্ট" বা "হিন্দু রাজশক্তি" গ্রন্থে (লাইপৎসিগ, (১৮৯৫) ও কিছু কিছু তথ্য আছে।

কিন্তু এই সকল সভা বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তর্গত কোন্ কোন্ বংশের রাজ-সভা তাহা ঠাওরাইয়া উঠা যায় না। এই কারণে "সাহিত্য"-ঘটিত প্রমাণ গুলা গ্রহণ করা কঠিন। বস্তুতঃ এইসব প্রায় সর্ব্বত্রই বাদ দিয়া চলা যাইতেছে।

(২)

এই সকল সভাকে "মন্ত্রি-সভা" বা "অমাত্য-সভা" বলা হইয়া থাকে। কৌটিল্য এই ধরণের দুই সভার উল্লেখ করিয়াছেন। একটার নাম মামুলি "সভা", অপরটা "মন্ত্রি-পরিষৎ" নামে পরিচিত।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" লইয়া গোল আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে "বেনিফিট অব ডাউট" অর্থাৎ "সন্দেহের অনুকূল তরফটা" কৌটিল্যের স্বপক্ষে রাখিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায় প্রণীত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে কৌটিল্য বিবৃত দেশ-সভা দুইটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

"সভার" কাজ ছিল চার বা পাঁচ প্রকার। প্রথম ধান্ধা কাজকর্ম্ম সুরু করিবার উপায় উদ্ভাবন করা। লোকজন আর মালপত্রের ব্যবস্থা করা দ্বিতীয় ধান্ধা। তৃতীয় বান্ধা "দেশ কালপাত্রের" ব্যবস্থা করা। আপদ বিপদ ঘটিলে তাহার প্রতীকার করা অন্যতম কাজ। আর সকল প্রকার ধান্ধার "শেষ রক্ষা" করাও ছিল আর এক কাজ।

"মন্ত্রি-পরিষৎ" নামক প্রতিষ্ঠানের কার্য্য তালিকায় চার প্রকার ধান্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ধান্ধা নয়া কাজ "সুরু" করা। দ্বিতীয় ধান্ধা পুরাণা বা সাবেক কাজ "খতম" করা। খতমকরা কাজগুলার ঘষিয়া মাজিয়া উন্নতি বিধান বা সংশোধন করা ইত্যাদিও এক ধান্ধা মধ্যে পরিগণিত। চতুর্থ ধান্ধার নাম "হুকুম তামিল করা।"

"মন্ত্রিপরিষদের" সভ্যেরা সাধারণতঃ "সভার" কোনো অধিবেশনে বসিতে পাইত না। বিশেষ জরুরি পড়িলে তাহাদিগকে ডাকিয়া "সভা"য় ঠাঁই দেওয়া হইত।

(৩)

কৌটিল্যের বিবরণ এমন "সাধারণ" ভাবে প্রদত্ত যে সহজেই প্রশ্ন উঠে—এই প্রতিষ্ঠান দুইটা কি কোনো নির্দ্দিষ্ট রাজার আমলে কায়েম ছিল? না, রাজনীতি আলোচনা করিতে গিয়া লেখক বা আচার্য্য মহাশয় দুই প্রকার মন্ত্রিসভার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র? এইখানে কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মত বা আদর্শ পাওয়া যাইতেছে? না অতীত বা বর্ত্তমানের তথ্যও এই বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে?

কোনো দার্শনিক পণ্ডিত সার্ব্বজনিক রাষ্ট্রীয় ধান্ধার বিশ্লেষণ করিতে বসিলে যে ধরণের বিবরণ বাহির হইতে পারে, "অর্থশাস্ত্রে"র এই বিবরণ প্রায় সেইরূপ। ঠিক যেন চুল-চেরা তর্ক-প্রণালীর প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে

সভা দুইটার কার্য্য-তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দেশ-সভা হিসাবে এই দুই সভাকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কামন্দকীনীতি, শুক্রনীতি অথবা রামায়ণ এবং মহাভারতের সভা-মাহাত্ম্য যে চিজ, "অর্থশাস্ত্রে"র "সভা-পর্ব্ব"ও তাহারই লাগালাগি মাল। এই গুলাকে মোটের উপরে রাষ্ট্র-বিষয়ক "মত" রূপে চালানো যাইতে পারে। "প্রতিষ্ঠানে"র ইতিহাসে ইহাদের ঠাঁই এখনো নাই। এই সকল প্রভেদ স্বীকার না করার ফলে শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসন" (লণ্ডন ১৯১৭) বিশেষ দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুমন্ত্রীর এক্তিয়ার

যখন প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে এই সকল সভা বা মন্ত্রিসভা বা মন্ত্রিপরিষদের ইজ্জৎ দেওয়া সম্ভব নয়, তখন এই সকলের বিধানে জনগণের আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ কতখানি ছিল তাহা আলোচনা করিতে বসা অনাবশ্যক। তবে হিন্দু রাষ্ট্রাবলীর কোনো কোনো মন্ত্রীর নাম এবং প্রভাব সম্বন্ধে খাঁটি ঐতিহাসিক অথবা "নিম্" ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। "শাস্ত্র" সাহিত্যে অমাত্যবর্গ সম্বন্ধে যে সব উপদেশামৃত আছে, তাহা কিন্তু বর্ত্তমানে ধর্ত্তব্য নয়।

(১)

কাঠিয়াবাড় প্রদেশের গির্ণার জনপদের "সুদর্শন সাগর" নামে হ্রদ বা সরোবর প্রাচীন লেখমালায় অর্থাৎ "লিপি"-সাহিত্যে বিবৃত দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একটা ঘটনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। রুদ্রদামন নামক কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এক ক্ষত্রপ এই সরোবর

মেরামত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের তরফ হইতে আপত্তি আসে। সরকারী খরচে মেরামত করানো সম্ভবপর হয় নাই। রুদ্রপ মহাশয় নিজের গাঁট হইতে টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু রাষ্ট্রে মন্ত্রীর এক্‌তিয়ার এই ঘটনায় কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে।

মন্ত্রীর প্রভাব এইখানে দেখিতেছি লিপিতে খোদা। এই বিষয়ে একটা "কাহিনী" শুনিতে পাওয়া যায় আর এক যুগ সম্বন্ধে। কাহিনী-টার প্রচারক হইতেছেন সপ্তম শতাব্দীর চীন পর্য্যটক যুয়ান-চুআঙ্‌। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য্য সম্রাট অশোক নাকি খুব "খরচে" লোক ছিলেন। রাধাগুপ্ত নামক অমাত্যের "শাসনে" অশোকের হাত অনেকটা সংযত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

এই ধরণেরই আর এক "কিস্‌সা" বা জনশ্রুতি যুয়ান-চুআঙ্‌ অবগত ছিলেন। তাঁহার "সি-যু-কি" গ্রন্থে জানা যায় যে, শ্রাবস্তির এক বিক্রমাদিত্য ছিলেন দানখৈরাতে মুক্তহস্ত। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার বচসা চলিত খুব। মন্ত্রী মহাশয় কোনো উপলক্ষ্যে নাকি বলিয়াছিলেন— "মহারাজ, আপনি ত দান অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী হইতেছেন। কিন্তু মন্ত্রী বেচারার অবস্থা কি ভাবিয়া দেখুন ত? রাজ্য চালাইবার জন্য খরচপত্র করা চলিবে কোথা হইতে? তাহার জন্য আবার কর তুলিতে হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রীকে প্রজার বিরাগ সহিতে হইবে। অপর দিকে প্রজারাও রাষ্ট্রের উপর নারাজ হইতে থাকিবে।" ইত্যাদি

যুয়ান-চুয়াঙের বৃত্তান্তে ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের জিনিষ অনেক আছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সকল গল্পই "ইতিহাস" কিনা সন্দেহ।

(২)

"রাজতরঙ্গিণী" যদি ইতিহাস হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে কাশ্মীর দেশে মন্ত্রীরা অনেক সময়ে বড় বড় কাজ করিয়াছেন

বলিতে হইবে। এই রাষ্ট্রে মন্ত্রীরা ছিলেন রাজ-স্রষ্টা। কার্কোট বংশের উৎপত্তিই হয় মন্ত্রী খঙ্খের প্রভাবে। খঙ্খ একজন মামুলি লোককে গদ্দিতে বসাইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদের কথা। মল্লিমতি-নামক একজন মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের সাহায্যে আর্য্য-রাজ নামে রাজা হইয়া বসেন। প্রথম প্রতাপাদিত্য নামক রাজা মন্ত্রীদের ডাকে বিদেশ হইতে আসিয়া কাশ্মীরের রাজতক্ত দখল করিয়াছিলেন।

(৩)

তামিল ভারতের মন্ত্রীদের ইজ্জৎও উঁচুদরের বলিয়া বোধ হয়। রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল ইত্যাদি নরপতির পল্লী স্বরাজ বিষয়ক ফার্ম্মাণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্ত্রীদের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "ওলাই নায়কম্" অর্থাৎ প্রধান অমাত্য এবং আর একজন মন্ত্রী বা বড় গোছের কর্ম্মচারী এই দুই ব্যক্তির মতামত না লইয়া বাদশারা কোন "শাসন" জারি করিতেন না। কিছু বাড়াবাড়ি না করিয়া মন্ত্রীদিগকে এই ক্ষেত্রে "পাব্লিক ল"র তরফ হইতে রাজার প্রায় সমান বিবেচনা করা চলে।

চোল মণ্ডলের ফার্ম্মাণ, চার্টার বা শাসন গুলা সদরের সরকারী দলিলের দপ্তরখানায় জমা করিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল। কাগজপত্র দপ্তরখানায় পাঠাইবার পূর্ব্বে পল্লী-সভার এবং রাজ প্রতিনিধির মতামত লওয়া হইত। এই ক্ষেত্রেও সদরের বড় আফিসে জনগণের আত্মকর্তৃত্ব কিছু কিছু আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

"এপিগ্রাফিকা জেলানিকা" নামক লঙ্কা বিষয়কতাম্রশাসনসংগ্রাহা-বলীতে মন্ত্রীদের একতিয়ার বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই। চোলমণ্ডলের মতন সিংহলেও পল্লী-স্বরাজ সম্বন্ধীয় আইনগুলার রাজার সঙ্গে মন্ত্রীদের

নাম সংযুক্ত আছে। প্রত্যেক ফার্ম্মাণেই "স-মন্ত্রিপরিষৎ মহারাজ" এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

(৪)

৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতে রাজা হইয়াছিলেন। যুয়ান-চুআঙের "সি-য়ু-কি" গ্রন্থ অনুসারে এই রাজা মন্ত্রীদের নির্ব্বাচিত লোক। জন সাধারণের "সম্মতি"ও ছিল।

এই ধরণের গল্প গুজব কিস্‌সা বা ইতিহাস ভারতের নানা "দেশ" হইতে আরও অনেক সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই মন্ত্রী-দিগকে জন-সাধারণের "প্রতিনিধি" বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাঁহারা "রাজার লোক"। তবে তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অথবা কর্ম্মপটুত্বের প্রভাবে বাদশারা অনেক সময়ে দুরস্ত থাকিতেন এইরূপ বিশ্বাস করা চলে। "মুদ্রারাক্ষসে"র "সচিবায়ত্ত" রাজবিষয়ক কথা বোধ হয় অনেকটা এই বাস্তবেরই ইঙ্গিত করিতেছে।

দেশ স্বরাজে হিন্দুকৃতিত্ব

চোল মণ্ডল হইতে এবং সিংহল হইতে "মন্ত্রি পরিষদে"র ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। নবম-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাক্ষ্য। এই ইঙ্গিতকে খাঁটি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাও চলিতে পারে। অন্যান্য কোনো গল্প বা জনশ্রুতিতে এইরূপ "রাজায় মন্ত্রিতে সম্মিলিত হইয়া" শাসন জারি করিবার খবর পাওয়া যায় না।

তাহা সত্ত্বেও ধরিয়া লওয়া যাউক, যেন, মৌর্য্য আমল হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের দেশে দেশে এবং যুগে যুগে "মন্ত্রি-পরিষৎ" ছিল। এখন বিচার করিতে হইবে, এই মন্ত্রি-পরিষদের কাম কি?

মন্ত্রি-পরিষৎটা বাদশার সহকারী সঙ্ঘ হিসাবে গোটা দেশের কর্মকেন্দ্র। এইটাই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু নরনারীর "দেশ-সভা"। কিন্তু "পাবলিক ল" বা রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক আইনের চোখে এই পরিষদের সঙ্গে "দেশের" অর্থাৎ নরনারীর সংযোগ কিছুই নাই।

সঙ্ঘের শাসনে, শ্রেণীর শাসনে, পল্লীর শাসনে, নগরের শাসনেও হয়ত কিছু কিছু,—হিন্দু নরনারী স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। কিন্তু এই মন্ত্রি পরিষদে বা "দেশ"সভায় জনগণের কোনো আইন সঙ্গত যোগাযোগ ছিলনা। অর্থাৎ "সমগ্র দেশ" নামক সত্তা হিন্দু স্বরাজের বহির্ভূত ছিল।

হিন্দু নরনারী "লোক্যাল" বা স্থানীয় ধান্ধায় আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিয়াছে। কিন্তু "সাম্রাজ্য" নামক লোকসমষ্টির ধান্ধায় পল্লী বা নগরের নরনারীর কোনো এক্তিয়ার ছিল না। ঐতিহাসিক প্রমাণ যতদিন আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু স্বরাজের সীমানা এইখানে টানিয়া রাখা দরকার।

অবশ্য চের, চোল এবং পাণ্ড্য এই দেশের "প্রতিনিধি-তন্ত্র" সম্বন্ধে এই কথা খাটেনা। এই তিন জনপদ ছাড়া "দেশ-স্বরাজ" ভারতের আর কোথায়ও ছিল না। কিন্তু এই তিন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরবর্ত্তী কালে পূর্ণতর বিকাশ লাভ করে নাই। এই জন্য দুনিয়ার লোক "দেশ-স্বরাজের" ইতিহাসে এই তিন জনপদের নাম করিতে অভ্যস্ত নয়।

ইয়োরোপীয় স্বরাজের বিকাশ-ধারা।

কথাটা খোলসা করিয়া বলিতেছি।

"দেশ" "রাজ্য" "সাম্রাজ্য" ইত্যাদি জীবনকেন্দ্রে জনসাধারণের অল্পবিস্তর স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীরই আবিষ্কার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নরনারী স্বরাজ বা স্বাধীনতা বলিলে একমাত্র "লোক্যাল" অর্থাৎ পল্লী-গত বা নগর-গত (এবং শ্রেণী-গত) অধিকার বুঝিত।

(১)

প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রগুলা মাসিদোনীয়রাজ ফিলিপের হাতে গুঁড়া হইয়া যায়। সে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা তখন হইতে রোমাণ সাম্রাজ্যের অবসানকাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়ানরা যে ধরণের অধিকার বা একতিয়ার ভোগ করিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জেঙ্কস্ প্রণীত "রাষ্ট্র-নীতির ইতিহাস" (লণ্ডন ১৯০০) এবং সিজুয়িকের "ডেহ্বেলপ্‌মেণ্ট্ অব ইয়োরোপীয়ান পলিটি" অর্থাৎ "ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ" (লণ্ডন ১৯০৩) ইত্যাদি গ্রন্থে। নিজ নিজ পল্লী, নিজ নিজ "কোঠ" ছাড়া "দেশ" নামক বৃহত্তর লোকসমষ্টির ধান্ধা সেকালের কোনো পশ্চিমার মাথায় ছিল না।

রোমাণ সাম্রাজ্যের মফঃস্বলের লোকেরা সাম্রাজ্যের ধার ধারিত না। একালের ইংরেজ পণ্ডিত আর্ণল্ড প্রণীত "রোমাণ প্রোহ্বিন্‌শ্যাল এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন" বা "রোমের প্রাদেশিক শাসন" (অক্‌স্‌ফোর্ড, ১৯১৫) অথবা সেকালের ফরাসী পণ্ডিত গীজো-প্রণীত "প্রতিনিধি-তন্ত্রের ইতিহাস" ইত্যাদি গ্রন্থে ইয়োরোপীয় স্বরাজের দৌড় স্পষ্ট দেখিতে পারি।

(২)

ফ্রান্সের কোনো কোনো নরপতি মাঝে মাঝে খোলা মাঠে সার্ব্বজনিক সভা ডাকিয়া লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিত। "শাঁ দ' মার্স্" এবং "শাঁ দ' মা" অর্থাৎ "মার্চ্চের মাঠ" এবং "মে মাসের মাঠ" নামে এই এই প্রতিষ্ঠান অষ্টম নবম শতাব্দীতে পরিচিত ছিল।

রোমাণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া "বর্ব্বার" জার্ম্মাণেরা ফ্রান্সের মতন ইতালিতে এবং স্পেনেও নয়া নয়া রাষ্ট্র কায়েম করে। এই সকল দেশেও রাজারা জনসাধারণকে পল্লীর বাহিরে স্বরাজহীন করিয়াই রাখিয়াছিল। স্পেনের রাজারা তোলেদো সহরে এক প্রকার সভা কায়েম করে। তাহার ইজ্জৎ হিন্দুদের মন্ত্রি-পরিষদের কোঠা ছাড়াইয়া যায় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কোথায়ও "প্রতিনিধি-তন্ত্র" আত্ম প্রকাশ করে নাই। এই সময়ে বিলাতে এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। দুনিয়ায় দেশ-স্বরাজ নামক সত্তার জন্মদাতা ইংরেজ জাতি। সাত শ বৎসর ধরিয়া ইংরেজরা সেই ধারা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য মুল্লুকে "দেশ-স্বরাজ" মধ্য যুগের শেষের দিকেও সর্ব্বত্র দেখা যাইত না। ফরাসী বিপ্লবের সম সম কাল পর্য্যন্ত বাদশা বা রাজা একাকীই সমগ্র মুল্লুক এই ছিল ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বাস্তব আইন সঙ্গত কথা। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী বাদশা চতুর্দ্দশ লুই বলিতেন :—"লেতা সে মোআ" অর্থাৎ আমিই রাষ্ট্র।"

তথা কথিত হিন্দু পার্ল্যামেণ্ট।

যাহা হউক, ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোথায়ও "দেশ-স্বরাজ" গড়িয়া উঠে নাই। কি এশিয়ায় কি ইউরোপে সর্ব্বত্রই বাদশার হুকুম বা মর্জ্জিই ছিল নরনারীর আইন। হিন্দুদের "মন্ত্রি-পরিষৎ" অথবা ফরাসীদের "মার্চ্চ মাসের মাঠ" অথবা স্পেনিয়াদের "তোলেদো-সভা," এই সকল প্রতিষ্ঠানকে জনগণের আত্মকর্তৃত্বের তরফ হইতে উল্লেখ করা চলিবে না। তবে এইগুলার প্রভাবে রাজশক্তি সর্ব্বত্রই খানিকটা খর্ব্ব হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এক অদ্ভুত আবিষ্কার প্রচারিত হইয়াছে।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিহারের ব্যারিষ্টার-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল কলিকাতার "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকায় হিন্দুজাতির "পার্ল্যামেণ্টের" পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে "পৌর-জানপদ" শব্দটা বিলাতী "পার্ল্যামেণ্ট" অর্থাৎ "দেশ-সভার" সঙ্গে একার্থক। "পৌর"শব্দে তিনি বুঝিয়াছেন "পুরসভা" এবং "জানপদ" শব্দে "জনপদ"-সভা। অতএব "পৌরজানপদ" তাঁহার মতে "পুরবাসীদের এবং নগরবাসীদের সমবেত মহাসভা"।

এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রায় একশ নজির দিয়াছেন পাদটীকায়। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বিবেচনায় তাহার একটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। "পৌর-জানপদ" শব্দের অর্থ "সহরের লোক আর পাড়াগাঁয়ের লোক"। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই সূত্রে কাশীপ্রসাদ ১৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের হাথিগুম্ফা-লিপির যে ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণীয় নয়। তাঁহার মতে নরপতি "খারবেল পৌর-জানপদকে অর্থাৎ পার্ল্যামেণ্টকে কতকগুলা অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রিভিলেজ্ বা অধিকার ও এক্তিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন।" "অনুগ্রহ"কে বিলাতী "কন্‌ষ্টিটিউশ্যনে"র বা রাষ্ট্র-শাসনের দৃষ্টান্তে আইন-সঙ্গত জনগণের অধিকার বিবেচনা করা চলিবে না। "জানপদ" ও একটা জনগণের স্বরাজ প্রতিষ্ঠান নয়।

রাজাবাহাদুর "প্রকৃতি-রঞ্জক" ছিলেন। আর "দেশের লোক" (পৌরজানপদ) রাজার কাজকর্ম্মে খুব সুখী বা খুসী ছিলেন। ব্যস্। ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে, তাহাই গাজুরি এবং বুদ্ধিহীনতার সাক্ষ্য দিবে মাত্র। "মডার্ণ রিভিউ"র প্রবন্ধ দফায় দফায় সমালোচনা করা বর্ত্তমান গ্রন্থে পোষাইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিচার-ব্যবস্থায় জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্ব।

ইউরোপে জুরির বিচার।

জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবিৎ ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট্‌ তাঁহার "স্বদেশী ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থে ইংরেজ সমাজে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজেরা "জুরি" প্রথা কায়েম করিয়া বিচার ব্যবস্থায় জনগণের আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জুরির বিচারের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলা চলে। হোল্ড্‌স্‌ হ্বার্থ প্রণীত "ইংরেজ আইন-কানুনের ইতিহাস" গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯০৩) বর্ত্তমান ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবৃত আছে। সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া জুরি-প্রথাকে স্বরাজের এক বড় খুঁটা স্বীকার করিতেই হয়। ইহার প্রভাবে বিচার-ব্যবস্থা জনগণের তরফ হইতে খানিকটা "ডেমোক্রাটিক" অর্থাৎ প্রজায়ত্ত হইতে বাধ্য।

জুরির বিচার ইউরোপে দেখা দেয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। হ্বাল্‌শ্‌-প্রণীত "দুনিয়ার সর্ব্বপ্রধান শতাব্দী,—ত্রয়োদশ শতাব্দী" নামক গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক ১৯০৭) জানিতে পারা যায় যে, রাইন এবং হ্বেজার দরিয়ার মধ্যবর্ত্তী জনপদে অর্থাৎ আজকালকার হ্বেষ্টফেলিয়া প্রদেশে "ফেম"—আদালতের সূত্রপাত হয়। এই সব আদালত পল্লীবাসীদের আপোষে শালিশীর বিচার-কেন্দ্র।

বিলাতেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় হেন্‌রির "অ্যাসাইজ" কানুন জারি হয়। এক কানুনের নিয়মে, জমিজমার দখল বা স্বত্বাধিকার লইয়া তকরার উপস্থিত হইলে পল্লী হইতে চারজন "নাইট" শ্রেণীর "বাবু" বা অভিজাত ব্যক্তির মতামত জানা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইত। আর

একটা কানুনে ঠিক এই প্রণালীতেই উত্তরাধিকারীদের হিস্সাও নির্দ্ধারিত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

হিন্দু জুরি।

(১)

হিন্দু নরনারীর বিচার-ব্যবস্থায় এইরূপ আত্মকর্তৃত্ব জনসাধারণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া দেখিতে পাই। শুক্রনীতি (৪।৫।৪৪-৫৬ পংক্তি) গ্রন্থে এই বিষয়ে যে সকল কথা আছে তাহা সম্প্রতি আলোচনা করিব না। জমিজমার সীমানা লইয়া ঝগড়া বাধিলে পল্লী-"বৃদ্ধ"দের ডাক পড়িত, কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" (৩।১০) একথা বুঝিতে পারি।

১৯১৩ সালের জুন মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল "অর্থ-শাস্ত্রের" নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নজিরে বুঝা যায় যে, পল্লী-বৃদ্ধদের ভিতর মতে অমিল হইলে "বহবঃ-শুচয়ঃ" অর্থাৎ "বেশী ভাল লোক" যে দিকে, সেই দিকেই রায় দিতে হইত। কৌটিল্যের বিধানে বিলাতী "অ্যাসাইজ"ই দেখিতেছি,—তবে কম সে কম বার চোদ্দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা "অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়।

শুক্রনীতিকে কোনো যুগে ফেলা এখনো সম্ভবপর নয়। তাহা ছাড়া কোনো রাজবংশের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ঘটানো আরও কঠিন। কৌটিল্যকে মৌর্য্যভারতের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবার সপক্ষে বিপক্ষে এখনো তর্ক চলিতেছে। কাজেই সন্দেহমূলক হইলেও জুরি-বিষয়ক কৌটিল্যের বচনটা এইখানে উদ্ধৃত করা গেল। তবে মৌর্য্যভারতের জজেরা বাস্তবিক পক্ষে বিচার কার্য্যে জুরির সাহায্য লইতেন কিনা কে বলিতে পারে?

(২)

জুরির কথা খাঁটি রাষ্ট্রশাসনের বাহিরেও ভারতে শুনিতে পাই। শাক্যগৌতম-পন্থীদের সঙ্ঘের ইতিহাসে ৪৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা চলে। বেসালির "দশ বিধান" গোঁড়াদের বিচারে "নতুন কিছু" বিবেচিত হইতেছিল। এই সকল নব বিধানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। মোকদ্দমাটা "উব্বহিক"দের সাহায্যে নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি" পত্রিকায় ফরাসী পণ্ডিত পুঁসাঁর আলোচনায় সঙ্ঘের বিচারে জুরি-ব্যবস্থার কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "উব্বহিক" সম্বন্ধে "চুল্লবগ্‌গে" (৪।১৪, ১৯, ২০) অনেক কথা আছে।

সঙ্ঘওয়ালারা যে-সে লোককে জুরিতে বসিতে দিত না। শত্রু মিত্র উভয়পক্ষের স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা যাহার নাই সে উব্বহিক হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া ঝগড়া চুকলির কারণ ঠাওরাইতে পারা উব্বহিক হওয়ার জন্য আবশ্যক। আইনকানুনের ধারাগুলা বুঝিবার ক্ষমতা থাকাও অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইত। উব্বহিক-ব্যবস্থা স্বয়ং শাক্য-গৌতমেরই প্রচারিত বলিয়া "চুল্লবগ্‌গে" উল্লিখিত আছে। কথাটা সত্য হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ায় জুরি-প্রথা ভারতে জানা ছিল এইরূপ বিশ্বাস করিতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজ-সিংহাসন ও জনসাধারণ।

রাজশক্তির খর্ব্বতা সাধন।

এ পর্য্যন্ত হিন্দু নরনারীর স্বরাজ বা আত্মকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য বিবৃত হইল তাহার সবগুলাই দেশের উপর জনগণের ক্ষমতা এবং প্রজায় প্রজায় লেনদেনের অন্তর্গত। বাদশার নিকট হইতে জনসাধারণ যে সকল এক্তিয়ার, অধিকার বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রজার দাবী এবং রাজার দান এই দুই কথাই আলোচনার মুখ্য কথা ছিল।

এইবার স্বয়ং রাজার উপর প্রজার অধিকার কতখানি তাহার আলোচনা করিব। কি পল্লী-স্বরাজ, কি শ্রেণী-স্বরাজ, কি নগর-স্বরাজ, কি দেশ-স্বরাজ, কি মন্ত্রী-পরিষৎ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেই রাজশক্তি সঙ্কুচিত হইত। পূর্ব্বেই এইরূপ বুঝা গিয়াছে। যে পরিমাণে নরনারী বা "দেশের লোক" অল্প বিস্তর স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, সেই পরিমাণেই "দেশের রাজাও" অধিকারচ্যুত হইতেছে, এক্তিয়ার হীন হইতেছে, ক্ষমতা হারাইয়া বসিতেছে। ইহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এই কথাই এতক্ষণ বলা হইল। অবশ্য এই সকল কারণে হিন্দু রাজতন্ত্রকে আজকালকার পারিভাষিক মাফিক "লিমিটেড্" অর্থাৎ "সীমানায় বাঁধা" সমঝিতে গেলে বাড়াবাড়ি করা হইবে। মৌর্য্য মন্ত্রীর এক্তিয়ার লইয়া এইরূপ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজশক্তিকে আরও গুরুতররূপে খর্ব্ব করা সম্ভব। সেইরূপটাও হিন্দু নরনারীর জানা ছিল। বাদশার গদিটাকে লইয়া ভারতীয় জনসাধারণ অনেক সময়ে ছেলেখেলা করিয়াছে। রাজতক্তটা আজ অমুক লোকের তাঁবে, কাল

অমুকের খেয়ালে,—এইরূপে "দেশের লোকে"র ভিতর লুফালুফি হইতেছে,—এই দৃশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রের ইতিহাসে একাধিক দেখিতে পাই ; জনসাধারণ রাজসিংহাসনের উপর কখন কিরূপ এক্তিয়ার ভোগ করিয়াছে, সে কথা কাজেই "হিন্দুরাষ্ট্রে স্বরাজ" ব্যবস্থার আলোচনায় স্থান পাইবার যোগ্য।

রাজ-নির্ব্বাসন।

রাজাকে সিংহাসন হইতে খেদাইয়া দেওয়া হিন্দু নরনারীর শক্তিযোগের অন্যতম পরিচয়। মহাভারতের গল্প এখানে পাড়িব না। ইতিহাস পরিচিত রাজাদের ভাগ্যই আলোচনা করা যাইবে।

বিলাতে তিন রাজার গদি-চ্যুতি ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের দোষ, তিনি "অভিষেককালের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই।" দ্বিতীয় রিচার্ডকে তাড়ানো হইয়াছিল "আহাম্মুক, অকর্ম্মণ্য, ও অপদার্থ" বলিয়া দ্বিতীয় জেমসের নির্ব্বাসনের অনেক লম্বা লম্বা কারণ দেওয়া হইয়া থাকে! একটা কথা এই যে, তিনি নাকি "প্রাথমিক চুক্তি"টা ভাঙ্গিয়াছিলেন।

হিন্দুজাতির অভিজ্ঞতায় দুই নরপতির নির্ব্বাসন সুপরিচিত। নির্ব্বাসনের কথা "সাহিত্য" ছাড়া অন্য কিছুর প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় যদিও। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দের শেষদিকে নাগদসকো নামক রাজাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকটাকে পিতৃহন্তা বলিয়া দেশের লোক ঘৃণা করিত। শিশুনাগ বংশের উৎপত্তির সঙ্গে এই নির্ব্বাসন কাণ্ড জড়িত। "মহাবংশ" নামক সিংহলী পালী গ্রন্থে এই গল্প পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় নির্ব্বাসিত রাজার নাম বৃহদ্রথ (খৃঃ পূঃ ১৯১-১৮৫)। ইনি ছিলেন মৌর্য্য বংশের শেষ নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর বাণ-প্রণীত "হর্ষচরিত" গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে যে বৃহদ্রথকে তাড়ানো হইয়াছিল "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বল" বলিয়া। ইংরেজরাজ দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের মতন বৃহদ্রথও "প্রতিজ্ঞা" ভাঙ্গিয়াছিলেন অথবা প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"প্রতিজ্ঞা" ও "সময়"

(১)

বাণ-প্রচারিত কাহিনীর "প্রতিজ্ঞা"টা কি? এই বিষয়ে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রণীত "হিন্দু রাজ্যাভিষেকের শাসন-বিষয়ক আইন" প্রবন্ধে ("মডার্ণ রিভিউ," জানুয়ারি, ১৯১২) অনেক মূল্যবান্ তথ্য বাহির হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা প্রণীত "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের নানা কথা" (লণ্ডন ১৯২১) নামক গ্রন্থে রাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। ৎসিম্মার, হেবার, কয়, মোলি, হিলেব্রাণ্ট ইত্যাদি জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের রচনায়ও অনেক কথা জানা যায়। মার্কিন হপ্‌কিন্সও এই দিকে নজর দিয়াছেন।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" (৮।৭।১৭, ২৪) গ্রন্থে দেখিতে পাই, গদিতে বসিবার সময় রাজা জনগণের নিকট একটা "প্রতিজ্ঞা" করিতেন। সেই প্রতিজ্ঞা নিম্নরূপ। রাজা বলিতেন:—"আমি যদি তোমাদিগের উপর অত্যাচার চালাই, তাহা হইলে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম্মই যেন পণ্ড হইয়া যায়। আর আমার পরলোকের সৌভাগ্য, আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং সন্তানসন্ততি সবই যেন বিনষ্ট হয়।"

এই ধরণের প্রতিজ্ঞা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৯।১০৬, ১০৭) ও আছে। হিন্দুদের প্রত্যেক রাজা গদিতে বসিবার সময় রাজ্যাভিষেককালে যদি বাস্তবিকই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দায়িত্ব অন্ততঃ মৌখিক ভাবেও অতি গুরুতর ছিল সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই "প্রতিজ্ঞা"র ফলে রাজায় প্রজায় একটা "সময়" বা চুক্তি গড়িয়া উঠিত। এই "চুক্তির" কথাই দ্বিতীয় জেম্‌সের নির্ব্বাসন কাহিনীতে শুনিতে পাই।

হিন্দু রাজ্যাভিষেক একটা চুক্তি। এই কথা স্বীকার করিলে চুক্তি-ভঙ্গের দোষে বা পাপে যে-কোনো রাজাকে প্রজারা গদি হইতে খেদাইয়া দিতে "অধিকারী"। এই অধিকার "পাবলিক ল" অর্থাৎ শাসন বিষয়ক আইনের অন্যতম বিধান রূপে গ্রহণীয়।

(২)

বাদশারা এই চুক্তি মাফিক কাজ করিতেন কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। তবে এই ধরণের চুক্তি রাজশক্তিকে যে "লিমিটেড" বা নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতর সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত। সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কম্‌সে কম্‌ হিন্দু রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি অথবা হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-দর্শন আলোচনা করিবার সময় "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" আর শান্তিপর্ব্বের বচনগুলা যার পর নাই মূল্যবান্‌ বিবেচিত হইবে।

বিশেষ কথা এই যে, চুক্তি বা "সময়" হিন্দু রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতারই একচেটিয়া তথ্য নয়। ইয়োরোপেও মধ্য যুগের রাজরাজড়ারা অভিষেকের সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আমাদের সংস্কৃত শ্লোকের মতন ল্যাটিন শ্লোক না আওড়াইয়া কেহই গদিতে বসিতে পাইত না। ইংরেজ পণ্ডিত কার্লাইল-প্রণীত "ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের রাষ্ট্র-চিন্তা" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯০৩-১৯১৫) সেই ল্যাটিন "সময়ে"র পরিচয় পাই।

ইয়াঙ্কি পণ্ডিত আডাম্‌স্‌ "বিলাতের শাসন-বিষয়ক ইতিহাস" (নিউ ইয়র্ক ১৯২১) গ্রন্থেও এই অভিষেক কালের "প্রতিজ্ঞা"র দাম অতি চড়া হারে বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে আজকালকার বিলাতী রাজতন্ত্র যে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হইয়া পড়িয়াছে তাহার আসল কারণই হইতেছে রাজার প্রতিজ্ঞা আর রাজায় প্রজায় "সময়"। বিলাতী ইতিহাসে নর্ম্যাণ আমলে অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে এই "সময়" কারবার সুরু হয়।

নৃপতি-নির্ব্বাচন

"প্রতিজ্ঞা" এবং "সময়" স্বীকার করিবামাত্র হিন্দু রাজাকে দেশের লোকের "নির্ব্বাচিত" বলিয়া বিবৃত করা আবশ্যক। পোলিটিক্যাল "থিয়োরি" বা তত্ত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রদর্শনের তরফ হইতে ইহা অনিবার্য্য।

(১)

প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রেও হিন্দুসমাজের কয়েক রাজা খাঁটি বাছাই করা লোক ছাড়া আর কিছু নন এইরূপ দেখিতে পাই। মন্ত্রীদের একৃতিয়ার আলোচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরের রাজনির্ব্বাচন দেখা গিয়াছে। রাজ-নির্ব্বাসনের আলোচনায় প্রথম শিশুনাগের বাছাই-কাণ্ডও উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি তখনকার একজন করিৎকর্ম্মা মন্ত্রী ছিলেন। "দেশের লোক" তাঁহাকে গদিতে বসাইয়াছিল।

কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এক ক্ষত্রপ রুদ্রদামন নামে পশ্চিম ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত এক "লিপি" আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, দেশের লোকেরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজমুকুট পরাইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দের কথা।

চীনা পণ্ডিত যুয়ান-চুয়াঙ তাঁহার "সি-যু-কি" গ্রন্থে হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। * মন্ত্রিবর ভণ্ডীই ছিলেন রাজ-স্রষ্টা এইরূপ বুঝিতে পারি। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রী এবং কর্ম্মচারীরা যোগ দিয়াছিল। আর দেশের লোকেরা সড়কে সড়কে আনন্দে গান গাহিয়া রাজ-নির্ব্বাচনে সম্মতি জানাইয়াছিল।

---

* কাহিনীটা এমন ভাবে লিখিত যে মনে হয়, যুয়ান-চুয়াঙ্ কনফিউশিয়ান-চীনা সমাজের "পরিবার-নিষ্ঠা"ই বিবৃত করিতেছেন। "সি-যু-কি"তে বাস্তব ভারতের সঙ্গে সঙ্গে চীনা ফোঁড়ন কতখানি আছে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রণীত "গৌড়-রাজমালা" (রাজসাহী, ১৯১২) এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "বাঙ্গলার ইতিহাস" (কলিকাতা, ১৯১৫) ইত্যাদি গ্রন্থে জানা যায় যে বঙ্গীয় জন-সাধারণ গোপালকে (খৃঃ অঃ ৭৩০-৭৪০) রাজতক্তে বসাইয়াছিল। গোপাল ছিলেন সেকালের একজন জবরদস্ত "তীরন্দাজ" বা "লাঠিয়াল।" সেই রাজ বাছাইয়ের কথা তামার পাতায় খোদা আছে।

(২)

এই রকম দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু সভ্যতায় রাজসিংহাসনকে সর্ব্বদাই একটা জুজুর মতন ভয় করিত না। রাজার মুকুট এবং গদি-সম্বন্ধেও হিন্দুজাতি অনেক সময় স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিয়াছে। নিজেদের হাতে বাছাই-করা লোক দেশের রাজা,—এইরূপ ঘটনার ফলে জনসাধারণের চিত্তে এবং ব্যবহারে যে ব্যক্তিত্বজ্ঞান ফুটিয়া উঠা স্বাভাবিক, সেই ব্যক্তিত্বজ্ঞান ভারতীয় রাষ্ট্রের আবহাওয়ায় আপনা আপনি বিকশিত হইত।

ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতাও এইরূপ। মধ্য যুগের জার্মাণিতে রাজারা প্রায় সকলেই—অন্ততঃ পক্ষে বংশ-প্রবর্ত্তকেরা নির্ব্বাচিত হইতেন। ফ্রান্সে নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত বড় বেশী নয়। শার্লমেনের বংশধরগণ ছাড়া আর কোন রাজা জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন নাই। বিলাতী রাষ্ট্রের ইতিহাসে জন্মগত উত্তরাধিকারের জোর বেশী কি বাছাই-নীতির প্রভাব বেশী, এই বিষয়ে দার্শনিক তর্ক এখনো থামে নাই। যাহা হউক, হিন্দুর মেজাজ যে পশ্চিমা মেজাজ হইতে পৃথক নয়, এইরূপ বুঝিতে গোল বাধে না।

রাজগদির উত্তরাধিকারী ও লোকমত।

৮১৭ খৃষ্টাব্দের একটা ইয়োরোপীয় ঘটনা কার্লাইল প্রণীত "ইয়োরোপীয় মধ্য যুগের রাষ্ট্র-তত্ত্ব" (লণ্ডন ১৯০৩-১৫) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। লুইস নামক ফ্রাঙ্ক বংশীয় এক রাজা তাঁহার উত্তরাধিকারী-বাছাইয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান কায়েম করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র লোথেয়ারকে তিন দিন উপোস করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টিয়ান ক্যাথলিকরা হিন্দুদের মতনই পূজাপার্ব্বণে অভ্যস্ত। তাহার পর লোথেয়ারকে যথারীতি লুইসের উত্তরাধিকারী বিবেচনা করা হয়। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অমাত্য, জনসাধারণ ইত্যাদি সকলের মতামত লওয়া হইয়াছিল।

এই ধরণের উত্তরাধিকারী-অভিষেক মহাভারতের কাহিনীতে একাধিক আছে। মার্কিণ পণ্ডিত হপ্‌কিন্‌স্ তাঁহার "মহাভারতের ক্ষত্রিয় সমাজ" প্রবন্ধে এই সব উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ১৮৮৯ সালে এই রচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের গল্প বর্ত্তমান গ্রন্থে ঠাঁই পাইতেছে না।

এই বিষয়ে মেগাস্থেনিসের একটা উক্তি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি। রাজ্যে উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে অমাত্য এবং কর্ম্মচারীরা লোকমত লইয়া কোনো ব্যক্তিকে গদিতে বসিবার এক্‌তিয়ার দিতে অভ্যস্ত ছিল। এই কথা মেগাস্থেনিস তাঁহার "ইন্দিকা"য় লিখিয়া গিয়াছেন। এই খবরটা তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বুঝিবার জো নাই। তিনি ভারতে ছিলেন মাত্র তিন বৎসর। ইহার ভিতর ভারতের কোথাও কোনো উত্তরাধিকারী বাছাের দরকার ঘটিয়াছিল কি? সে যাহা হউক, মেগাস্থেনিসের মতে গুণ দেখিয়া উত্তরাধিকারী বাছাই করা হইত, এইরূপও বুঝিতে পারি। জনসাধারণের স্বরাজ ভারতে অতি ব্যাপক ভাবেই দেখা দিয়াছিল বলিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বরাজ-তত্ত্ব।

বিশ্ব-চিন্তায় স্বরাজ (=ডেমোক্রেসি)

এই অধ্যায়ের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই "স্বরাজ" শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। "স্বরাজকে" পাশ্চাত্য "ডেমোক্রেসির" প্রতিশব্দ সমঝিতেছি। কিন্তু "ডেমোক্রেসি" কি বস্তু?

(১)

প্রাচীন ইয়োরোপে গ্রীকরা "ডেমোক্রেসি" শব্দ ব্যবহার করিত প্রচুর পরিমাণে। রোমাণদের কথাবার্ত্তায় এই শব্দ বড় বেশী দেখা যাইত না। বর্ত্তমান ইয়োরোপে বোধ হয় ফরাসীরা আবার ডেমোক্রেসির রেওয়াজ ফিরাইয়া আনিয়াছে। ফ্রান্সের পর শব্দটা চলে বেশী ইয়াঙ্কিস্থানে। ইংরেজরা শব্দটা অল্পবিস্তর ব্যবহার করিয়া থাকে। জার্ম্মাণ সমাজে ইহার চল খুব কম। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মোটা ধারার কথা বলিতেছি। কোনো ব্যক্তি-বিশেষ বা গ্রন্থ বিশেষের দিকে নজর রাখিয়া এই প্রভেদ লক্ষ্য করা হইল না।

ফরাসী, ইয়াঙ্কি, ইংরেজের মধ্যেও আবার প্রভেদ লক্ষ্য করা সম্ভব। ইংরেজের রাষ্ট্র-সাহিত্যে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বেশী দেখিতে পাই "কন্‌ষ্টিটিউশ্যন (আইনসঙ্গত শাসন-প্রণালী), "ল" (আইন-কানুন), "অর্ডার" (শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য) ইত্যাদি শব্দের ছড়াছড়ি। "ডেমোক্রেসি" বলিলে অন্যান্যেরা যাহা বুঝে, হয়ত এই শব্দগুলা কায়েম করিয়া ইংরেজরা সেই কথাই প্রকাশ করে।

ফরাসীরা "দেমোক্রাসি" শব্দটা যখন চাপিয়া রাখে, তখন তাহাদের রচনায় বা বক্তৃতায় বাহির হয় "লিবার্তে" (স্বাধীনতা) অথবা "জুস্তিস্" (ন্যায়)। ইংরেজদের "ল" আর "কনষ্টিটিউশ্যন" ফরাসীদের "জুস্তিস্" বস্তুরই এপিঠ ওপিঠ। বস্তুতঃ ইংরেজদের বাগ বিতণ্ডায় "জ্যাষ্টিস্" শব্দের চলও কম নয়।

মার্কিণরা ইংরেজের মতন "ল," "কনষ্টিটিউশ্যন" ইত্যাদি অথবা ফরাসীদের মতন "জুস্তিস্" শব্দ যখন তখন ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নয়। তাহারা সোজাসোজি "ডেমোক্রেসি," "ডেমোক্র্যাট," "ডেমোক্র্যাটিক" ইত্যাদি বোল যেখানে সেখানে আওড়াইয়া থাকে। এই শব্দের আবহাওয়ায় মোটের উপর "জনসাধারণের ক্ষমতা," "জনসাধারণের জীবন" "জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব" ইত্যাদি ছুঁইতে পারা যায়।

ইংরেজরা "ল" ইত্যাদি শব্দে রোমাণ জাতির ধরণধারণই বজায় রাখিতেছে বলা চলে। জার্ম্মাণরা ঠিক ইহাদেরই মতন সেইরূপ "রেখ্ট্" (উচ্চারণ প্রভেদে "রেষ্ট") শব্দ কায়েম করে। সহজে "রেখ্ট্" শব্দের অর্থ আইন, ন্যায় ইত্যাদি।

(২)

যে জাতি যে শব্দই ব্যবহার করুক না কেন, মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই এক ঘাটে আসিয়া জল খায়। তবে শব্দগুলার ইসারা এবং ইঙ্গিত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন। এই সবের বাঁধাবাঁধি-যুক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে বসিলে বর্ত্তমান গ্রন্থের সমান একখানা বই লেখা হইয়া যাইতে পারে। তাহাতেও বিষয়টা পরিষ্কার হইবে কিনা সন্দেহ। কেন না "ল," "কনষ্টিটিউশ্যন," "লিবার্তে" "জুস্তিস্," "রেখ্ট্," "ডেমোক্রেসি" ইত্যাদি শব্দের বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞাই রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বা রাষ্ট্র-দর্শনের সকল তথ্য।

স্বরাজ শব্দকে যখন ডেমোক্রেসির সঙ্গে একার্থক ভাবে লওয়া গিয়াছে, তখন ডেমোক্রেসির সকল জটিলতাই স্বরাজের সঙ্গে মাথা আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "ল" "লিবার্টি," "জুষ্টিস্" "রেথ্ট্" ইত্যাদি সকল চিজের সঙ্গেই স্বরাজের দেখা সাক্ষাৎ হইবার কথা। শব্দটাকে বাঁধাবাঁধির ভিতর ফেলিতে চেষ্টা করা আবশ্যক সন্দেহ নাই।

"ল," ধর্ম্ম, "রেখ্ট্" "জুষ্টিস্"

"ল" শব্দের অর্থ কি? ইংরেজ পণ্ডিত অষ্টিন প্রণীত "জুরিস্-প্রুডেন্স্" বা "অনুশাসন-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থে ইহার বিপুল ব্যাখ্যা আছে। হল্যাণ্ড-প্রণীত গ্রন্থেও বিশ্লেষণ আছে। সেকালের হিন্দু নরনারী (একালের কথা বলিতেছি না) "ধর্ম্ম" শব্দ প্রয়োগ করিতে যত প্রকার বস্তু বুঝিত, "ল" শব্দেও প্রায় সব গুলাই বুঝা যায়। জার্ম্মাণ "রেখ্ট্"ও তদ্রূপ বিশ্ব-গ্রাসী। "ধর্ম্মসূত্র," "ধর্ম্মশাস্ত্র" ইত্যাদি সাহিত্যের "ধর্ম্ম" হইতেছে "রেখ্ট্," "জুষ্টিস্," "ল", কন্‌ষ্টিটিউশ্যন"।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" ইত্যাদি বাক্যের "ধর্ম্ম" শব্দে দেবদেবী অথবা গোপূজা অথবা মন্দির দেবালয় ইত্যাদি বুঝায় না। বুঝায় "ল" বা "রেখ্ট্"। "ধর্ম্মের" সংস্থাপনও সেইরূপ "ল" "অর্ডার," "জুষ্টিস্" "রেখ্ট্" ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা।

"নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ"—ইত্যাদি বাক্যের ধর্ম্মও ল, কন্‌ষ্টিটিউশ্যন ইত্যাদি। পাপ পুণ্য, পরকাল ইহকাল, তিথিনক্ষত্রের দোহাই ইত্যাদি বাজে কালিদাসের "ধর্ম্মে" ছিল না। ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসীরা যখন যখন "ল"-বাচক শব্দের ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, হিন্দু নরনারীরা তখন তখন "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করিত।

ডেমোক্রেসির ফরাসী ব্যাখ্যা

ডেমোক্রেসি শব্দের রেওয়াজ ফরাসীদের প্রভাবে বর্ত্তমান জগতে ছিনরূপ আসিয়াছে। দেখা যাউক, ফরাসীরা এই শব্দে আজকাল কি বুঝিতেছে। জোসেফ বার্থেলেমির "ল্য" প্রোব্লেম দ'লা কোম্পেতাঁস্ দঁ লা দেমোক্রাসি" (প্যারিস ১৯১৮) গ্রন্থ ডেমোক্রেসির ব্যবস্থায় "যোগ্যতা"র সমস্যা লইয়া প্রণীত। ইহাতে "দেমোক্রেসি"র যে স্বরূপ পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মূর্ত্তিপরিচয় হওয়া সুকঠিন। স্পার্টার উল্টা আথেন্স যেমন, জার্ম্মাণির উল্টা তেমন-কিছুই হইতেছে ফরাসী পণ্ডিত মহাশয়ের চিন্তায় "ডেমোক্রেসি"। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে ডেমোক্রেসির অর্থ ডেমোক্রেসি।

যাহা হউক, ডেমোক্রেসিকে বাঁধাবাঁধির ভিতর আনিতেই হইবে। ফরাসী বিপ্লবের যুগে যখন ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন তিনটা শব্দ ফ্রান্সের হাটে বাজারে গুল্‌জার ছিল। একটা "লিবার্ত্তে" (স্বাধীনতা) দ্বিতীয়টা "এগালিতে" (সাম্য), তৃতীয়টা "ফ্রাতার্ণিতে" (ভ্রাতৃত্ব)। স্বরাজকে ডেমোক্রেসির প্রতিশব্দ করায় এই তিন বস্তু আবহাওয়ায় আসিয়া পড়া গেল। স্বরাজের কথায় এই "ত্রি-রত্ন"ই গোড়ার কথা। কি ভারত, কি ইয়োরোপ, সর্ব্বত্রই স্বরাজের খোঁজে বাহির হইয়া স্বাধীনতা, সাম্য, এবং ভ্রাতৃত্ব এই তিন চিজ ছুঁড়িতে হইবে।

হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রে স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব কতখানি ছিল ?" তাহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রশ্নটা বুঝিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও তোলা হইয়াছে;—"পশ্চিম মুলুকেই বা যুগে যুগে কোথায় কতখানি লিবার্ত্তে, এগালিতে এবং ফ্রাতার্ণিতে ছিল ?"

ভ্রাতৃত্বের দৌড়

ভ্রাতৃত্ব কি চিজ? এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতে বসা অনাবশ্যক। এটা যে বস্তুই হউক না কেন, তাহা সামাজিক বা নৈতিক পদার্থ। রাষ্ট্র-শাসনের কারবারে ইহার ঠাঁই নাই। হয়ত "প্রাক্-রাষ্ট্রীয়" জনগণের আবহাওয়ায় ভ্রাতৃত্ব একটা বাস্তব পদার্থই ছিল বটে। কাজেই কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় স্বরাজ-সাধনার ইতিহাসে তাহার আলোচনা করিবার দরকার নাই। সকলে জানে যে এই বস্তু জগতের "হিতোপদেশ" জাতীয় কেতাব ছাড়া আর কোথাও মেলে না।

সাম্যের ধারা

সাম্য কি চিজ্? শব্দটা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু বস্তুটা ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। বোধ হয় "মান্ধাতা"র আমলের যৌথ-ধনধর্মী নরনারীর সমাজে এই বস্তুটা এক সময়ে জগতে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গ্রন্থের সীমানা। এই সীমানার ভিতর ধন-সাম্য না ছিল ভারতে, না ছিল পশ্চিমে। অসাম্য-ই জগতের আসল কথা দেখিতে পাই। এই হিসাবে স্বরাজ ছিল না কোথায়ও।

ধন-সাম্য ছাড়া আর এক প্রকার সাম্য আছে! তাহাকে বলা চলে রাষ্ট্রীয় সাম্য। কিন্তু কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, ধনের প্রভাব এড়াইয়া কোনো দিনই রাষ্ট্র তাহার মাথা তুলিতে পারে নাই। নির্দ্ধন অথবা অপেক্ষাকৃত কম ধনীরা রাষ্ট্রশাসনে ঠাঁই পাইত না। ধন-তন্ত্রের দরুণ রাষ্ট্রমণ্ডলে এক মস্ত বড় "অনধিকারী" বা "প্যারিয়া" সমাজ ভারতে এবং ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই ছিল।

দু চার দশ বিশ হাজার "অধিকারী" নরনারীর চিত্র আঁকিতে বসিবার সময় লক্ষ লক্ষ "অনধিকারী"র কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রাচীন আথেন্সের চরম উৎকর্ষের যুগেও মাত্র পঁচিশ হাজার লোক ছিল "অধিকারী", আর প্যারিয়া ছিল চার লাখ নরনারী। যে দেড় দুই হাজার বৎসরের রাষ্ট্রীয় ধারা এই কেতাবে সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক যুগেই এই অনুপাতের লাগালাগি কোনো অনুপাত সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। পয়সা ছিল যার মুল্লুক ছিল তার। অতএব দেখা গেল এই হিসাবেও স্বরাজ বস্তু জগতের নেহাৎ কম লোকের ভোগে আসিয়াছে।

স্বাধীনতার ইতিহাস

বাকি আছে "লিবার্ট্তে" বা স্বাধীনতা। ইংরেজ পণ্ডিত সীলি প্রণীত "রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভূমিকা" গ্রন্থে লিবার্ট্তের ডজনখানেক বিশ্লেষণ আছে। তাহার পাক-চক্রে আবার ডেমোক্রেসি ইত্যাদি সব আসিয়া জুটে। সেই সেই গোলক ধাঁধায় প্রবেশ না করিয়া মাত্র দুইটা তথ্য উল্লেখ করিব।

স্বরাজ বা ডেমোক্রেসির প্রতিশব্দ স্বরূপ যে লিবার্ট্তে বা স্বাধীনতা তাহার প্রথম রূপ "দেশগত"। যখনই কোনো দেশ আর কোনো দেশের তাঁবে শাসিত না হয়, তখনই স্বাধীনতা শব্দ ব্যবহার করা চলে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তখনই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে স্বরাজ চলিতেছে। এই হিসাবে স্বরাজ জগতের নানা যুগে নানা দেশে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য সেই ধরণের স্বাধীন দেশ হিসাবেই হিন্দুরাষ্ট্রের জনপদগুলা এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

লিবার্ট্তে বা স্বাধীনতার দ্বিতীয় রূপ "ব্যক্তিগত"। স্বরাজ বলিলে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই বুঝিতে হইবে। হিন্দুরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত

স্বাধীনতার ঠাঁই-ই বর্ত্তমান গ্রন্থে নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেই সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিষয়ক যে ডেমোক্রেসি তাহার সীমানা আবার সাম্যের সীমানার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। কোন পুরুষ বা নারী তাহার নিজ ব্যক্তিত্বের পূরাপূরি বিকাশ ঘটাইতে পারে কখন? যখন জগতে সাম্য নামক বস্তু সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। "অধিকারী"-"অনধিকারী" ভেদ যত দিন মানবসমাজে থাকে, ততদিন ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে মাত্র "অধিকারী"দের। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্যারিয়ারা চাখিতে পারে না। আথেন্সে পঁচিশ হাজার লোক মাত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাইত। চারলাখ ছিল স্বাধীনতাহীন। এই কথাটা বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্যান্য যুগ এবং দেশ সম্বন্ধেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ব্যক্তিত্ব দেখা যায় আত্মকর্তৃত্বের আকারে। জার্ম্মাণে এই শব্দকে বলে "জেল্‌ব্‌ষ্ট্‌বেষ্টিম্মুঙ্‌"। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ "সেল্‌ফ ডিটার্মিনেশ্যন।" নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গঠন করিতে পারা অথবা নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা—ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং লিবার্ত্তে বা স্বাধীনতার এপিঠ ওপিঠ ভাবে স্বরাজ বা ডেমোক্রেসির অন্যতম বড় তথ্য। দেখা যাইতেছে যে, এই ইতিহাসে আত্মকর্তৃত্বের ঠাঁইও যারপরনাই কম।

স্বরাজ-সাধনার ক্রমবিকাশ

(১)

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গ্রন্থের দৌড়। অসাম্যের রাজ্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব, এক কথায় ডেমোক্রেসি বা স্বরাজের অল্পতা

বা অপ্রাচুর্য্য তাহার পরবর্ত্তী যুগ-পরম্পরায়ও বর্ত্তমান। প্রাচীন [illegible] ফরাসী-বিপ্লব পর্য্যন্ত এই অবস্থা বা অপ্রাচুর্য্য অর্থাৎ দারিদ্র্য বা গোলামির জয়জয়কার ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রজীবনের গোড়ার কথা। অতএব অসাম্যের রাজ্য এবং গোলামির ব্যবস্থা যুগে যুগে রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। যে কোন ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইংরেজী আর্থিক ও শাসন বিষয়ক ইতিহাসে [illegible] তাহার রাশি-রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কতকগুলা মোটা গ্রন্থ যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে অসাম্যের রাজ্য খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ—"শিল্প-বিপ্লবে"র প্রভাবে স্বাধীনতার দিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধাক্কায়, আত্মকর্ত্তৃত্বের সন্ধানে দুনিয়ার নরনারী সজাগভাবে ছুটিতেছে। কিন্তু আর্থিক অসাম্য আজও প্রায় যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। সেই আথেন্সের অনুপাত ছাড়াইয়া মানব সমাজ আজও বেশী উঁচুতে উঠিতে পারে নাই। বোলশেভিক রুশিয়ার চরম সাম্যবাদীরাও জগতে ধনসাম্য আনিতে গিয়া ফেল মারিয়াছেন। এখনও দুনিয়ার সর্ব্বত্র "টাকা যার রাষ্ট্র তার"। নির্দ্ধনের স্বরাজ কোথাও নাই।

তাহা হইলেও বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মরাশির এবং বিপ্লব প্রয়াসের সঙ্গে দুনিয়ার সেকাল,—বিশেষতঃ ত্রয়োদশশতাব্দী পর্য্যন্ত মানব জাতির রাষ্ট্র-সাধনা তুলনা করা চলিতেই পারেনা। এই কথাটা বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

(২)

বর্ত্তমান যুগের ইয়োরোপীয়ানরা মাঝে মাঝে তাঁহাদের "[illegible]" [illegible] [illegible] রূপে [illegible] থাকেন। বিশেষতঃ প্রাচীন এশিয়ার সঙ্গে তুলনায় ইঁহারা প্রাচীন ইয়োরোপকে "[illegible]" [illegible] [illegible]

অজ্ঞাত। তাঁহাদের কথা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া এশিয়ার লোকেরা গ্রীস, রোম এবং ইয়োরোপের মধ্য যুগকে স্বরাজ, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদির স্বর্গ বিশেষ বুঝিয়া থাকেন।

এই ভুল এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থ পণ্ডিত জগতের চোখ খুলিয়া দিতে সচেষ্ট। গ্রীক,রোমাণ এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপীয়ান সভ্যতাকে বাস্তব তথ্যের কষ্টি পাথরে ঘষিয়া নতুন করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গবেষকদের পক্ষে এক মস্ত সমস্যা উপস্থিত। ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলা ঝাড়িয়া বাছিয়া বুঝিবার সময় প্রাচীন ইয়োরোপ সম্বন্ধীয় কুসংস্কারগুলা বর্জন না করিলে পদে পদে ভুল করা হইবে মাত্র।

(৩)

আর একটা কথাও এই তুলনামূলক আলোচনার প্রাণের কথা। কি গ্রীক স্বরাজ, কি রোমাণ স্বরাজ, কি চার্চ্চ স্বরাজ, কি গিল্ড-স্বরাজ, কি নগর-স্বরাজ কোনো পুরাণা স্বরাজের সাহায্যেই একালের ইয়োরোপীয়ানরা নিজেদের স্বরাজসমস্যার কিনারায় আসিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান জগতে সেকেলে স্বরাজগুলার দাম একপ্রকার কিছুই নয়।

তাহার এক প্রমাণ এই যে সেকালের স্বরাজওয়ালারা একালে একদম নিষ্প্রভ। দুনিয়ার আবহাওয়ায় গ্রীসের কোনো ইজ্জৎ নাই। এমন কি ইতালিও বর্ত্তমান রাষ্ট্রমণ্ডলে এবং সভ্যতার আসরে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন পায় মাত্র।

উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর স্বরাজসাধনায় ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মাণ এবং মার্কিণ এই চার জাত অগ্রণী। ইহারা কেহই এক প্রকার বাপ দাদাদের

অর্থাৎ গ্রীস-রোমের ধার ধারে না। ইহারা সকলেই একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করিতেছে।

সেইরূপ মৌর্য্য-চোল আমলের ভারতীয় স্বরাজ-অভিজ্ঞতা হইতেও বিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনো উল্লেখ-যোগ্য সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না। এইরূপে ডাইনে বাঁয়ে চতুঃসীমাগুলি বাঁধিয়া প্রাচীন হিন্দু-কৃতিত্ব জাহির করিতে অগ্রসর হওয়া বিজ্ঞান-সেবীদের কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাম্রাজ্য-শাসনে হিন্দু সমাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুরাষ্ট্রের সমর বিভাগ।

সার্ব্বভৌমের শক্তিযোগ।

(১)

"শ্রেণী" স্বরাজে হিন্দু নরনারীর শক্তিযোগ দেখিলাম। চোল মণ্ডলের পল্লী-স্বরাজে হিন্দুশক্তিযোগ চাখিয়াছি। আর পাটলিপুত্রের ত্রিশ মাতব্বরকে ভারতীয় শক্তিযোগেরই প্রতিমূর্ত্তি সমঝিয়াছি। আবার সঙ্ঘ পরিচালনায়, রাজ-নির্ব্বাসনে, চের-চোল-পাণ্ড্য দেশের "প্রতিনিধি তন্ত্রে"ও হিন্দুজাতির শক্তিযোগ স্পর্শ করিয়াছি।

এইবার সেই শক্তিযোগের অন্যান্য মূর্ত্তির সম্মুখীন হইব। স্বরাজ, স্বাধীনতা ইত্যাদির কর্ম্মক্ষেত্রই হিন্দুশক্তিসাধনার একমাত্র সাক্ষী নয়। হিন্দু নরনারীর শক্তিযোগ, সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের শাসনেও মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। কেন্দ্রী করণ, ঐক্য-স্থাপন, সামঞ্জস্য-বিধান ইত্যাদি কর্ম্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু নরনারীর ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইত।

স্বরাজ গঠনে যে ধরণের ব্যক্তিত্ব আবশ্যক হয়, সাম্রাজ্য গঠনের ব্যক্তিত্ব ঠিক তাহার উল্টা। স্বরাজ চায় বহুত্ব, একসঙ্গে বহু কেন্দ্রের স্বাধীনতা,

বহু ব্যক্তির আত্মকর্তৃত্ব, বহু জনপদের স্বাতন্ত্র্য। সাম্রাজ্যের ঝোঁক বিপরীত। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলাকে এক আইন কানুনের তাঁবে আনাই সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরগণের লক্ষ্য। অনেকের বহুমুখীনতা খর্ব্ব করিয়া তাহাদের ভিতর "ঐক্য-বদ্ধতার" রস সঞ্চার করাই সাম্রাজ্য-বাদীদের সাধনা।

(২)

এই সাধনায় রোমাণরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে জগতে যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা বা ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে বলে "পাক্স্ রোমাণা।" অর্থাৎ "রোমাণ শান্তি"। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ জাতিরও গৌরব। "পাক্স্ বৃটাণিকা" বা "বৃটিশ শান্তি" নামে সেই সিদ্ধি লাভের কথা সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

সেই ঐক্য, সামঞ্জস্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলার যশ হিন্দু শক্তিধরগণের ইতিহাসেও জগদ্‌বরেণ্য। যে সকল দিগ্‌বিজয়ী ভারত সন্তান যুগে যুগে সুবিস্তৃত জনপদের নরনারীকে নানা বৈচিত্র্যের আবহাওয়ায়ও একমুখী হইয়া "সমগ্রের" কথা চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সাহিত্যে "সার্ব্বভৌম" নামে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

তাঁহাদের "চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্র তাঁহাদের রথের চাকা চলিত। তাঁহারা "চাতুরন্ত" নামেও পরিচিত ছিলেন। জগতের "চার সীমানায়"ই এই সকল সার্ব্বভৌমের প্রভাব জারি ছিল এইরূপ বুঝানো হইত। সার্ব্বভৌমদের শক্তিযোগে দুনিয়ায় যে শান্তি, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাকে ল্যাটিন পারিভাষিকের নজিরে "পাক্স্ সার্ব্বভৌমিকা" অর্থাৎ "সার্ব্বভৌমিক শান্তি" বলিতেছি।

(৬)

"দুনিয়া" "জগৎ" ইত্যাদি লম্বা লম্বা শব্দ কায়েম করা যাইতেছে। সেকালের ইয়োরোপীয়ানরা "বিশ্ব-শান্তি" বলিলে তাহাদের সুপরিচিত জগতের টুকরা টুকুকেই "সারা সংসার" বুঝিত। হিন্দুদের সার্ব্বভৌমের বিশ্ব-শান্তি বোলও ঠিক এই মাত্রার জগৎ-কথাই বুঝাইত। দুনিয়ার যতটুকু জানা ছিল বা বশে ছিল, সেইটুকুই "গোটা জগৎ।"

আর এক কথা। বাস্তব জগতে রোমাণ সাম্রাজ্য বড় বেশী দিন টিঁকে নাই। তথাকথিত "রোমাণ শান্তি" মাল জগতের নেহাৎ কম ঠাইয়েই জানা ছিল। শান্তির বদলে অশান্তিই ইয়োরোপের প্রদেশে প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় বিরাজ করিত। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের যে কোনো ইয়োরোপীয়ান মানচিত্রে তাহার সাক্ষ্য অনেক। হিন্দু সার্ব্বভৌমদের বিশ্ব-শান্তিটার দৌড় বুঝিবার সময়ও বাস্তব জগৎটার কথা মনে রাখা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক রাষ্ট্রই মৌর্য্য, গুপ্ত, বর্দ্ধন, পাল বা চোল সাম্রাজ্য নয়।

ইংরেজ পণ্ডিত উল্‌ফ্-প্রণীত বার্তোলুস নামক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আইন পণ্ডিত বিষয়ক গ্রন্থে (কেম্ব্রিজ ১৯১৩) রোমাণ বিশ্বশান্তির "ভিতরকার কথা" সহজেই বাহির করা চলে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয় ঐক্য" নামক ইংরেজী গ্রন্থের (লণ্ডন, ১৯১৪) "সাহিত্য" এবং "লিপি"-ঘটিত প্রমাণগুলাও বাস্তবের কষ্টিপাথরে ঘষিলে অনেক "কুলের খবর" বাহির হইয়া পড়িবে। তথাকথিত ঐক্য, শান্তি, সাম্রাজ্য ইত্যাদির আসরে হিন্দুরা যে ইয়োরোপীয়ানদেরই "মাসতুত ভাই" তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

যাহা হউক, "প্যাক্স্ রোমানা" নজের "সার্ব্বভৌমিক শান্তি" হিন্দু শক্তিযোগের কোষ্ঠীতেও ছিল। সেই শক্তিযোগের শৃঙ্খলা,—এক কথায় সাম্রাজ্য-শাসন—হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বিষয়ক গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই।

সমর-দক্ষতায় হিন্দুনরনারী

রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের শাসনে অন্যতম, বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান, খুঁটা হইতেছে সমরবিভাগ। হিন্দুমতে "বল" রাজ্যের সাত "অঙ্গের" এক "অঙ্গ"। সমর-বিভাগের শাসনে হিন্দুজাতির দক্ষতা যুগে যুগে দেখা গিয়াছে। সামরিক শক্তিযোগ হিন্দুচরিত্রের বাস্তব ইতিহাসে ভিত্তিস্বরূপ। "বল"-প্রয়োগের বিদ্যা এবং কলা ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের অনেক রসদ জোগাইয়াছে।

(১)

ইয়োরোপের মতন ভারতেও "মাৎস্য ন্যায়" প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই স্বাধীন যুগের হিন্দু জীবনের স্বধর্ম্ম। সমর-বিভাগ প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বল-প্রয়োগের কারবারে ভারতের জনসাধারণ সর্ব্বদাই পাকিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত।

ভারতবাসীরা বিদেশীদের সঙ্গেও লড়িয়াছে। সেই লড়াইয়ে জয়লাভ করাও হিন্দু জনগণের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই সময়ের ভিতর ভারত সন্তান অন্ততঃ পক্ষে চার বার বিদেশী শত্রুকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে।

এশিয়া মাইনরের দোআঁসলা গ্রীক (হেলেনিটিক) রাজা সেলিউকস হিন্দুর সামরিক শক্তিযোগের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৩ সালে। আফগান মুল্লুকের দোআঁসলা গ্রীক (হেলেনিটিক) নরপতি মেনান্দার বা মিলিন্দকে হিন্দুরা ১৫৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পরাজিত করে। এই গেল মৌর্য্য এবং সুঙ্গ বংশের শক্তিযোগের সাক্ষ্য।

পরবর্ত্তী কালে মধ্য এশিয়ার হুণজাতি ও হিন্দু জাতির সামরিক শক্তিযোগের ক্ষমতা চাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪৫৫-৪৫৮ সালে স্কন্দগুপ্ত ইহাদের গতিরোধ করেন। ৫২৮ সালেও আর একবার হুণেরা হিন্দুজাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র স্বদেশী লড়াইয়েই হিন্দু পল্টন ওস্তাদ ছিল এমন নয়। বিশ্বশক্তির মাপকাঠিতেও ভারতের জনসাধারণ সামরিক জীবনে দক্ষতা যাচাই করাইতে অভ্যস্ত ছিল। জীবন যুদ্ধের আখড়ায় দাঁড়াইয়া হিন্দু সেনাপতিরা বিদেশী রণ-নায়কগণকে পায়তারায় চিট্ করিতে জানিতেন।

(২)

ঘরে বাইরে লড়িবার জন্য হিন্দু জাতিকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত। কোথায় আফগানিস্থান, কোথায় মধ্য এশিয়া, এই সকল সুদূর স্থিত জনপদেও ভারতের উত্তর সীমানা মাঝে মাঝে গিয়া ঠেকিয়াছিল; ভারতের নরনারীকে সেই সকল দেশের দুর্গরক্ষার এবং স্বাধীনতা রক্ষায় পল্টন পাঠাইতে হইত।

আবার ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জও ভারতীয় রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সকল দ্বীপ-দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ভারতের নারী-কুল নিজ নিজ সন্তান পাঠাইতে জানিত।

কি স্থলে, কি জলে, উভয় কর্ম্মক্ষেত্রেই যুবক ভারতের ডাক পড়িত। পল্টনকে অস্ত্র চালনায় এবং নৌচালনায় পাকা পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সার্ব্বভৌমগণের মাথা ঘামাইতে হইত। ভারতীয় সেনাপতিদের ঘাড়ে লোক বাছাই হইতে রসদ-জোগানো পর্য্যন্ত সমরবিভাগের নানা কাজ আসিয়া পড়িত। সামরিক আত্মকর্তৃত্ব, দেশ-রক্ষার দায়িত্ব, ফৌজের দলে সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা বিধান সবই হিন্দুসমাজের আবহাওয়ায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত।

হিন্দু লড়াই-ধর্ম্মের গ্রীক সাক্ষ্য

(১)

একমাত্র কর্ম্ম-মণ্ডলই হিন্দু নরনারীর সামরিক শক্তিযোগের সাক্ষ্য দেয় এরূপ বুঝিতে হইবে না। ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিকরাও সমর-জীবনের অনুকূল চিন্তাতরঙ্গ সৃষ্টি করিবার জন্য কলম ধরিতেন অথবা গলাবাজি করিতেন। "সমর-যোগ" হিন্দুজীবনের এক বিপুল তথ্য। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক প্রণীত "আলেক্জান্দার জীবনী"তে হিন্দুদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। সব্বাস বা শম্ভুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর আলেক্জান্দার কয়েকজন "তত্ত্বদর্শী" "গিম্নো-সোফিষ্ট" বা দার্শনিকের (হয়ত বা বামুন পণ্ডিতের) সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। অন্যতম ভারতীয় দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, —"আমার বিরুদ্ধে তুমি শম্ভুকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলে কেন?" হিন্দু "তত্ত্বদর্শী" মহাশয়ের জবাব প্লুতার্কের কাহিনীতে নিম্নরূপ:— "আমি চাহিয়াছিলাম যে শম্ভু হয় সম্মানজনক জীবনযাপন করুক, না হয় কাপুরুষের মতন মরুক।"

হিন্দু নরনারী স্বদেশ সেবার জন্য এইরূপ দর্শনই শিখিত। এই ধরণের বোল্‌চাল কতকগুলা রামায়ণ মহাভারতের "কথা" মাত্র ছিল না।

প্লুতার্কের সাক্ষ্য অনুসারে বিশ্বাস করিতে হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর হিন্দু "দার্শনিকেরা" সদাই ধর্মের প্রচারক ছিলেন। আলেকজান্দারকে এই সকল হিংসা-ধর্মী "পুরুতঠাকুর" (?) "গুরুমহাশয়", আচার্য" এবং অন্যান্য তর্কবাগীশদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইতে হইয়াছিল। হিন্দু পল্টনের শক্তিযোগের পশ্চাতে ছিল এই সকল দার্শনিকদের "প্রপাগাণ্ডা" বা স্বদেশ-সেবার আন্দোলন।

(২)

হিন্দু দার্শনিকদের হিংসা-প্রপাগাণ্ডার কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্লুতার্কের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। যে সকল ভারতীয় রাজরাজড়া আলেক্‌জান্দারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী না হইয়া স্বদেশ-দ্রোহীরূপে তাঁহার স্বপক্ষেই যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগের মুখে চুণ কালি লাগানো ছিল সেকালের "বামুন পণ্ডিতদে"র দর্শন-চর্চ্চার অঙ্গ। দেশের লোককে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাতাইয়া ও ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা ব্রতবদ্ধ হইয়াছিলেন। আলেক্‌জান্দারকে হঠাইবার জন্য পাঞ্জাবের পল্লীতে পল্লীতে যে সকল সামরিক প্রয়াস ঘটিয়াছিল, তাহার "আধ্যাত্মিক" আগুন অনেক পরিমাণে আসিয়া পৌঁছিত হিন্দু দর্শনের বাক্‌বিতণ্ডা হইতে।

আলেকজান্দারের গ্রীক পল্টন ভারতে আসিয়া যে হিন্দুদর্শন চাখিয়াছিল, সেই হিন্দু দর্শন সামরিক শক্তিযোগ এবং হিংসাধর্ম্মের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। কাজেই তাঁহার ভারতীয় শত্রুগণের মধ্যে আলেক-জান্দার হিন্দুদর্শনকে এবং হিন্দুদর্শনের প্রচারক দিগকে চক্ষুশূল বিবেচনা করিতেন। এই জন্যই প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আলেকজান্দার বহু সংখ্যক হিন্দু দার্শনিককে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেন। আলেকজান্দার

প্রচারে এবং সামরিক শক্তিযোগের প্রতিভায় হিন্দু দর্শনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এমন জবর সাক্ষ্য বিদেশীর মুখে বেশী পাওয়া যায় না।

যাঁহারা হিন্দুচিত্তের সমর-পিপাসা এবং হিংসাযোগ বিষয়ক বাস্তব তথ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিতে বসেন, তাঁহারা হিন্দুদর্শনের আলোচনায় অনধিকারী বিবেচিত হইবেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁহাদের প্রচারিত হিন্দুদর্শন একদেশদর্শী, আংশিক এবং ভ্রমাত্মক থাকিতে বাধ্য।

হিন্দু ও মুসলমান

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থে বিবৃত যুগপরম্পরার শেষের দিকে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুর সংঘর্ষ ঘটে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে মুসলমানরা ভারতের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দু জাতি তাহাদের সঙ্গে প্রায় তিনশ বৎসর ধরিয়া সম্মুখ লড়াইয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুর্জ্জর-প্রতীহারেরা রণে-ভঙ্গ দেয় নাই। বাংলার সেন বংশ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরাজয় স্বীকার করে নাই। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের যাদব এবং চোল রাজারা কাবু হন। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

প্রায় আড়াই তিন শতাব্দী ধরিয়া যে জাতি বিদেশীর আক্রমণ রুখিতে পারে, তাহার সমরযোগ এবং স্বদেশ-সেবা সম্বন্ধে সন্দেহ করা সম্ভব, একমাত্র ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে। একমাত্র তাহারাই হিন্দুরাষ্ট্রের তথাকথিত "অনৈক্য" এবং হিন্দু সমাজের তথাকথিত "জাতিভেদ" এই দুই তথ্য ফুলাইয়া তুলিতে অভ্যস্ত।

মুসলমানরা যতদিন "বিদেশী" ছিল, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হিন্দুরাষ্ট্রের ধুরন্ধরেরা কতবার ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আলোচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাক্ষ্য সম্প্রতি আনিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু চরিত্রের দোষ গুলাকে যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মোটা অক্ষরে ছাপাইয়া দুনিয়ার বাজারে বাজারে রটাইয়াছেন, তাঁহাদের বাপদাদাদের এবং স্বজাত ভায়াদের চরিত্রখানা আলোচনা করিয়া দেখা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "বাঙ্গলার ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পশ্চিমাদের হিন্দুজাতি বিষয়ক মত বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখিতে পাই। অথচ ইতিহাস বিদ্যার তরফ হইতে সমসাময়িক পাশ্চাত্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করা হয় নাই। কাজেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের "ব্যাখ্যায়" ভুল প্রবেশ করিয়াছে।

যে আড়াই তিনশ বৎসর হিন্দু নরনারী বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল, সেই সময়ে এই সকল শত্রুই ইয়োরোপের নানাদেশে ইউরোপীয়ান দিগকে গোলাম করিয়া রাখে নাই কি? মার্কিণ স্কট-প্রণীত "ইউরোপে মুরিশ সাম্রাজ্য" নামক গ্রন্থে (ফিলাডেল্‌ফিয়া ১৯০৪) কিম্বা ইয়ং-প্রণীত "দেড় হাজার বৎসরব্যাপী পূর্ব্ব-পশ্চিমের লেনদেন" বিষয়ক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯১৬) মুসলমানদের নিকট পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ানদের পরাজয়-কাহিনী বিবৃত আছে। "কেম্ব্রিজ মিডিয়্যাল হিষ্টরি" নামক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মধ্যযুগ বিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও মুসলমানের ইয়োরোপ-দখল সন তারিখ সমন্বিত ভাবে দেখিতে পাই।

(২)

খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ইয়োরোপের মুসলমান-অধ্যায় সুরু হয়। সিসিলি, দক্ষিণ ইতালি, স্পেন, আর দক্ষিণপূর্ব্ব ফ্রান্স পর্য্যন্ত

গোলামি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গোটা ভূমধ্য সাগর সেকালে মুসলমান জাতির কৃতিত্বে "এশিয়ান সাগরে" পরিণত হয়। তখনকার দিনে ইয়োরোপীয়ানরা, শ্বেতাঙ্গ নরনারী, খৃষ্টিয়ানরা "বিদেশী এশিয়ান" শত্রুদের বিরুদ্ধে "ভাই ভাই একঠাঁই" হইতে পারিয়াছিল কি? ইয়োরোপে ঐক্যবদ্ধতা কোথায়? অধিকন্তু তথাকথিত "জাতিভেদ"ত খৃষ্টিয়ানদের সমাজে নেই। তথাপি খৃষ্টিয়ানরা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদের মতনই মুসলমানশাসন হজম করিতে বাধ্য হয় নাই কি?

তাহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে তুর্ক্ মুসলমানেরা দক্ষিণপূর্ব্ব ইয়োরোপে বাদশাহী করিয়া আসিতেছে। সেই বাদশাহীর জের আজও কিছু কিছু দেখিতে পাই। সেকালের খৃষ্টিয়ানরা তুর্ক্‌দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল কি? একালের ইংরেজ এবং জার্ম্মাণ তুর্কী সম্বন্ধে একমত কি? জার্ম্মাণ সমাজেও জাতি ভেদ নাই,—ইংরেজ সমাজেও ত জাতি ভেদ নাই। তথাপি এই সকল পাকা-গোঁড়া খৃষ্টিয়ান শ্বেতাঙ্গেরা এশিয়াবাসীর স্বাধীনতা বা সাম্রাজ্য ইয়োরোপে সহিতেছে কি করিয়া? মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম করিয়া খৃষ্টিয়ানরা খৃষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, ইয়োরোপের ইতিহাসে কতবার?

এই সকল তথ্য মাথায় রাখিয়া তবে নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাজ-বিজ্ঞার সেবকদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দুজাতির সামরিক শক্তিযোগ অন্য কোনো জাতির তুলনায় খাটো নয়। লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়া হিন্দু নরনারী নিন্দনীয় বিবেচনা করিত না। লড়াই না করাই পাপ, এই ছিল হিন্দু সমর-যোগের প্রাথমিক ভিত্তি। এইকথাটাই আলেকজান্দার হিন্দু দার্শনিকের মুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু পল্টনের বহর

(১)

এইবার দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দু সমর-জীবন জরীপ করিব। প্রাচীন হিন্দুপল্টনের বহর মাপিবার পক্ষে সেকালের রোমাণ সমর বিভাগের তথ্য গুলা কাজে লাগিবে। ইংরেজ পণ্ডিত গ্রীনিজ্ প্রণীত "রোমাণ পাব্লিক লাইফ" অর্থাৎ "রোমাণদের সরকারী বা সার্ব্বজনিক জীবন কথা" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯০১) সুপ্রাচীন কালের রাজা সার্ভিয়ুস তুলিয়ুস প্রবর্ত্তিত সমর-বিভাগ বিবৃত আছে। সকল কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরবর্ত্তী যুগের কয়েকটা তথ্য দেওয়া যাইতেছে।

বিলাতী এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা বা বৃটিশ বিশ্বকোষ গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ২২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোমাণ "গণতন্ত্রে"র স্বপক্ষে লড়াইয়ের মাঠে লড়িতেছিল ৬৫,০০০ সৈন্য। রোমে তখন ৫৫,০০০ ফৌজকে "রিজার্ভে" রাখা হইয়াছিল। দরকার হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে এই সংখ্যা হইতে কিছু কিছু করিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া হইত।

গ্রীক ঐতিহাসিক পোলিবিয়ুস ২৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ১১৮ বৎসরের রোমাণ "গণতন্ত্রে"র দিগ্বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কথা অনুসারে ২১৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোমাণ পল্টনে ৩৮,৪০০ এর বেশী ফৌজ ছিল না।

রোমাণ গণতন্ত্রের ফৌজসংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় কার্থেজের বীর হানিবালের বিরুদ্ধে লড়াই উপলক্ষ্যে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২১৮ হইতে ২০২ পর্য্যন্ত ষোল বৎসর এই লড়াই চলিয়াছিল। দ্বিতীয় কার্থেজ-সমর নামে রোমের

ইতিহাসে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ। সেই সময়ে সিপিও ছিলেন অন্যতম রোমাণ সেনাপতি।

সিপিওর অধীনে রোমাণ পল্টনের বহর কত বড় ছিল? রামজে-প্রণীত "রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব" (লণ্ডন ১৮৯৮) গ্রন্থে জানা যায় যে তখনকার রোমাণ সেনা কখনো ১৮, কখনো ২০ এবং কখনো বা ২৩ "লিজ্যনে" বিভক্ত ছিল। এক "লিজ্যন" সেকালে ৪,০০০ বা ৫,০০০ ফৌজে গঠিত হইত। এই সংখ্যার অধিকাংশই ছিল পদাতিক। ৩০০ কিম্বা ৪০০ ঘোড়সওয়ার এক এক লিজ্যনে থাকিত। অর্থাৎ ৭২,০০০ হইতে ১১৫,০০০ পর্য্যন্ত ছিল গণতন্ত্রের আমলে সর্ব্ববৃহৎ রোমাণ সেনা।

(২)

হিন্দু সেনাপতিরা এই সকল রোমাণ পল্টনকে অতি সহজেই "পকেটস্থ" করিতে অথবা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কেননা হিন্দু রাষ্ট্রে পল্টনের বহর ছিল খুব বড়। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর অবসান কাল সম্বন্ধে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্য আছে। সাক্ষ্যটাকে "কিয়ৎ" পরিমাণে "চাক্ষুষ" বিবেচনা করা চলে। কিন্তু মেগাস্থেনিসের প্রদত্ত সংখ্যাগুলা কোথা হইতে আসিল, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও অন্যায় হইবে না।

যাহা হউক, মেগাস্থেনিস বলেন যে, দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্যদেশে রাজত্ব করিতেন নারীরা। এই দেশের পল্টনে ১৫০,০০০ ছিল পদাতিক আর হাতী-সওয়ার ছিল ৫০০। আরব সাগরের উপকূলস্থ অন্যরাজ্য দেশের রাজার অধীনে পদাতিক ছিল ১০০,০০০। তাঁহার ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা ৫,০০০ এবং হাতী-সওয়ারের সংখ্যা ১,৬০০।

এই সময়েই গঙ্গা এবং হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদে যে রাষ্ট্র ছিল, তাহার পল্টনে পদাতিক ছিল ৫০,০০০, ঘোড়সওয়ার ছিল ৪,০০০ এবং হাতী-সওয়ার ছিল ৪০০। সম্ভবতঃ উত্তর বিহার, উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম আসাম এই তিন প্রদেশের কথা বলা হইতেছে। এই সকল বৃত্তান্তে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পরবর্ত্তী কালের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

সেকালে হিন্দু নরনারীর সামরিক শক্তিযোগ জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। এই জন্য গ্রীক মহলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সমরবিভাগ সম্বন্ধে গল্পগুজব রটিত অনেক। মেগাস্থেনিসের পূর্ব্বেও হয়ত কেহ কেহ ভারতীয় সেনাবিষয়ক এই সব সংখ্যা প্রচার করিয়া থাকিবেন।

(৩)

পরবর্ত্তী কালের গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক (খৃঃঅঃ ১০০) তাহার "আলেকজান্দার-জীবনী"তে এক বিপুল পল্টনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পল্টনে ছিল ২০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার ২,০০০ রথ, এবং ৩,০০০, বা ৪,০০০ হাতী-সওয়ার। পল্টনের অধিপতি ছিল গঙ্গা-ধৌত জনপদের গঙ্গরিদে এবং প্রাসী জাত। বোধ হয় সেকালের মগধরাষ্ট্রের কথা এই বৃত্তান্তে বুঝিতে হইবে। আলেক্‌জান্দারের সমসাময়িক বলিয়া মগধের নন্দবংশই বিবৃত হইতেছে ধরিয়া লওয়া যায়। তখনও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত অজ্ঞাত কুলশীল ছোকড়া মাত্র।

গঙ্গাধৌত জনপদের আর এক জাতি সম্বন্ধে খানিকটা সামরিক খবর পাওয়া যায়। এই জাতি গঙ্গারিদে কলিঙ্গি নামে উল্লিখিত। রাজধানী ছিল প্রোতালিস নগরে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমাণ বিশ্বকোষে,—"বৃহৎসংহিতা" সদৃশ প্লিনি-প্রণীত "প্রাকৃতিক ইতিহাস" গ্রন্থে—জানিতে পারি যে, কলিঙ্গওয়ালারা ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ ঘোড়সওয়ার আর

৭০০ হাতী সওয়ার সর্ব্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখিত। সেকালের উড়িয়ারা সমর-দক্ষ জাত ছিল বেশ বুঝা যায়।

(৪)

গ্রীক একং ল্যাটিন লেখকেরা ভারতীয় ফৌজের সংখ্যা লইয়া কল্পনা এবং অত্যুক্তি কিছু কিছু চালাইয়াছিলেন কিনা কে জানে? কোনো ভারতীয় রচনায় সে যুগের পল্টনের কোনো খবর পাওয়া যায় না। নীতি-শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি "শাস্ত্র" সাহিত্য এবং রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি কাব্য-সাহিত্যের নজির বর্ত্তমান গ্রন্থে লওয়া হইতেছে না।

অধিকন্তু,যে যুগের কথা বলা হইতেছে সে যুগের প্রমাণ স্বরূপ একমাত্র কৌটিল্য প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু এই গ্রন্থে পল্টনের বহর মাপিবার উপায় দেখিতে পাই না। নগর-শাসনের মতন সমর-শাসন সম্বন্ধেও "অর্থশাস্ত্র" নেহাৎ অসম্পূর্ণ।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়

৩৬০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের "মহাদণ্ড নায়ক" এক বিপুল "কাব্য" রচনা করেন। লেখকের নাম হরিষেণ। "কাব্য"টা গদ্যে এবং পদ্যে লিখিত। আগাগোড়া একটি মাত্রে "বাক্যে" রচনা সম্পূর্ণ। "পদ" গুলা সবই "বিশেষণ" অথবা "ক্রিয়ার বিশেষণ"। এ এক অদ্ভুত রচনা। লেখাটা তামার পাতে খোদা আছে—কাজেই "লিপি"-সাহিত্যের অন্তর্গত।

"কাব্যের" কথা বস্তু হইতেছে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়। সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে হরিষেণের রচনা বিশেষ দামী। গণ্ডা গণ্ডা দেশের ও রাজার নাম এক সঙ্গে দেখিতে পাই। গুপ্তবীর হেথায় এক

রাজ্য লোপাট করিতেছেন। হোথায় আর এক রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের চরণ সেবা করিতেছে। এক রাজার ধন-সম্পত্তি লুটা হইতেছে। অপর রাজাকে পরাজিত করিবার পর তাহার ধন-সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই ধরণের সামরিক জীবনের তথ্যে হরিষেণের কাব্য ভরপুর।

সমুদ্রগুপ্তের সুন্দর দেহ অস্ত্রশস্ত্রে কত বিক্ষত দেখিতেছি। তীর ধনুক কুড়াল, বর্শা, খন্তা, খাঁড়া, তলোয়ার লোহার গ্যাজ ইত্যাদির আওয়াজ কানে পৌঁছিতেছে অহরহ। লকমারি ব্যূহরচনায় দিগ্‌বিজয়ী বীরবর সুপটু। "বলং বলং বাহুবলম্" ইহাই তাঁহার একমাত্র দর্শন। নিজ বাহুর "পরাক্রম" ছাড়া তিনি অন্য কোন সুহৃদের ধার ধারেন না। হরিষেণের সমরবৃত্তান্তে এই সকল চরিত্রবিশ্লেষণও ঠাঁই পাইয়াছে।

কিন্তু পল্টনের ফৌজ সংখ্যা কত ছিল জানিতে পারি না। সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সেনাপতি কয়জন বা কাহারা ছিলেন তাহাও জানিতে পাই না। দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইবার পর রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের যোগাযোগ কিরূপে রক্ষিত হইতেছিল, সে খবর হরিষেণ দেন নাই। পল্টনকে যথাস্থানে খোরপোষে মজবুত রাখা হইত কি উপায়ে, সে সম্বন্ধেও কোনো তথ্য নাই। পাটলিপুত্রের "মন্ত্রি-পরিষৎ" অথবা "দেশ-সভা" তখন মামুলি রাজ্য শাসন চালাইতেছিল কোন্ প্রণালীতে, সে কথাও জানা সম্ভব নয়।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় চলিয়াছিল ৩৩০ হইতে ৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বৎসর ধরিয়া। কম সে কম ৩,০০০ মাইল বিস্তৃত পল্লী শহর বন-জঙ্গল নদীপাহাড় ভাঙিয়া পাটলিপুত্রের পল্টন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে কালের গ্রীক আলেকজান্দার অথবা রোমাণ সীজার আর একালের ফরাসী নেপোলিয়ন সমুদ্রগুপ্তকে শক্তিযোগী বলিয়া সম্মান

করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শাসনবিজ্ঞানের তরফ হইতে যে সকল তথ্য মূল্যবান, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

যাহা হউক, হরিষেণ সমর-যোগের কবি। হয়ত পরবর্তী কালে,—প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর,—হরিষেণের দিগ্বিজয়ের প্রশস্তিটাই কালিদাসের অমর কাব্যের রাজা রঘুর দিগ্বিজয়-রূপে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। রণাবতার, লড়াই-কর্ম্মের প্রতিমূর্তি সমুদ্রগুপ্তের অভিযানই কালিদাসের ভাবুকতাপূর্ণ কল্পনার বাস্তব ভিত্তি।

আর্য্যাবর্ত্তের শার্ল্‌ম্যেঞগণ

হিন্দু নরনারীর সামরিক ইতিহাস বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন হিন্দু রাষ্ট্রে সমরবিভাগ কিরূপে শাসিত হইত, তাহাই এই "পাব্‌লিক ল" বা শাসনবিষয়ক আইনসম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য।

৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ধর্ম্মপাল গঙ্গা উজাইয়া গিয়া কনৌজে এক মহা-যুদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে পশ্চিম হিমাচলে কেদার পর্য্যন্ত এবং কোঙ্কণ প্রদেশে উত্তর-কানাড়া জেলায় গোকর্ণ পর্য্যন্ত সমগ্র "উত্তর-ভারত" কিছু কালের জন্য পাল সাম্রাজ্যের বশীভূত হয়।

এই সমর-অভিযানের সামান্য খবর পাওয়া যায় তাম্রশাসনে। পাটলিপুত্রের নিকট গঙ্গার উপর নৌকার পুল তৈয়ারি করিতে হইয়াছিল। নৌকার সারি ঠিক যেন পাহাড়ের শিরের মতন দেখাইতেছিল।

দেবপালকেও সার্ব্বভৌমের লড়াকাণ্ডে মোতায়েন থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী ছিলেন সেনাপতি সোমনাথ।

দশম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্ত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, বাংলার পাল এবং উত্তর ভারতের গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশের মধ্যে পরস্পর সমর-যোগের টক্কর চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পালবংশ বিষয়ক ইংরেজি রচনায় (কলিকাতা, ১৯১৫) এই বিষয়ে "লিপি" সাহিত্যের প্রমাণ আছে। কিন্তু "সমর-শাসন" বিষয়ক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বাংলা দেশে সেন আমলে (১০৬৮-১২০০) পণ্টনের কাজে মাঝি মাল্লাদের ডাক পড়িত। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয় নৌবিদ্যা ও নৌশিল্পের ইতিহাসে" (লণ্ডন ১৯১২) জানিতে পারা যায় যে, "নৌ-বল" বাঙ্গালী সেনাবিভাগের অন্ততম অঙ্গ ছিল।

"শাস্ত্র" সাহিত্যে হাতী, ঘোড়া, রথ, এবং পদাতিক এই "চার" অঙ্গের কথা বলা আছে। কিন্তু "লিপি-সাহিত্যে "নৌ"ও "বল" হিসাবে উল্লিখিত। "ধর্ম্ম" "নীতি" এবং "অর্থ" ইত্যাদি বিষয়ক সাহিত্য যে ভারতীয় "পাবলিক ল" সম্বন্ধে আংশিক সাক্ষ্য দেয় মাত্র, এই তথ্য তাহার অন্ততম প্রমাণ। পরন্তু মেগাস্থেনিসের ভারত-বৃত্তান্তে "লিপির" প্রমাণই দৃঢ়ীভূত হয়।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শার্ল্যমেঞ মধ্য যুগের ইয়োরোপে এক জবরদস্ত সেনা-নায়ক। আজকালকার জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্স দুইই ছিল এই খৃষ্টীয়ান সার্ব্বভৌমের কব্জায়। আর্য্যাবর্ত্তে এই সময়ে যে সকল সামরিক কাণ্ড চলিতেছিল, তাহাতে প্রত্যেক জনপদেই একাধিক শার্ল্যমেঞ দরের লোক দেখিতে পাই। খৃষ্টিয়ান শার্ল্যমেঞের বংশধরেরা তাঁহার সাম্রাজ্য অটুট রাখিতে পারেন নাই। বাঙালী এবং অন্যান্ত ভারতীয় শার্ল্যমেঞদের সমর-দক্ষতা ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা জরীপ করিবার জন্ত ইয়োরোপের মাপ-কাঠিটা কাছে রাখা মন্দ নয়।

চোল সাম্রাজ্যের সেনা-শাসন

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার প্রণীত "প্রাচীন ভারত" নামক গ্রন্থে (মাদ্রাজ, ১৯১১) দেখিতে পাই যে চোল মণ্ডলের (খৃঃ ৮৫০—১৩১০) সেনা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র অনুসারে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত থাকিত। ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক ইত্যাদি বিভাগও প্রচলিত ছিল।

তামিল "লিপি"র প্রমাণে বুঝতে পারা যায়," "তীবন্দাজের দল" নামে এক দল ছিল। রাজার দেহরক্ষীদের ভিতর "পদাতিক" ছিল অন্যতম "সেনাঙ্গ"। "দক্ষিণ হস্ত" নামক এক "জাত"দ্রাবিড় সামাজে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কোনো বিশেষ কারিগর শ্রেণী এই নামে পরিচিত ছিল। ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক এই দুই বিভাগের সেনাই "দক্ষিণ হস্ত" জাতি হইতে বাছাই করিবার ব্যবস্থা ছিল। হাতীসওয়ারের কথাও শুনা যায়। কোনো কোনো রাজপুত্র হাতী সওয়ারদের সেনাপতি হইতেন।

শ্রীযুক্ত আয়ার প্রণীত "প্রাচীন দাক্ষিণাত্যে নগর গঠন" নামক গ্রন্থে (মাদ্রাজ ১৯১৬) কুচকাওয়াজের জন্য নগরে নগরে স্বতন্ত্র ময়দানের কথা জানিতে পাই। কাঞ্চী শহরের বাহিরে কিছু লাগাও একটা সামরিক শহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইখানে লড়াইয়ের হাতী এবং ঘোড়া যুদ্ধের জন্য গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করা হইত। ব্যূহ রচনা, সেনা-চালনা এবং রণ-শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য কছরত শিখানোও হইত এই সামরিক শহরে।

চোল সাম্রাজ্যের নৌ বল ছিল সেনাবিভাগের এক মস্ত অঙ্গ। চের রাষ্ট্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের এক সাগর-লড়াই ঘটে। বাদশা রাজরাজ চোল [৯৮৪-১০১৮] চের রাজ্যের জাহাজসেনা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন। এই

নরপতির আমলে চোলসাম্রাজ্য যে বিস্তার লাভ করিতে থাকে, তাহাই কালে গোটা দক্ষিণ ভারত এবং লঙ্কা জুড়িয়া বসিয়াছিল। উড়িষ্যায় এবং বাংলায়ও চোলমণ্ডল কায়েম হইয়াছিল।

রাজেন্দ্র চোলের আমলে [১০১৮-১০৩৫] চোল নাবিকেরা লাক্কাদ্বীপ এবং মালদ্বীপ দখল করে। নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও চোল মণ্ডলের সামিল হয়। অধিকন্তু মান্দ্রাজীরা ব্রহ্মদেশে গিয়া পেগু পর্য্যন্ত স্ববশে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিল। বঙ্গোপসাগর বাংলার সাগর না থাকিয়া "চোল সরোবরে" বা মান্দ্রাজী হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে তামিল সাম্রাজ্যের নৌবিভাগ হইতে বন্দরে বন্দরে "আলোক গৃহ" রাখা হইত।

হিন্দু সেনা শাসনের চীনা বিবরণ

[১]

৬০৬খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন। এই সময়ে তাঁহার তাঁবে ছিল ৫০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৫,০০০ হাতী-সওয়ার। সাড়ে পাঁচ বৎসর লড়াইয়ের ফলে ইনি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র "পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিকা" অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক শান্তি স্থাপন করেন। ৬১২খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের পল্টন খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ১০০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৬০,০০০ হাতী-সওয়ার ছিল এই "বিশ্ব শান্তি" রক্ষার কাজে বাহাল। সংখ্যাগুলা পাওয়া গিয়াছে য়ুয়ান-চুয়াঙ্ প্রণীত "সি-য়ুকি" গ্রন্থে।

বাণ প্রণীত "হর্ষ চরিত" [খৃঃ অঃ ৬২০) সমসাময়িক গ্রন্থ সন্দেহ নাই। তবে এই জীবন চরিতের ভিতর "কাব্য" এবং "উপন্যাস" আছে

অনেক। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার বিবরণটাকে সেকালের ভারতীয় "মোবিলিজেশন" বা সেনা চলাচলের "রোমান্টিক" বৃত্তান্তরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই।

তাহা ছাড়া কয়েক জন লোকের নামও আছে দেখিতে পাই। কুন্তল ছিলেন ঘোড়সওয়ারদের সেনাপতি। হাতী-সওয়ারদের সেনাপতি ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। সিংহনাদকে কেবলমাত্র সেনাপতিরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। সমর এবং শান্তি বিষয়ক অমাত্য—সান্ধিবিগ্রহিক—ছিলেন অবন্তি। এই সকল নাম কাল্পনিক কিনা বলা যায় না। তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডার হইতে রাষ্ট্রশাসনের সম্পর্কে রক্তমাংসের মানুষের নাম এত কম পাওয়া যায় যে, "হর্ষ-চরিতে" উল্লিখিত নামগুলা মনে রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যের উপর হামলা চালাইতে গিয়া নিজ পরাক্রমের সীমানা চাখিয়া আসেন। নর্ম্মদার পাহাড়ীবুকে সেকালের এক বিরাট হ্যাঁদা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম চালুক্য (মহারাষ্ট্রীয়) পুলকেশী আর্য্যাবর্ত্তের অতিবৃদ্ধি রুখিতে সমর্থ হন। য়ুয়ান চুয়াঙ্ বলেন যে পুলকেশী হাতীর পল্টনে প্রবল ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রণীত "দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে (বোম্বাই ১৮৮৪) জানিতে পারি যে চোল চের রাজাদের মতন চালুক্যেরাও লড়াইয়ের জাহাজ রাখিতেন। "শত শত জাহাজ" চালুক্য সেনার নৌবলের সামিল ছিল। আরবসাগরের ধনকেন্দ্র পুরী সাগর লড়াইয়ের ফলে পুলকেশীর সাম্রাজ্যে অন্তর্গত হয়।

[২]

য়ুয়ান-চুয়াঙ্ তাঁহার "সি-য়ুকি" গ্রন্থে মামুলি "শাস্ত্র"সাহিত্যের "চতুর্ব্বিধ সেনাঙ্গের" কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। "নৌবল" তাঁহার বৃত্তান্তে নাই।

পার নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা চলিতে পারে,—হর্ষবর্দ্ধনের সেনায় নৌবল একদম ছিলনা কি ?

হাতীগুলা বর্ম্মে আবৃত থাকিত। দাঁতে থাকিত লোহার গাঁজ। রথ চলিত পাশাপাশি চারঘোড়ার জোরে। দুই জন করিয়া লোক বাহাল থাকিত রথ চালাইবার জন্য। এই দুই জনের ভিতর বসিতেন রথী। সেনাপতি রথ হইতে হুকুম চালাইতেন। রথের নিকটেই থাকিত শরীররক্ষীর দল।

ঘোড়সওয়ার থাকিত সম্মুখে আক্রমণ রুখিবার জন্য। পদাতিকেরা ঢাল এবং বল্লমে সজ্জিত থাকিত। তলোয়ারের রেওয়াজও ছিল। খুব চোখা অস্ত্রশস্ত্র কায়েম করা হইত।

"শুক্রনীতি" গ্রন্থে বন্দুকের কথা আছে। হরিষেণের প্রশস্তি কাব্যে বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রের নাম দেখিয়াছি। কিন্তু বন্দুক জাতীয় চিজ তাহার তাহার ভিতর মিলে না। চীনা বৃত্তান্তেও এই বস্তুর অভাব। বুঝিতে হইবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারতে, অন্ততঃ উত্তর ভারতে, বন্দুকের আবির্ভাব হয় নাই। সে কালে ইয়োরোপেও "আর্টিলারি" বা গোলাবারুদের রেওয়াজ ছিল না। "তীর ধনুক" সেকালের দুনিয়ায় সনাতন অস্ত্রশস্ত্র।

সি-যুকি গ্রন্থে আরও জানিতে পারি যে, যখন যেমন দরকার হইত তখন তেমন ফৌজ বাছাই করা হইত। সার্ব্বজনিকভাবে পল্টনে লোক বাহাল করিবার ব্যবস্থা ছিল। বাঁধা মাহিয়ানা দেওয়া হইত।

য়ুয়ান চুয়াঙর রচনায় এই ধরণের আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সামরিক জীবনের কোন কোন বিষয়ে খবর হয়ত বা আংশিক। কিন্তু মোটের উপর বাস্তব বৃত্তান্ত হিসাবে "সি-যুকির" তথ্য গুলা হিন্দু সমর-শাসনের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান্।

আন্ধ্র সাম্রাজ্যের সমর বিভাগ

চালুক্যবংশ যে জনপদে সপ্তম শতাব্দীর সার্ব্বভৌম, সেই জনপদ পূর্ব্বে ছিল আন্ধ্র বাদশাদের দুনিয়া। আন্ধ্র সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি সম্বন্ধে মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সীতারাম সুক্‌থাঙ্কার ভাণ্ডারকার-স্মৃতি-গ্রন্থাবলীতে "লিপি" সাহিত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন (পুণা ১৯২০)।

রোমাণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আন্ধ্রদের ব্যবসাবাণিজ্য চলিত। বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলে ছিল তাহাদের জাহাজ ঘাট। রাধাকুমুদের গ্রন্থে জানা যায় যে, যজ্ঞশ্রীর আমলে (খৃঃ অঃ ১৭৩-২০২) যে সকল আন্ধ্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহাতে দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজের ছাপ আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আন্ধ্ররা বিশেষ প্রতাপশালী ছিল না। কমসেকম মৌর্য্যদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া তাহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গ্রীক মেগাস্থেনিসকে সাক্ষী মানিয়া ল্যাটিনলেখক প্লিনি বলেন যে এই সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩০০) আন্ধ্রদের পল্টনে ছিল ১০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০০ হাতী-সওয়ার।

পঞ্জাবের নৌ-সেনা

বাঙ্‌লার মতন পঞ্জাবও নদনদী-বহুল জনপদ। পাল এবং সেন বাঙালীদের মতন পাঞ্জাবীরাও সে কালে জলযুদ্ধে ওস্তাদ ছিল। দরিয়ার উপর লড়াই চালানো পাঞ্জাবী সেনাবিভাগের অন্যতম ধান্ধা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।

আলেকজান্দার পঞ্জাবে আসিয়া ভারতীয় নৌবলের বিরুদ্ধে লড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্ষাথ্রয় বা ক্ষত্রিয় নামক জাতির নৌশক্তি এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাবের বিভিন্ন সামরিক জাতির নিকট হইতে নৌকা লইয়া আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নেআর্খস সিন্ধু ভাটাইয়া

আরব সাগরে পৌঁছিয়াছিলেন। ভিন্সেণ্ট প্রণীত প্রাচীন জাতিদের ব্যবসা এবং সাগর বাণিজ্য নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৮০৭) লিখিত আছে যে, পাঞ্জাবীরা নেআর্খসকে ৮০০ হইতে ২,০০০ নৌকা দিয়াছিল।

পাঞ্জাবীদের নৌশক্তি সম্বন্ধে আরও প্রাচীন কালের খবর শুনিতে পাই। আসিরিয়ার রাণী সেমিরামিসের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী নৌসেনা নাকি ৪,০০০ বজরায় সাজিয়া লড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজনির মামুদকেও ৪,০০০ পাঞ্জাবী "রণ-তরী"র সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। এই সকল "গল্প" পাওয়া যায় রবার্টসন প্রণীত "ভারত সম্বন্ধে প্রাচীনদের জ্ঞান" নামক গ্রন্থে [লণ্ডন ১৮২২]।

আলেকজান্দার বনাম হিন্দু-পল্টন

[১]

দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়া পাঞ্জাবের জলসেনা ও স্থলসেনা সেকালের ভারতে অশেষ যশস্বী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। হিন্দু রাষ্ট্রের সমর-বিভাগের ইতিহাসে সেই স্বদেশ-রক্ষার সমর এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। প্রত্যেক ছটাক জমিনের উপর ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ মাটি কামড়াইয়া বিদেশীর বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল।

আলেকজান্দার বনাম হিন্দু পল্টনের কথা গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে দেখিতে পাই। ঘটনার প্রায় সাড়ে তিনশ বৎসর পরে সিসিলি দ্বীপের "রোমাণ" লেখক দিয়োদোরুস "দুনিয়ার ইতিহাস" রচনা করেন গ্রীক ভাষায় [খৃঃ অঃ ৫০]। তাহাতে আলেকজান্দারের ভারত-অভিজ্ঞতা ঠাঁই পাইয়াছে।

পরে গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক [খৃঃ অঃ ১০০] এবং "রোমাণ" আরিয়ান [খৃঃ অঃ ১৩০] গ্রীক ভাষায় আর কুর্ত্তিয়ুস [খৃঃ অঃ ২০০]

এবং যুস্তিন [খৃঃ অঃ ১৫০] ল্যাটিন ভাষায় আলেকজান্দার-কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইংরেজ ম্যাক-ক্রিণ্ডল্ প্রণীত "আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণ" [লণ্ডন, ১৮৯৬] গ্রন্থে এই সকল গ্রীক এবং ল্যাটিন বিবরণ সহজে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বৃত্তান্তে কতখানি সত্য আছে আর কতখানিই গল্পগুজব ঠাঁই পাইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সোজা নয়।

[২]

যাহা হউক, আফগানিস্থানের আসাকেনয় জাতি মাসাগা দুর্গের সুরক্ষিত স্থান হইতে আলেকজান্দারকে হঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই রূপ জানিতে পারা গিয়াছে। আরিয়াণ এবং কুর্ত্তিয়ুস বলেন যে হিন্দু পল্টনে তখন ছিল ৩০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৩০ হাতী-সওয়ার।

পরে আলেকজান্দারকে "পুরু-রাজের" সঙ্গে লড়িতে হয়। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঝেলাম দরিয়ার কিনারায় লড়াই ঘটে। ২০০ হাতী-সওয়ার ছিল হিন্দুপল্টনের কেন্দ্রস্থলে। প্রত্যেক হাতীকে একশ ফিট অন্তর অন্তর দাঁড় করানো হইয়াছিল। বোধ হয় হাতীসেনা আট সারিতে বিভক্ত ছিল। হাতীর পশ্চাতে ছিল ৫০,০০০ পদাতিক। হাতী-সওয়ারের ফাঁকে ফাঁকে পদাতিকের দলও সন্নিবেশিত ছিল। সেনার দুই ধারে ছিল ঘোড়-সওয়ার এবং রথের ঠাঁই। ৩,০০০ ঘোড়া এবং ১,০০০ রথ পুরুরাজের সেনাবলের অন্তর্গত।

দিয়োদোরুস এবং প্লুতার্ক এই বিবরণের জন্য দায়ী। দিয়োদোরুস বলিয়াছেন যে, হিন্দু-ব্যূহটা একটা দুর্গরক্ষিত নগরের মতন দেখাইতেছিল। হাতীগুলা ছিল ঠিক যেন দেওয়ালের চূড়া বা পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র বিশেষ আর পদাতিক শ্রেণী যেন নগর প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ! প্লুতার্ক বলেন

যে এই যুদ্ধে আলেকজান্দারের পল্টন বিশেষ হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই আলেকজান্দার ভারতের পশ্চিম সীমানাটা দেখিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

পুরুরাজের ঠ্যাঙা খাইয়া আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ পিপাসা মিটিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কানে খবর পৌঁছে যে পূর্ব্ব-ভারতের গঙ্গাধৌত জনপদের বাদশা প্রায় তিন লাখ "হস্ত্যশ্বরথপাদাতি" লইয়া ইয়োরোপীয়ান আক্রমণকারীর সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে আসিতেছেন।

[৩]

আলেকজান্দারকে হিন্দু সমর-বিভাগের ক্ষমতা আরও চাখিতে হইয়াছিল। পঞ্জাব হইতে ঘরমুখো হইবার পথে তাঁহার উপর হিন্দুরা অনেক হামলা চালায়। "গণতন্ত্রী" পাঞ্জাবীরা দলে দলে আলেকজান্দারকে ভারতীয় সমর-যোগের নমুনা দেখাইতেছিল।

আস্‌সালস্‌সয় জাতির তাঁবে নাকি ছিল ৪০,০০০ পদাতিক আর ৩,০০০ ঘোড়-সওয়ার। মালব এবং ক্ষুদ্রক এই দুই জাতি সম্মিলিত হইয়া বিদেশী শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। শুনা যায় তাহাদের সমবেত পল্টনে ৯০,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ ঘোড়-সওয়ার এবং ৯০০ রথ ছিল।

তিন গজ লম্বা ছিল হিন্দু ফৌজের বর্শা। পাঞ্জাবী তীরন্দাজদের বাহুবল সম্বন্ধে আরিয়ান বলেন:—"ইহাদের ধনুকের ঘা হইতে আত্মরক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য সাধন বিবেচিত হইত। ঢাল অথবা উরস্ত্রাণ অন্য কোন বেশী টেঁকসই যন্ত্র যদি থাকে, তাহার সাহায্যেও হিন্দু ধনুকের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইত না।"

[৪]

সংখ্যাগুলা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলিতে পারে। আলেকজান্দারকে যে মস্ত মস্ত পল্টনের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল এই কথা প্রচার করাই

ছিল দিয়োদোরুস ইত্যাদির উদ্দেশ্য। ইয়োরোপের গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যেও সেকালে "প্রশস্তি" "চাটু" বাক্য ইত্যাদি মাল "ইতিহাস" নামে পরিচিত ছিল।

হাজার হাজার লাখ লাখ এশিয়ান ইয়োরোপীয়ান বীরবরের গতিরোধ করিতে পারে নাই এই হইতেছে আলেকজান্দার-গাথার ধুআ। ভারতীয় পল্টনগুলাকে বহরে খুব বড় দেখানো কাজেই ঐতিহাসিক মহাশয়ের এক বিশেষ লক্ষ্য। হিন্দু সমরবিভাগের আলোচনায় পাশ্চাত্য "রিপোর্টার"-দের অত্যুক্তি-প্রিয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে চলিবে না।

মৌর্য্য-পল্টন=২ রোমান পল্টন+

[১]

আলেকজান্দার ভারতের পশ্চিম সীমানায় ছিলেন ৩২৭ হইতে ৩২৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। পঞ্জাবের এক অংশে গ্রীক সেনা আরও কিছুকাল ইয়োরোপীয়ান প্রভুত্বের সাক্ষীস্বরূপ মোতায়েন ছিল। হিন্দু নরনারীর সমর-সাধনা এই বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিজয় লাভ করে। ৩২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজান্দারের শেষ চিহ্নোৎ পর্য্যন্ত পঞ্জাবের পল্লী-নগর হইতে মুছিয়া ফেলা হয়। সেই স্বাধীনতার সমরের হিন্দু-সেনাপতি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য।

এই ঘটনার উনিশ বৎসর পরে এশিয়া মাইনরের গ্রীক হেলেনিষ্টিক রাজা সেলিউকস ভারতের দিকে হামলা চালাইতেছিলেন আলেকজান্দারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। ৩০৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য সার্ব্বভৌম সেলিউকসের সমর-পিপাসা মিটাইয়া দিয়াছিলেন। সেলিউকস আফ-গানিস্থান এবং বেলুচিস্থান ভারত সম্রাটের নিকট সঁপিয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

চন্দ্রগুপ্ত তখন ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ৯,০০০ হাতীসওয়ার এবং ৮,০০০ রথের মালিক। প্রত্যেক হাতীর উপর তিন জন করিয়া তীরন্দাজ থাকিত। দুইজন করিয়া যোদ্ধার ঠাঁই ছিল প্রত্যেক রথে। সর্ব্বসমেত মৌর্য্যপল্টনে লোকসংখ্যা ছিল ৬৯০,০০০। রোমাণ লেখক প্লিনির "প্রাকৃতিক ইতিহাস" গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তী গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্কের "আলেকজান্দার জীবনী"তে এই সকল তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের আমলে মৌর্য্য নৌসেনায় ছিপ বজরা পান্সী ও জাহাজ কতগুলা ছিল সে খবর জানা যায় নাই।

[২]

এই পল্টন ছিল "স্থায়ী"। প্লিনি বলেন,—ফৌজেরা বেতন পাইত দৈনিক হিসাবে এবং নিয়মিতরূপে।

এইখানে রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টনের বহর আলোচনা করা দরকার। ইংরেজ আর্ণল্ড প্রণীত "রোমাণ প্রাদেশিক শাসন" (অক্‌স্‌ফোর্ড, ১৯১৪) গ্রন্থে জানা যায় যে, "গণতন্ত্রে"র আমলে রোমে "স্থায়ী পল্টন" ছিল না। রোমাণরা স্থায়ী পল্টন প্রথমে কায়েম করে বাদসা অগুস্তসের আমলে। অগুস্তস রোমাণ "সাম্রাজ্যে"র প্রথম বাদসা।

তিবোতরিয়ুস [খৃঃ অঃ ১৪-৩৭] অগুস্তসের পরবর্ত্তী সম্রাট্‌। তাঁহার আমলে রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টন তাহার চরম বহর লাভ করিয়াছিল। ২৫ "লিজ্যনে" বিভক্ত ছিল "স্বদেশী" রোমাণ ফৌজ। আর ২৫ "লিজ্যন" ছিল "আক্‌সিলিয়া" বা সহকারী ফৌজের। সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নানা জনপদ হইতে এই সকল "আক্‌সিলিয়া"র আমদানি হইত। বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত "ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিস ট্রুপ্‌স্‌" নামক ভারতীয় রাজরাজড়াদের পল্টনের সঙ্গে রোমাণ সাম্রাজ্যের "আক্‌সিলিয়া"র সদৃশ্য আছে।

রাম্‌জে-প্রণীত "রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব" গ্রন্থে [লণ্ডন, ১৮৯৮] দেখি যে, তিবেরিয়ুসের তাঁবে সর্ব্বসমেত ৩২০,০০০ ফৌজ ছিল। বুঝিতে হইবে যে,

মৌর্য্য সেনাপতিরা একসঙ্গে দুই দুইটা রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টনের চেয়েও বেশী বহরওয়ালা সেনা চালাইবার ক্ষমতা রাখিতেন।

সমর-শাসনে মৌর্য্য সাম্রাজ্য

[১]

এই বিপুল পল্টনের খোর পোষ জোগানো মুখের কথা নয়। ফৌজদের শিক্ষাবিধান, তাহাদের শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যের আয়োজন করা আর যথা-সময়ে তাহাদিগকে সেনাপতিদের হুকুম তামিল করাইতে অভ্যস্ত রাখা অসাধারণ রণ পাণ্ডিত্যের এবং শাসন-দক্ষতার পরিচয়। বর্ত্তমান যুগের উড়ো জাহাজ, ডুবো জাহাজ, গ্যাসবিষ ইত্যাদির আবহাওয়ায়ও যে ধরণের সমর-শাসন বিষয়ক পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা দরকার হয়, সেকালের ইয়োরোপে এবং ভারতে ঠিক সেইরূপই দরকার হইত। হিন্দু সেনাপতিরা পল্টন গড়িবার এবং চালাইবার কাজে জগতের অন্যতম নং ১ শ্রেণীর বীরপুরুষ। তুলনামূলক সমর-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে।

পল্টনের জন্য মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রজারা কত টাকা করিয়া বার্ষিক খাজনা দিত, সে কথা জানা যায় না। সমর-বিজ্ঞান মৌর্য্য রাজস্বের শতকরা অনেক অংশ হজম করিত সন্দেহ নাই। সামরিক শক্তিযোগ রক্ষা করিতে হইলে টাকা খরচ করিতে হয়। বিনা পয়সায় "পাক্‌স্ সর্ব্বভৌমিকা" বা "বিশ্বশান্তি" স্থাপিত হইতে পারে না।

মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন, ফৌজেরা সরকারী খরচে জীবন ধারণ করিত। লড়াইয়ের জন্য চোপর দিন রাতই তাহারা প্রস্তুত থাকিত। আরিয়াণ বলেন, হিন্দু ফৌজেরা বেশ মোটা হারে বেতন পাইত। নিজেদের খরচ পত্র চালাইয়াও তাহারা অন্যান্য লোকজনের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হইত। অর্থাৎ মৌর্য্যেরা চর্ব্ব্য চোষ্য দিয়া পল্টনকে তোআজ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

[২]

সমর-বিভাগের শাসন সম্বন্ধে মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্য অনুসারে বলিতে হইবে যে পাটলিপুত্রের নগর-শাসন বিষয়ক প্রণালীই কায়েম করা হইয়াছিল। ত্রিশ জন ওস্তাদের এক সঙ্ঘ বাহাল ছিল। পাঁচ পাঁচ জন করিয়া ওস্তাদ এক এক উপ-সভায় বসিয়া সামরিক ধান্ধাগুলা নির্ব্বাহ করিতেন। এই রূপ উপ-সভা ছিল ছয়টা।

এক উপসভার তাঁবে ছিল স্থল-সেনা এবং জল-সেনার ভার। জল-সেনার সংখ্যা অথবা অন্যান্য খবর পাওয়া যায় না।

রসদ জোগানো সংক্রান্ত সকল কাজ দ্বিতীয় উপসভার অধীনে পরিচালিত হইত। বলদের গাড়ীগুলা এই উপসভার তদবিরে থাকিত। লড়াইয়ের যন্ত্রপাতি, ফৌজের খোরাক, হাতী ঘোড়ার খোরাক এবং অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম বহিবার জন্য এই সকল গাড়ী ব্যবহৃত হইত। ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার লোক, ঘোড়ার সহিস, ছুতোর মিস্ত্রী কামার চামার ইত্যাদি কারিকর সবই এই বিভাগের দায়িত্বে শাসিত হইত। যথা সময়ে যথানির্দ্দিষ্ট কাজ করাইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইত।

পদাতিকদের তদবির করিবার জন্য এক উপ-সভার উপর দায়িত্ব ছিল। ঘোড়সওয়ার, রথ, এবং হাতী-সওয়ারও তিন স্বতন্ত্র উপ-সভায় শাসিত হইত।

ঘোড়ার আস্তাবল আর হাতীর আস্তাবল স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত হইত। অস্ত্রশস্ত্রের গুদামে ফৌজেরা নিজ নিজ হাতিয়ার ফিরাইয়া দিত। আস্তাবলে ঘোড়া এবং হাতী সমঝাইয়া দিবার দস্তুরও ছিল।

লড়াইয়ের মাঠে যাইবার সময় ঘোড়া দিয়া রথ টানানো হইত না। ঘোড়া লইয়া যাওয়া হইত ধীরে ধীরে দড়িতে বাঁধিয়া। যাহাতে বাজে

কাজে ঘোড়ার তেজ না কমিয়া যায় সেই দিকে সমর-বিভাগের দৃষ্টি থাকিত। বলদের সাহায্যে রথগুলা মাঠে পৌঁছিবার পর ঘোড়ার লাগামে জুতিয়া রথের উপর যোদ্ধারা বসিত।

এই সমস্ত খবরই মেগাস্থেনিসের "ইন্দিকা" গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্দ্ধন-ভারতের চীনা বিবরণের মতন মৌর্য্যভারতের গ্রীক বিবরণও বাস্তব এবং চাক্ষুস বলিয়াই বোধ হয়।

পরিশিষ্ট নং ৫

"সাহিত্যে" হিন্দু সমর-শাসন

[১]

১৮৮৯ সালের আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় হপকিন্‌স্ মহাভারত হইতে বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু সেনা-শাসন বিষয়ক সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের মতন অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও হিন্দু সমর যোগের খুঁটিনাটি বর্ণিত আছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে [২৭ অধ্যায়] অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেখিতে পাই। মনুসংহিতা, শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থেও ফৌজ-বাছাই হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাবিভাগের প্রায় সকল তথ্যই অল্প বিস্তর আছে। তাহা ছাড়া "ধনুর্ব্বেদ" নামক সাহিত্য ত আছেই।

এই সকল "সাহিত্যে"র বচন উদ্ধৃত করিয়া মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্বামী "প্রাচীন ভারতে যুদ্ধকাণ্ড" নামক পুস্তিকা [মান্দ্রাজ ১৯১৫] প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসন" নামক ইংরেজি গ্রন্থেও [লণ্ডন, ১৯১৭] "শাস্ত্র"-সাহিত্যের নজির অনেক আছে। সম্প্রতি হিল্লব্রাণ্ট-প্রণীত "আল্ট্-ইণ্ডিশে পোলিটিক" অর্থাৎ "প্রাচীনভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব" নামক গ্রন্থেও [য়েনা ১৯২৩] এই ধরণের সমর বিষয়ক সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থে এই ধরণের সাহিত্য এখনো বিনা সন্দেহে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মনু, মহাভারত, শুক্র ইত্যাদির বচন কোন্ রাজবংশ সম্বন্ধে খাটে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে অসমর্থ বলিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনো অধ্যায়েই প্রাচীন ভারতীয় "সাহিত্যের"

প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে না। হিন্দু সমর-শাসন সম্বন্ধও কোনো সাক্ষ্য এই সকল গ্রন্থ হইতে লওয়া হইল না।

[২]

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের শাসন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এক বস্তু, আর রাষ্ট্র সম্বন্ধে মত, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে চিন্তা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক উপদেশ আর এক বস্তু। প্রথম কথা ইতিহাসের অন্তর্গত। দ্বিতীয় কথা দর্শনের অন্তর্গত।

ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থের রাষ্ট্র-বিষয়ক অধ্যায় এবং শ্লোকগুলাকে সম্প্রতি রাষ্ট্রসম্বন্ধে হিন্দু মত, হিন্দু-চিন্তা অথবা হিন্দু দর্শন রূপে গ্রহণ করিতেছি। এই "দর্শনে"র আলোচনার ভিতর "আদর্শ" কতখানি অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার, "ভবিষ্য-বাদে"র জল্পনা কল্পনা এবং ভাবুকতা কতখানি আছে কে জানে? আবার এই "দর্শনে"র উপর যে বাস্তব ইতিহাসের দাগ বা ছায়া নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে?

যত দিন পর্য্যন্ত "সাহিত্য" গ্রন্থের "ইতিহাস বনাম দর্শন" মামলা নিষ্পত্তি না হয়, ততদিনপর্য্যন্ত হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার সময় এই সমুদয়ের আওতা হইতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"কে মৌর্য্য-ভারতের আবহাওয়ায় ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠিবে,—লড়াই সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে সকল কথা আছে সে সব কি চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক ইত্যাদির সেনাপতিরা মানিয়া চলিতেন? না জার্ম্মাণ সমর-পণ্ডিত ক্লাউজেহ্বিট্স্ প্রণীত "সমর" নামক গ্রন্থ অথবা ইংরেজ সেনাপতি হ্বাল্থাম প্রণীত "প্রিন্সিপ্ল্স অব্ ওয়ার" অর্থাৎ "সমর-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ [লণ্ডন ১৯১৪] ইত্যাদির মতন

"অর্থশাস্ত্রে"ও সঙ্কলনকর্ত্তার স্বাধীন মতামত আলোচিত হইয়াছে? মৌর্য্যশাসনের দোষগুণ "সমালোচনা" করিবার দিকে কৌটিল্যের মাথ একদম খেলে নাই কি?

যাহা হউক, "অর্থশাস্ত্রে" সমর সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও মতামত আছে, সেই বিষয়ে বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারের একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। রণ-নীতি যাহাদের দখলে নাই তাঁহারা কৌটিল্য বুঝিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু রাষ্ট্রের শাসনাধ্যক্ষ

"পাক্‌স্‌ সার্ব্বভৌমিকা"র শাসন-যন্ত্র

সমর-বিভাগ রাষ্ট্রমাত্রেরই এক বড় কর্ম্মকেন্দ্র। শাসন-যন্ত্রের আর এক বড় বিভাগ হইয়েছে আজ কাল যাহাকে বলে "সিহ্বিল সার্হ্বিস"। এই শাসন-বিভাগের নাম হিন্দুরাষ্ট্রের বিভিন্ন আমলে বোধ হয় বিভিন্ন ছিল।

কৌটিল্যের কথায় এই বিভাগকে "কর্ম্মস্থান" বা "তীর্থ" বলিতে পারি। কর্ম্মস্থান বা তীর্থের কর্ত্তাদিগকে "অধ্যক্ষ" বলা হইয়াছে। আজকালকার ভারতের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার ও লাট সাহেব কৌটিল্যের পারিভাষিকে ছোট বড় মাঝারি "কর্ম্মস্থানের অধ্যক্ষ।" বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সকল চাকুরেকে "শাসনাধ্যক্ষ" বলা হইতেছে। সোজাসুজি "রাজকর্ম্মচারী" শব্দ কায়েম করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে স্বরাজ বনাম সাম্রাজ্য প্রশ্ন তুলিয়াছি। সমস্যাটা এই—পল্লীতে, "শ্রেণী"তে, নগরে এবং অন্যান্য জীবন-কেন্দ্রে হিন্দু নরনারীর আত্মকর্ত্তৃত্ব সাম্রাজ্যের তরফ হইতে বাধা পাইত কতটা? "সার্ব্বভৌম"দের শাসনযন্ত্রটা বিশ্লেষণ করিবার সময় সেই সমস্যার দিকে লোক রাখিতে হইবে, কেন না "কেন্দ্রীকরণ"ই "পাক্‌স্‌ সার্ব্বভৌমিকা"র অর্থাৎ বিশ্বশান্তির গোড়ার কথা।

সাম্রাজ্যশাসনে ওস্তাদ ছিল সেকালের রোমাণ জাতি। ইয়াঙ্কি পণ্ডিত ফ্র্যাঙ্ক প্রণীত "রোমাণ ইম্পিরিয়্যালিজম্‌" বা "রোমাণ সাম্রাজ্যবাদ" নামকগ্রন্থ [নিউ ইয়র্ক, ১৯১৪] বর্ত্তমান আলোচনায় কাজে লাগিবে।

পরবর্ত্তী কালে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাও কেন্দ্রী-করণ কাণ্ডে চরমে গিয়া ঠেকিয়াছিল। এই কারণে ব্রিসো-প্রণীত "ফরাসী শাসন-বিষয়ক আইনের ইতিহাস" গ্রন্থের তথ্য হইতে মাপকাঠি আনিয়া "হিন্দু "শাসনাধ্যক্ষ"দের আফিসী কায়দাকানুন বা "কর্ম্মস্থান"-নীতি মাপিয়া দেখা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্য অতি আধুনিক। তাহার ব্যবস্থা আলোচনা করিবার দরকার নাই।

চোল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীকরণ

[১]

তামিল তাম্রশাসনের সাহায্যে নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর চোল-মণ্ডল বিষয়ক "পাব্লিক ল" বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার প্রণীত "প্রাচীন ভারত" গ্রন্থে জানিতে পারি যে, চোল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে এক জন করিয়া "লাট সাহেব" বাহাল থাকিতেন। ঐ সকল প্রদেশের পুরাতন রাজবংশের বংশধরদিগকে "লাট সাহেব" করা হইত। অথবা চোল বাদশাদের বংশধরেরা সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রদেশে প্রদেশে "শাসনাধ্যক্ষ" হইতেন। সাধারণতঃ রাজার খুড়ো জ্যাঠা ভাই বা ছেলে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পদে বাহাল থাকিতেন।

সদরে দলিল দস্তাবেজের দপ্তরখানা ছিল। তাল পাতায় লেখা পুঁথির আকারে সরকারী হুকুম এবং আইন কানুন সংগৃহীত করা হইত। সদরের হুকুমসমূহ পল্লীতে পল্লীতেও যথারীতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। পল্লী স্বরাজের "মহাসভা" এই সমুদয় কাগজপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিম্মা লইত। বাদশা রাজরাজের [৯৮৪-১০১৮] আগেও এইরূপ দপ্তর-খানার রেওয়াজ ছিল।

[২]

পল্লী-শাসনের উপলক্ষ্যে দেখা গিয়াছে যে, "অধিকারিণ্" এবং "সেনাপতি" এই দুই কর্ম্মচারী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে পল্লীতে মোতায়েন থাকিতেন। বলা বাহুল্য, একজন মামুলি এবং অপর জন সামরিক শাসনের ধুরন্ধর। পল্লী-স্বরাজে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ ঘটিত নানাক্ষেত্রে।

পল্লী-সভাগুলার আয় ব্যয় পরীক্ষা করা ছিল এই দুই শাসনাধ্যক্ষের কাজ। তাঁহাদের আদেশ বা নির্দ্দেশ অনুসারে পল্লী-স্বরাজের মাতব্বরেরা খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করিত। তাঁহারা পল্লী-পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইতেন। টাকা পয়সা সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেক সার্ব্বজনিক কাজেই ইহারা নাক গুঁজিতে অধিকারী ছিলেন। কোন্ বাবদ কত টাকা খরচ করা হইবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াও ইঁহাদের এক্তিয়ারের অন্তর্গত ছিল।

পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরা একবার আয়-ব্যয়ের গড়মিল আবিষ্কার করিয়া বসেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা স্বরাজের "মহাজন"দিগকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করেন। বাদশার হুকুম এবং দলিল মাফিক আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন পল্লী-স্বরাজকে এই প্রশ্নের জবাবদীহি হইতে হইয়াছিল।

[৩]

রাজস্ব সংগ্রহ করা স্বরাজের এক অঙ্গ সন্দেহ নাই। রাজস্বের খরচ সম্বন্ধে আত্ম-কর্ত্তৃত্বও অন্য অঙ্গ। কিন্তু এই দুই বিষয়ে চোল পল্লীগুলা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণ খুব বেশী সহিতে বাধ্য হইত এইরূপ বিশ্বাস হয়।

সার্ব্বভৌমিক শান্তি অর্থাৎ "জাতীয় ঐক্য"ও চাই, আবার জনপদগত স্বতন্ত্রতা বা পল্লী-স্বরাজও চাই, অর্থাৎ শ্যাম ও কুল দুইই রক্ষা করা সে-

কালের রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্ভবপর হইত না। একালেও এই দুই কুল এক-সঙ্গে রক্ষা করা কঠিন।

পল্লীর লোকেরা সমগ্র দেশের শাসনে "প্রতিনিধি" পাঠাইয়া আজ-কালকার দিনে স্বরাজে ও সাম্রাজ্যে একটা "রফা" কায়েম করিতে পারিয়াছে মাত্র। সেকালে এই রফার সুযোগ ছিল না,—না চোল সাম্রাজ্যে, না রোমাণ সাম্রাজ্যে, না বুর্বোঁ সাম্রাজ্যে।

শাসনাধ্যক্ষদের বেতন।

চোল সাম্রাজ্যের শাসনাধ্যক্ষেরা টাকায় বেতন পাইতেন কিনা সন্দেহ। জমির টুকরা বোধ হয় বেতন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। অথবা সংগৃহীত খাজনার কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশ কর্ম্মচারীর বার্ষিক বৃত্তিরূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

য়ুয়ান-চুয়াঙ্ "সি-য়ুকি"তে বলিয়াছেন যে হর্ষবর্দ্ধনের মন্ত্রী, লাট-সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা জমি পাইতেন। জমির আয়ই ছিল তাঁহাদের বেতন। এই গেল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উত্তর-ভারতের কথা।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা জানিতে পারি ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই চীনা পণ্ডিত ভারতে ছিলেন। হিন্দু-রাষ্ট্রের শাসনাধ্যক্ষেরা দেশের নরনারীর উপর জুলুম চালাইত না এইরূপ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সরকার হইতে নিয়মিত বৃত্তি রাজ-কর্ম্মচারীদের জুটিত। কিন্তু মুদ্রা গুণিয়া বেতন দেওয়া হইত কি জমির টুকরা অথবা রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট অংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে ফা-হিয়ান কোনও খবর দেন নাই।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের চাকুরেরা বেতন পাইতেন বোধহয় টাকায়। "অর্থ-শাস্ত্রের" কোন কোন অংশকে এই রাষ্ট্রের বাস্তব বৃত্তান্ত বলিয়া

স্বীকার করিয়া লইলে এইরূপই মনে হইবে। কৌটিল্যের গ্রন্থে (৫।৩) বেতনের হার খুবই মোটাও বটে। মামুলি ফৌজের বার্ষিক বেতন ছিল ৫০০ পণ অর্থাৎ আজকালকার ৩৭৫৲। সেনাপতি বাহাদুরকে দিবার ব্যবস্থা ছিল বার্ষিক ৪৮,০০০ পণ অর্থাৎ ৩৬,০০০৲। "লাটসাহেব," থাজাঞ্চি বিভাগের কর্ত্তা এবং বড় বড় মন্ত্রীরাও এই বেতন পাইতেন। আজকালকার তুলনায় খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে টাকার ক্রয়-শক্তি অনেক বেশী ছিল মনে রাখিতে হইবে।

অশোকের সাম্রাজ্য-সাধনা।

মৌর্য্যরা পল্টন রাখিত লম্বা চৌড়া। তাঁহাদের ফৌজেরা "তঙ্খা" পাইত বেশী বেশী। রাজকর্ম্মচারীদের "তলব" জুটিতও বেশ পুরু। ভারতীয় ঐক্য অথবা সার্ব্বভৌমিক শান্তি কায়েম করিবার সকল কায়দাই মৌর্য্যদের জানা ছিল। এইবার শাসন-যন্ত্রের "কর্ম্মস্থান"গুলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

অশোক যখন বাদশা (খৃঃ পূঃ ২৬৯-২৩২], তখন ভারত-সরকার চারজন "লাটসাহেবের" অধীনে শাসিত হইত। সহজে এই চারজন শাসনাধ্যক্ষকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি বা "ভাইসরয়" বলা চলে।

সসাগরা পৃথিবী যে অশোকের পদতলে এ জ্ঞান তাঁহার ছিল টনটনে। সার্ব্বভৌম বা চক্রবর্ত্তীর সমস্যা গুলা অশোকের মাথায় সর্ব্বদাই কিলবিল করিত। শাসন-যন্ত্রটাকে চোপরদিন রাত কর্ম্মক্ষম রাখিবার জন্য তাঁহার চোখে ঘুম আসিত না বলা যাইতে পারে। পাহাড়ের গায়ে, স্তম্ভের গায়ে যে সকল কথা অশোক খোদাইয়া রাখিয়াছেন, সেই গুলাকে তাঁহার সাম্রাজ্য-শাসন বিষয়ক চিন্তাসমষ্টি বা প্রবন্ধ-মালা বুঝিতে হইবে।

সাম্রাজ্যের সমস্যা, সাম্রাজ্য-বাদ, সার্ব্বভৌমের দায়িত্ব ইত্যাদি বস্তু কি? অশোককে জিজ্ঞাসা করিলে সহজেই জবাব পাই। নং৪ স্তম্ভের অনুশাসনটা দেখা যাউক। অশোক বলিতেছেন :—"আমি চাই শাসনে ঐক্য আর চাই দণ্ডবিধানে সামঞ্জস্য।" এই লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করাই ছিল বাদশার অন্যতম সাধনা। পল্লী-স্বরাজ, শ্রেণী-স্বরাজ ইত্যাদি জনগণের আত্মকর্তৃত্বের কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অশোক কিরূপ চিন্তা করিতেন? তাঁহার বক্তৃতা বা প্রবন্ধ গুলার ভিতর বোধ হয় এই বিষয়ে কোনো কথা "সজ্ঞানে" বলা হয় নাই।

সাম্রাজ্যিক ঐক্য সম্বন্ধে লক্ষ্য প্রচার করিয়াই অশোক থামেন নাই। এই বাদশা ছিলেন "অপ্পমাদ" বা কর্ম্মযোগের অবতার। পাহাড়ের গায়ে তিনি লাট সাহেব হইতে চুনো পুঁঠি পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মচারীকেই কর্ম্মযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যেরা সকলে তাঁহার কথা শুনিয়াছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু অশোক নিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া "পাব্লিক-ল" অর্থাৎ শাসন-বিষয়ক আইনের কাজ কর্ম্ম চালাইতে অভ্যস্ত ছিলেন।

বাদশাহী করিবার সময় অশোক চাকরি করিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। পূর্ব্ব প্রদেশের লাট সাহেবই ছিলেন তিনি নিজে অর্থাৎ অন্যান্য তিন প্রদেশের ভাইসরয় বা লাট সাহেব স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে যে পরিমাণে যত খানি খাটিতে হইত অশোকও পাটলিপুত্রের "কর্ম্মস্থান" হইতে নিজ এলাকার শাসনভার বহিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণে তত খানি খাটিতেন।

"লাট সাহেবি" করা অশোকের পক্ষে একটা নূতন কিছু নয়। কেননা বাদশা হইবার পূর্ব্বেই তিনি উত্তর অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই লাটসাহেবির "কর্ম্মস্থান" ছিল তক্ষশিলায়। যৌবনের "অ্যাপ্রেন্টিসি" বা শিক্ষানবীশি অশোককে "সাম্রাজ্য-যোগে" অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের সাধনায় অনেকটা পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

মৌর্য্যদের শাসন-যন্ত্র

[১]

অশোকের অনুশাসন গুলা ছাড়াও মৌর্য্য সাম্রাজ্য-সাধনার অন্যান্য সাক্ষ্য আছে। কৌটিল্য-বিবৃত আঠার "তীর্থ" বা "কর্ম্মস্থানে"র কথা সম্প্রতি তুলিব না। মেগাস্থেনিসের বৃত্তান্তটাই ঘাঁটা যাউক।

মৌর্য্য শাসনাধ্যক্ষদের কাজ ছিল নানাবিধ। নদী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ানো তাহাদের অন্যতম ধান্ধা। জমি জরীপ করিবার জন্য এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল। কৃত্রিম খাল কাটা এবং তদারক করা আর এক শ্রেণীর অধ্যক্ষের অধীন। বড় খাল হইতে জল আনিয়া ছোট খালে চালান করিবার ব্যবস্থা ছিল। জনগণ যাহাতে সকলেই সমান হিস্সা পায় তাহার দিকে কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি থাকিত।

বনবিভাগের কর্ম্মচারী ছিল স্বতন্ত্র। শিকারীদের সঙ্গে লেনদেন চলিত এই সকল কর্ম্মচারীর সাহায্যে।

খাজনা আদায় করিবার ভার ছিল এক শ্রেণীর অধ্যক্ষের হাতে। জমিজমা লইয়া সকল প্রকার কাজকর্ম্ম নিষ্পত্তি করিবার জন্য এক দল কর্ম্মচারী বাহাল থাকিত। ছুতার মিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি কারিগরদের সঙ্গে লেনদেন চালাইবার জন্যও শাসনাধ্যক্ষ্য ছিল।

সড়ক তৈয়ারি করা মৌর্য্য কর্ম্মচারীদের অন্যতম ধান্ধা থাকিত। প্রত্যেক দশ "স্তাদিয়া" (এক মাইলের কিছু বেশী) অন্তর অন্তর এক একটা স্তম্ভ গাড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এই স্তম্ভে দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। আশে পাশের সড়ক গলি সম্বন্ধেও খবর দেওয়া থাকিত।

[২]

ষ্টাইনের আপত্তি সত্ত্বেও বলিব যে, এই সকল গ্রীক-বিবরণের সঙ্গে "অর্থশাস্ত্রে"র অনেক কথার মোটামুটি এবং চলনসই মিল আছে। মেগাস্থেনিস যে সকল বিষয়ে আংশিক খবর দিয়াছেন কৌটিল্যের বৃত্তান্ত হইতে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া লওয়া চলে। কিন্তু সম্প্রতি সে দিকে ঝুঁকিব না। কৌটিল্যের ভাণ্ডারে তথ্য এত বেশী যে সে জন্য এক খানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ আবশ্যক।

তবে এই খানে দুই একটা তথ্যের দিকে দৃষ্টি ফেলা আবশ্যক। মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্য অনুসারে পাটলিপুত্রের শাসন-কাণ্ডে দেখিয়াছি, এক উপ-সভা আদমসুমারির ধান্ধায় মোতায়েন ছিল। সেই আদম সুমারির কথা "অর্থশাস্ত্রে" বিশদ রূপে বিবৃত আছে।

মেগাস্থেনিস বোধ হয় পল্লী-শাসন সম্বন্ধে কোনো খবর দেন নাই। কৌটিল্য এই বিভাগের কথায় "গোপ"-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন। গোপ বাদশার লোক,—পল্লীতে মোতায়েন, পল্লীবাসীদের কেহ নন। এই পর্যন্ত পরিষ্কার।

গোপদের নানা কাজের এক কাজ হইতেছে আদম সুমারি, লোক-গণনা, পশু-গণনা ভূমি গণনা। অর্থাৎ নরনারী আর সম্পত্তি সম্বন্ধে যা-কিছু গুণা সম্ভব সবই গুণিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক পরিবারের আয়ব্যয়, জমি জমা, ধনদৌলত, দাসদাসী, পশুপাখী, খাজনার হার কিছুই বাদ পড়িত না।

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া ইংরেজিতে আলোচনা করিয়াছেন। "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" নামে সেই গ্রন্থের তর্জ্জমা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে [কলিকাতা

১৯২৩]। মৌর্য্যদের শাসন-যন্ত্রটা বুঝিবার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করা গেল মাত্র।

হিন্দু শাসনে "ডোমস্‌ডে" জরীপ

বর্ত্তমান যুগের সাম্রাজ্যের মতনই মৌর্য্য সাম্রাজ্যেরও নরনারীর জীবনকে প্রত্যেক রন্ধ্রের ভিতর গিয়া স্পর্শ করিত। এইরূপ বুঝিতে কোন গোল বাধিতেছে না। শাসন-যন্ত্রটাকে যারপর নাই লম্বা চওড়া ও গভীর—এক কথায় সর্ব্বব্যাপী—করিয়া রাখা ছিল মৌর্য্য বাদশাদের সাধনা।

এই ধরণের কেন্দ্রী-করণ রোমাণ সাম্রাজ্যে ত ছিলই। ইংলণ্ডের একাদশ শতাব্দীতেও এই প্রয়াস দেখিতে পাই। "গোপ"কে মৌর্য্য ভারতের নিম্নতম শাসনাধ্যক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অতএব বলা যাইতে পারে যে,—মৌর্য্য ভারতের সাম্রাজ্য-বাদই নরম্যান রাজ হ্বিলিয়ামের মাথায় খেলিতেছিল যখন তিনি ১০৮৬ সালে বিলাতের "গেল্ডেব্‌ল্‌" বা ট্যাক্‌স্‌-যোগ্য সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হন।

"ডোম্‌স্‌ডে বুক" নামক বিলাতী দলিল ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে অজানা নাই। হ্বিলিয়ামের শাসনাধ্যক্ষেরা পল্লীতে পল্লীতে যে সকল প্রশ্ন করিয়া বেড়াইত, নিম্নে তাহার কয়েকটা প্রদত্ত হইতেছে:—এই 'মানর-"জমিটার নাম কি? রাজা এডোয়ার্ডের আমলে এটা কার দখলে ছিল? আজকাল এর মালিক কে? কয় বিঘা জমি? মানরের মালিক-বাবুর হাল আছে কয়টা? কয়টা হালই বা "হ্বিলেইন," "কোটার" দাস, স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দাস এবং "সোকম্যান"দের? বনভূমি কতটা? ময়দান কতটা? আটা ভাঙবার কল, মাছ ধরবার আড্ডা ইত্যাদি কয়টা? জমির আয় আগে কত ছিল? এখনই বা কত? আয় বাড়ানো সম্ভবপর

কিনা ? মাইট্‌ল্যাণ্ড প্রণীত "ডোম্‌স্‌ডে বুক অ্যাণ্ড বেঅণ্ড্" নামক গ্রন্থ (কেম্ব্রিজ ১৮৯৭) ভারতীয় গবেষকদের কাজে লাগিবে।

বিলাতের নরনারীকে "শোষণ" করিবার জন্য রাজা বাহাদুর এই সকল বিষয়ে জবাব চাহিয়াছিলেন। নিভৃততম পল্লীও যাহাতে সদরের দপ্তর-খানার আওতায় থাকিতে পারে এই ছিল হ্বিলিয়ামের লক্ষ্য। ফ্রান্সে চলিতেছিল এই যুগে "ফিউদারি-প্রথার" বাড়াবাড়ি,—জমিদারদের স্বরাজ অর্থাৎ সদরের ক্ষমতা লোপ। ইংরাজ জাতিকে গোলাম করিয়া বিলাতের গদিতে বসিবা মাত্রই ফরাসী হ্বিলিয়াম ফ্রান্সে প্রচলিত নীতির উল্টা নীতি কায়েম করিলেন। "ডোম্‌স্‌ডে বুক" একাদশ শতাব্দীর বিলাতী কেন্দ্রী-করণ বা সাম্রাজ্য সাধনার মস্ত সাক্ষী। কৌটিল্যের গোপ এই ধরণের "কেতাব" বার চোদ্দশ বৎর পূর্ব্বেই ভারতে তৈয়ারি করিতেছিল।

[২]

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শাসন-দক্ষতা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কোনো প্রভেদ নাই, এই তথ্য তাহার অন্যতম প্রমাণ। যাহা হউক, "ডোম্‌স্‌ডে বুকের" মতন অনুসন্ধান একাদশ শতাব্দীতেই, এবং ঠিক ১০৮৬ সালেই,—চোল সাম্রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১১৮) তখন বাদশা। সমগ্র চোলমণ্ডলের জরীপ করানো হয়। খাজনার হার পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হার বাড়িয়া গিয়াছিল, কোন কোন স্থানে হার কমাইবার কথাও তামিল "লিপি"তে দেখিতে পাই!

চোল সার্ব্বভৌমেরা সাম্রাজ্যের আর্থিক তথ্য সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। এই ঘটনার একশত বৎসর পূর্ব্বেও,—৯৮৬ খৃষ্টাব্দে—সম্রাট রাজরাজ একবার জমিজমার মাপজোক

করাইয়াছিলেন। মাদ্রাজীরা মাপজোকের অঙ্কে অতি পাকা লোক। রাজরাজ বাদশার জরীপাধ্যক্ষেরা এক বর্গ ইঞ্চের $\frac{১}{৪০০০০}$ অংশ সম্বন্ধেও জিম্মাদারি লইয়াছিল। বুঝিতে হইবে মাপাজোকা খুবই নির্ভুল ভাবে চালানো হইয়াছিল।

জমিজমার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুই বিধান দেখিতে পাই। সে সব কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এইটুকু বুঝিয়া রাখা দরকার যে, কি মৌর্য্য আমলে কি চোল আমলে হিন্দু নরনারীর উপর সদরের কেন্দ্রী-করণ বা ঐক্যবিধান খুব চাপিয়া বসিয়াছিল। মৌর্য্যেরা এবং চোলেরা নামে মাত্র বাদশাহী করিতেন না। প্রতিদিনের প্রত্যেক উঠা-বসায় মৌর্য্যভারত এবং চোল ভারত সার্ব্বভৌমিক শান্তির আবহাওয়া চাখিতে অভ্যস্ত ছিল। যতখানি সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় ততখানি সম্বন্ধে এই কথা নির্ব্বিবাদে বলিতে হইবে।

সড়কের রাষ্ট্রনীতি

আদম সুমারির কাজে মোতায়েন থাকিয়া হিন্দুশাসনাধ্যক্ষেরা পল্লী-গুলাকে সদরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে সাহায্য করিতেন। জমি জরীপের দ্বারাও সহরে মফঃস্বলে ঐক্য গ্রথিত হইত। এইবার সার্ব্বভৌমিক শাসন-যন্ত্রের আর এক কায়দার কথা বলিতে হইবে। সে সড়কের রাষ্ট্রনীতি।

রোমাণ সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরেরা সড়কের রাষ্ট্রনীতিতে পাকা ছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রবীরেরাও যুগে যুগে সড়কের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন জনপদকে পরস্পরের লাগালাগি করিয়া রাখা ছিল তাঁহাদের এক ধান্ধা। কি সেনার গতিবিধি, কি ব্যবসাদারদের চলাফেরা, কি শাসনা-ধ্যক্ষদের যাওয়া আসা, সবই এই সড়কের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। বিনা

সড়কে রাজ্য চলে না। এই কথাটা মৌর্য্যদের মাথায় খুব গভীর ভাবে বসিয়াছিল। চোল বাদশারাও এই সড়ক-তত্ত্বে ওস্তাদ ছিলেন।

চোল মণ্ডলের এক "রাজপথের" কথা জানা গিয়াছে। উড়িষ্যার মহানদীর কিনারা হইতে সমুদ্রের উপকূলে উপকূলে ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে কোত্তারু পর্য্যন্ত এই সড়ক বিস্তৃত ছিল। লম্বালম্বি সড়কটা ছিল ১২০০ মাইল। কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১১৮) বাদশার আমলে এই সড়ক তৈয়ারি করা হয়।

চোল সড়ক-নীতির কয়েকটা তথ্য উল্লেখ যোগ্য। কুলোত্তুঙ্গকে সাম্রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ সীমানায় লড়াই চালাইতে হইয়াছিল। রণ-নীতির খাতিরেইএই সড়ক তৈয়ারি করিবার দরকার পড়ে। সড়কের ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে কুলোত্তুঙ্গ চাষীদের উপনিবেশ বসাইয়াছিলেন। চাষীরা বাস্তবিক পক্ষে ছিল পণ্টনের লোক। সেনাপতিরা এই সকল উপনিবেশের মালিক ছিলেন। তাঁহাদের অধীনস্থ ফৌজ এই সকল কেন্দ্রে চাষবাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সড়ক-রক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে মোতায়েন থাকিত। কুলোত্তুঙ্গের সড়ক-কাণ্ডে সেকালের রোমাণ উপনিবেশ-নীতি মনে পড়িতে বাধ্য।

এই গেল দক্ষিণ ভারতে একাদশ শতাব্দীর কথা। উত্তর ভারতের মৌর্য্য আমল সম্বন্ধে আরিয়াণ তাঁহার "ইন্দিকা" গ্রন্থে এই ধরণেরই সাক্ষ্য দিয়াছেন। পাটলিপুত্র হইতে আফগান সীমানা পর্য্যন্ত একটা সড়ক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সড়কটা ১১০০ মাইল লম্বা।

কাঠিয়াবাড়ের সুদর্শন হ্রদ

হিন্দুশাসনাধ্যক্ষদের প্রত্যেক কাজকর্ম্ম বিবৃত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। চাষ আবাদে সাহায্য করিবার জন্য হিন্দুরাষ্ট্র খাল কাটিত, হ্রদ

কাটিত, নদীর স্রোত ঘুরাইয়া দিত। মেগাস্থেনিস এই সব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের "রাজ তরঙ্গিণী" গ্রন্থে (৫।৯০-১১৭) নবম শতাব্দীর এঞ্জিনিয়ার সুয্যার কৃতিত্ব উল্লিখিত আছে। চোল সাম্রাজ্যে এবং সিংহলে খাল কাটার কাজ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার ডীকিন-প্রণীত "ইরিগেটেড ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোন" (লণ্ডন ১৮৯৩) নামক গ্রন্থে ভারতের এবং সিংহলের খালসম্পদ আলোচিত আছে। সবই প্রাচীন ভারতীয় "সিভিল সার্ভিস" ওয়ালাদের কীর্ত্তি সন্দেহ নাই।

সে সব কথা আলোচনা করিবার সময় নাই। রাষ্ট্র শাসনের তরফ হইতে মাত্র একটা জল সরবরাহের ব্যবস্থার উল্লেখ করিব। ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" অর্থাৎ "ভারতীয় লিপি" পত্রিকায় জানা যায় যে, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের আমলের এক "রাষ্ট্রিয়" গির্ণারে সুদর্শন হ্রদ কাটাইয়াছিলেন। গির্ণার কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত, গুজরাত প্রদেশে, আরব সাগরের সন্নিকটে। রাষ্ট্রিয়ের নাম পুষ্যগুপ্ত। তাঁহাকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশের লাটসাহেবের অধীনস্থ একজন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বলা যাইতে পারে।

অশোকের আমলে এই প্রদেশের লাট সাহেব ছিলেন তুষস্ক। এই সময়ে হ্রদের জল জমিনে জমিনে চালান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হ্রদের স্থানে স্থানে ছ্যাঁদা করিয়া খাল কাটা হয়। চাষীরা জল পাইতে থাকে।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য অবশ্য চিরকাল টিঁকে নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই মুল্লুক বোধ হয় কুষাণ সাম্রাজ্যের কোনো করদ রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে,ক্ষত্রপ রুদ্রদামন তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে দিয়া হ্রদটা মেরামত করাইয়া ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গে নিজ মন্ত্রীদের যে বচসা উপস্থিত হয় সে কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা গিয়াছে।

গির্ণার ফের এক বিপুল সাম্রাজ্যের এলাকায় আসে। সে গুপ্তদের আমলে। ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে বাদশা স্কন্দগুপ্ত সুদর্শনকে দ্বিতীয়বার মেরামত করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে ঐ অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন চক্রপালিত।

সুদর্শন সাগরের খবর পাওয়া যাইতেছে পূরাপূরি সাড়েসাত শ বৎসর ধরিয়া। দুইবার এই জনপদ পাটলিপুত্র হইতে শাসিত হইতেছিল। গির্ণার পাটলিপুত্র হইতে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। "পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিকা," বিশ্বশান্তি, সাম্রাজ্য-সাধনা বা ভারতীয় ঐক্য কাহাকে বলে সুদর্শন হ্রদের ইতিহাস হইতে সহজেই তাহা মালুম হয়। মফঃস্বলের উপর সদরের এক্‌তিয়ার কত বেশী আর শাসন-যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা কত নিরেট, তাহা বুঝিবার জন্য কষ্টকল্পনা করিতে হয় না।

"কর্ম্মস্থানে"র সিঁড়ি

কি দক্ষিণ ভারতের তামিল "লিপি," কি রুদ্রদামনের সংস্কৃত "লিপি", কি অশোকের পালি "লিপি", সকল লিপিতেই দেখিতেছি "কর্ম্মস্থান" বা আফিস গুলা ধাপে ধাপে উপর হইতে নীচে নামিত অথবা নীচ হইতে উপরে উঠিত। এইরূপ স্তর বিন্যস্ত সিঁড়ি-কাটা কর্ম্মস্থানের শৃঙ্খলাকে আজকালকার পরিভাষায় "হায়েরার্কি" বলে। এক কথায় মৌর্য্যগুপ্ত এবং চোল আমলের শাসনাধ্যক্ষেরা বিপুল "ব্যুরোক্রেসির" বিভিন্ন অঙ্গ ছিলেন।

"মর্ফলজি" বা রূপ তত্ত্ব বা গড়নের বিচারে এই হিন্দু "ব্যুরোক্রেসির" দোসর ঢুঁড়িয়া পাই ইয়োরোপের "মধ্যযুগে" এক মাত্র ফ্রান্সে। জার্ম্মানি চিরকাল "প্রাদেশিক স্বরাজের" মুল্লুক। বিস্মার্ক ১৮৭০সালে যে সাম্রাজ্যিক ঐক্য কায়েম করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আজও ব্যাভেরিয়া, স্যাকসনি ইত্যাদি প্রদেশ লড়িতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে জার্ম্মানিরা কোনো দিনই বড় গোছের কেন্দ্রী-করণ চাখে নাই।

ইতালি ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রাদেশিকতায়ই মজিয়াছিল। বহু-কেন্দ্রীকরণ বা জনপদগত স্বাধীনতা ছিল ইতালিয়ানদের মস্তর। ইংরেজ সমাজে একাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণ সুরু হয়। কিন্তু বহরে ইংল্যাণ্ড নেহাৎ ছোট। গুপ্ত সাম্রাজ্যের চার ভাগের একভাগও ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীকরণ নীতির তাঁবে আসিতে পারে নাই।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—ফরাসী জাতি ক্রমাগত ঐক্যবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হয়। তাহার চরম দেখিতে পাই চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে,—মন্ত্রিবর রিশলিয়োর তদবিরে। ফ্রান্স কোনদিনই গুপ্তসাম্রাজ্যের চৌহদ্দি লাভ করিতে পারে নাই সত্য। কিন্তু মধ্যযুগের ইয়োরোপে ফরাসী সাম্রাজ্যের সমান বিস্তৃত জনপদে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণ আর কোথাও ঘটে নাই।

যাহা হউক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে যুগে যুগে যে সকল সার্ব্বভৌমিক শাসনৈক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার একমাত্র ইয়োরোপীয় দৃষ্টান্ত রিশলিয়োর ফ্রান্স মনে রাখিতে হইবে। মৌর্য্য ভারত সেই ফ্রান্সের কম্‌সে কম্‌ পাঁচ গুণ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভিতরেই ইয়োরোপীয় সমাজে ভারতীয় "ব্যুরো-ক্রেসির" অনুরূপ শাসন-যন্ত্র কখনো দেখা যায় নাই কি? গিয়াছিল। সে খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর রোমাণ সাম্রাজ্যে। দিয়োক্লেসিয়ান এবং কন্‌স্তান্তিন তখন বাদশা। রাষ্ট্রীয় "রূপতত্ত্বের" আলোচনায় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তফাৎ করা সম্ভব নয়।

হিন্দু সাহিত্যে সাম্রাজ্য-চিন্তা

"সাহিত্যে"র সাক্ষ্য বাদ দিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইতেছে। কিন্তু একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা দরকার মনে করি। পূর্ব্বে একবার

বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র-সাহিত্যে "স্বরাজ" বা জনগণের আত্মকর্তৃত্বের কথা এক প্রকার পাওয়া যায় না। এখন বলিতেছি যে, ঠিক তার উল্টা দিকটাই গৌতম (১০।৪৬, ৪৭), আপস্তম্ব (২।১০, ২৬), মনু (৭।১১৫-১২২), শুক্র (১।৩৮১-৩৮৪ পংক্তি, ৫।১৬২-১৬৯ পংক্তি) ইত্যাদির গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে বিবৃত। মহাভারতেও সেই দিকই যার পরনাই প্রভাবশীল! এই সকল রচনায়,—রাজকর্ম্মচারীদের উপরওয়ালা হইতে পল্লীর নিম্নতম চাকর্যে পর্য্যন্ত যথোচিত ঠাঁই পাইয়াছেন।

কৌটিল্যের "অর্থ শাস্ত্রে"ও সিঁড়ি"র "হায়েরার্কি" জবরদস্ত। সামরিক হিসাবে ৮০০ পল্লীর কেন্দ্রে এক দুর্গ অবস্থিত। তাহার নাম "স্থানীয়"। চার শ পল্লীর কেন্দ্রে "দ্রোণ মুখ্য" দুর্গের অবস্থান। "খার্ব্বাটিক" দুর্গ ছিল দুই শত পল্লীর কেন্দ্রে। আর দশ দশটার কেন্দ্রে যে দুর্গ তাহার নাম "সংগ্রহণ"।

অর্থশাস্ত্রের সাম্রাজ্য-শাসনে অন্যান্য বিভাগও ঠিক এইরূপ সিঁড়ি-বিন্যাসেই অভ্যস্ত। পল্লীর বা দশ পল্লীর কর্ত্তা "গোপ"। বোধ হয় গোপের এলাকাকে "সংগ্রহণ" বলা চলিতে পারে! গোপের উপরওয়ালা হইতেছেন "স্থানীয়'। বোধ হয় স্থানীয়কে আজকালকার ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনার বিবেচনা করিতে হইবে। খাজনা, লোকগণনা ইত্যাদির তরফ হইতে "স্থানীয়ের" মাথায় ছিলেন "সমাহর্ত্তা"। ইনিই এই লাইনে সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। প্রাদেশিক লাটসাহেব বা ভাইসরয় সম্বন্ধে বোধ হয় "অর্থশাস্ত্রে"র বিধানে কোনো কথা নাই। যাহা হউক, গোপ হইতে বাদশার অমাত্য পর্য্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্র এক সুরে গাইতে বাধ্য,—এই কথা কৌটিল্যের প্রাণের কথা।

কাজেই বলিতে হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হিন্দুলেখকেরা স্বরাজতন্ত্রী ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী "ইম্পীরিয়্যালিষ্ট," "পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিকা"র ধুরন্ধর, জাতীয় ঐক্যের প্রচারক,—এক কথায় রিশলিয়্যোর এক গেলাসের ইয়ার তাঁহারা সকলেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচার ব্যবস্থা

খাজনা আদায় করা, খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, জমি জরীপ করা, দেশের ধনদৌলত গুণিয়া মাপিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, লোক সংখ্যা গণনা করা, এই সকল কাজ প্রত্যেক রাজ্যে বা সাম্রাজ্যেই দরকার হয়। তাহা ছাড়া শাসন-যন্ত্রের অন্য কতকগুলা দায়িত্ব আছে। তাহার জন্যও স্বতন্ত্র "কর্ম্মস্থান" বা "তীর্থ" বা আফিস চাই। সেই সকল আফিসের মাথায় "শাসনাধ্যক্ষ" ও চাই। এই সব কাজকে বিচার ব্যবস্থার অন্তর্গত করিতেছি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সঙ্ঘে সঙ্ঘে, অথবা ব্যক্তিতে সঙ্ঘে যত প্রকার মামলা উপস্থিত হওয়া সম্ভব সেই সবের নিষ্পত্তি করাই এই সকল শাসনাধ্যক্ষের ধান্ধা।

বর্ত্তমান গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদই তথ্য হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। কেননা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটা লিপি মাত্র লেখকের নজরে পড়িয়াছে। বিদেশী পর্য্যটকেরা ভারত বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দু আদালত বা বিচারালয়ের সংবাদ দিতে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই একমাত্র "সাহিত্যে"র নজির দিয়া হিন্দুরাষ্ট্রের এই শাসন-বিভাগ সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ষ্টাইন-প্রণীত "মেগাস্থেনিস ও কৌটিল্য" গ্রন্থে [ভিয়েনা, ১৯২] দেখিতে পাই যে, দিয়োদোরুস এবং স্ত্রাবো মৌর্য্য ভারতের জজ্ এবং আদালতের নাম মাত্র করিয়াছেন। কোনো বিবরণ নাই।

দক্ষিণ-ভারতের আদালত

তামিল "লিপি"র প্রমাণ অগ্রাহ্য করা চলে না। দ্রাবিড় পল্লী-স্বরাজের দেখা গিয়াছে যে সভার মাতব্বরেরা খুনের মামলা পর্য্যন্ত

বিচার করিতে অধিকারী ছিল। এই বিচার-কার্য্যে পল্লী-স্থিত রাজপ্রতিনিধি, "অধিকারিণ" মহাশয়—হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

এই সকল বিষয়ে পল্লী-সভাই আদালতে পরিণত হইত। বস্তুতঃ চোলমণ্ডলে বিচারের জন্য প্রত্যেক পল্লীতেই একটা করিয়া স্বতন্ত্র সভা ছিল। এই সব কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে,—কোনো কোনো মামলা পল্লী-সভার আদালতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। রাজদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনার বিচার সরকারী কর্ম্মচারী বা আদালতের অধীন ছিল।

টাকা চুরির কাণ্ডে মন্দিরওয়ালারা এবং পল্লী-সভার মাতব্বরেরা সদরের কাছারীতে হাজির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপ এক তথ্যে পল্লীর উপর সদর আদালতের শাসন আন্দাজ করিতে পারি।

বিচার ব্যবস্থায় লঙ্কার লোক

এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাষ্ট্রশাসনের বৃত্তান্তে লঙ্কার নরনারীর কথা এক প্রকার বলা হয় নাই। কিন্তু লঙ্কার প্রাচীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক তথ্য "লিপি"র সাহায্যে পাওয়া যায়। "এপিগ্রাফিয়া জেলানিকা" বা "সিংহলী লিপি" নামক গ্রন্থমালায় কি পল্লী-শাসন কি দেশ শাসন সকল ঘরের কথাই সন তারিখ সমন্বিত ভাবে উদ্ধার করা সম্ভব।

সিংহলের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সেকালে অনেক ছিল। কাজেই ভারতীয় "পাব্লিক ল" বা শাসন-বিষয়ক আইন আলোচনা করিবার সময় সিংহলের নরনারীর কৃতিত্ব আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থের বহর ক্ষুদ্র। কাজেই অনেক জিনিষ বাদ দিয়া যাওয়া হইতেছে।

তবে বিচার-শাসন বিষয়ে দায়ে পড়িয়া লঙ্কার শরণাপন্ন হইলাম। একাদশ শতাব্দীতে লঙ্কার জজেরা সদর হইতে বাহির হইয়া পল্লীর

আদালত গুলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজকালকার পারিভাষিকে বলিব,—সেকালে লঙ্কার শাসনে "সার্কিট জজ" নামক পর্য্যটক-বিচারপতির ব্যবস্থা ছিল।

মফঃস্বলে শফর করা ছিল বিচার-তদবিরের সহায়। চোলমণ্ডলের মতন সিংহলেও পল্লী-সভার আদালতে বড় বড় মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারিত। গ্রামের বিচারকেরা আইনসঙ্গত কাজ করিতেছেন কিনা তাহা পরিদর্শন করাই ছিল পর্য্যটক-বিচারপতিদের লক্ষ্য।

চতুর্থ মহিন্দ রাজার আমলে [১০১৮-১০৪২] পল্লী-সভার আদালতে চুরি ডাকাইতি এবং খুনাখুনির বিচার চলিতে পারিত। দসগাম পল্লী সম্বন্ধে এই বিষয়ে প্রমাণ বাহির হইয়াছে। বিচারের প্রত্যেক তর্ক প্রশ্ন এবং সমালোচনা কেতাবে লিখিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। বস্তুতঃ সদরের হুকুমই ছিল এইরূপ। সেই সকল কেতাব ঘাঁটিয়া পল্লী-বিচারকের জজিয়তির উপর জজিয়তি করিবার জন্যই সদরের বিচারপতিরা শফরে বাহির হইতেন।

বুঝিতে হইবে যে, লঙ্কার লোকেরাও কেন্দ্রী-করণ বা ঐক্য-বন্ধন বুঝিত বেশ। পল্লীর জজেরা ভুল করিলে বা বেআইনি চালাইলে তাঁহাদের উপরওয়ালারা তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দিতেন না। চোলমণ্ডলের মতন সিংহলেও বিচার-ব্যবস্থায় মফঃস্বলের উপর সদরের শাসন সর্ব্বথা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"শাস্ত্র"-সাহিত্যে সরকারী আদালত

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে [৫।৫।৫৮], মনুসংহিতায় [১২।১১১] এবং অন্যান্য "ধর্ম্ম" বা আইন বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দু বিচারপদ্ধতির কথা ভারতের কোন প্রদেশে এবং কোন্ যুগে এই

পদ্ধতি অনুসারে মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত জানা যায় না। তথাপি বিচার প্রতিষ্ঠান বিষয়ক হিন্দুর চিন্তা-ধারা হিসাবে তথ্য গুলা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পণ্ডিত কোলব্রুক বিলাতী রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির "ট্রান্‌জাক্‌শ্যন্‌স" বা কার্য্যবলী নামক পত্রিকায় এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। য়োলি, ফয় ইত্যাদি জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণের রচনায়ও এই সব আলোচিত হইয়াছে।

এই সকল "শাস্ত্র"-সাহিত্যে তিন প্রকার সরকারী, রাজকীয় বা বাদশাহী আদালতের কথা দেখিতে পাই।

প্রথম আদালতের বিচারপতি স্বয়ং বাদশা তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিচারে বসেন। অর্থাৎ একটা "সভা"ই বিচারক,—কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। রাজা যখন যেখানে তখন সেখানেই এই আদালতের কাজ চলে। বিলাতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ১২ ৫খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজার সঙ্গে সঙ্গেই আদালত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। ইহাতে জনগণের অসুবিধা ঘটিত অনেক। ১২১৫ সালে জনগণ রাজা জনকে "ম্যাগ্না কার্টা" নামক স্বাধীনতা বা স্বরাজের দলিল দিতে বাধ্য করে। তাহার এক বিধান এই যে, আদালত একটা নির্দ্দিষ্ট ঠাঁইয়ে বসিবে। রাজার পেছু পেছু আদালতের ছুটাছুটি তখন হইতে বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় আদালতের বিচারপতি "প্রাড়বিবাক" বা "ধর্ম্মাধ্যক্ষ"। ইনি রাজার বাহাল করা লোক। কিন্তু একাকী কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিবার এক্তিয়ার প্রাড়বিবাকের নাই। তিন জন হইতে সাত জন সহকারী তাঁহার সঙ্গে বিচারের সভায় বসিতে অধিকারী। এই আদালত রাজার আদালতের মতন ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না। যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রাড়বিবাক মহাশয় বিচারের জন্ত এজলাস খুলিয়া রাখেন।

তৃতীয় আদালতগুলাকে "ছোট আদালত" বলা যাইতে পারে। স্থানীয় লীচুদরের মামলা নিষ্পত্তি করা এই সব এজলাসের কাজ। বিচারকেরা রাজার বাহাল করা লোক।

ছোট আদালতের বিচার প্রাড়বিবাকের আদালতে পুনর্ব্বার বিচারিত হইতে পারে। আবার প্রাড়বিবাকের আদালত হইতেও "আপীল" চলে বাদশার আদালতে। শাস্ত্র-সাহিত্যে বিচার ব্যবস্থা এইরূপে কেন্দ্রীকৃত।

"স্বরাজে"র আদালত

হিন্দুরাষ্ট্রে নরনারীর আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ আলোচনা করিবার সময় বিচার বিষয়ক স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। চোল এবং সিংহলী "লিপি"তে তাহার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু "শাস্ত্র"-সাহিত্যেই এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য (২।৩০), নারদ (১।৭), বৃহস্পতি (১।৩০), শুক্র (৪।৫।৫৭-৬২ পংক্তি) ইত্যাদির প্রচারিত আইন-গ্রন্থে তিন প্রকার সার্ব্বজনিক আদালত বা জনসাধারণের বিচারালয় উল্লিখিত আছে।

প্রথম আদালতকে "পূগ"-নিয়ন্ত্রিত এজলাস বলিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ব্যবসায়ের লোক কোনো নির্দ্দিষ্ট জনপদের বাসিন্দা হইলে তাহাদিগকে পূগের অধিবাসী বলা হয় একথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। পূগকে পল্লী বা নগর-কেন্দ্র সমঝিয়াছি। "ধর্ম্ম" এবং "নীতি" শাস্ত্রের কথা বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হইবে যে পল্লী বা নগরের লোকেরা স্বাধীন ভাবে বিচার চালাইতে পারিত।

দ্বিতীয় আদালতকে "শ্রেণী"র আদালত বলিতে হইবে। জাতিতে বিভিন্ন অথচ ব্যবসা হিসাবে একরূপ এই ধরণের লোকের সমবায়কে "শ্রেণী" বলিত। কিষাণ, শিল্পী এবং বণিকদের "শ্রেণী"র কথা পূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছি। প্রত্যেক "শ্রেণী" নিজ নিজ সভ্যদের মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অধিকারী ছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় আদালত "কুল"-গত বিচারালয়। রক্তের সম্বন্ধে যাহারা আত্মীয় কুটুম্ব তাহারা সভায় বসিয়া নিজ নিজ অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে শালিসী করিত। "শাস্ত্রে"র প্রমাণে এইরূপ বুঝা যায়।

"শাস্ত্র"-সাহিত্যে এইরূপ ও বুঝিতে হইবে যে,—"কুল" হইতে আপীল চলিত "শ্রেণী"তে আবার "শ্রেণী" হইতে আপীল চলিত "পূগে"র আদালতে। জনসাধারণের স্বরাজ-বিচারালয় শেষ নিষ্পত্তি করিতে পারিত না। সরকারী আদালতের কোঠায় গিয়া সকল আপীল হাজির হইত। তাহার ফলে বাদশার বিচারালয় সমগ্র দেশের বিচার-ব্যবস্থা তদবির ও শাসন করিবার সুযোগ পাইত।

আগেই বলিয়াছি "শাস্ত্র"-সাহিত্যের "সরকারী" বা "সার্ব্বজনিক" বিচারালয়গুলা কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলা কঠিন। "স্বরাজের" আদালতগুলা ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যে কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহা সম্প্রতি জানিবার উপায় নাই। "লিপি"র প্রমাণে যে টুকু জানা যায় তাহাতে দেখিতে পাই যে, মফঃস্বলের বিচারালয়গুলাকে সদরের তাঁবে রাখিবার চেষ্টা ছিল খুব বেশী। বস্তুতঃ "শাস্ত্র"-সাহিত্যের লেখকেরা [illegible]